হঠাৎ গাওয়া গান

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

সংস্কৃতি সংসদ

১/১২ রোল্যাণ্ড রোড, কলিকাতা-২০

হঠাৎ গাওয়া গান

প্রথম প্রকাশ

১৯৬২

প্রকাশক :

সংস্কৃতি সংসদ

১/১২, রোল্যাণ্ড রোড,

কলকাতা-২০

৪৮-২০২২

লেখিকা পরিচিতি,

প্রচ্ছদ ব্লক ও মুদ্রণ :

দি রেডিয়েন্ট প্রসেস

৬ এ. এস. এন. ব্যানার্জী রোড

কলিকাতা—১৩

মুদ্রক :

সুমুদ্রণ

১৪. রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট

কলিকাতা—৯

জ্যেষ্ঠ পুত্র অনিন্দ্য

ও

পুত্রবধূ রীণাকে

মা

১/১২ রোল্যাণ্ড রোড
কলকাতা-২০

এই সংকলনটিতে ১৯৪৬ সালে 'চতুরঙ্গে' প্রথম প্রকাশিত গল্প 'জাত' থেকে শুরু করে পরিচয়, নতুন সাহিত্য, রবিবাসরীয় আনন্দ বাজার ইত্যাদিতে প্রকাশিত 'দলছুট' পর্যন্ত, নানা গল্পকে একসঙ্গে গাঁথা হয়েছে। অবশ্যই এর মধ্যে বহু গল্পকে স্বভাবতই বাদ দিতে হয়েছে। তবু বিভিন্ন সময়ের মনের বিচিত্র অনুভূতি হয়ত কিছুটা ধরা পড়েছে।

* * *

আগের সংস্করণ ফুরিয়েছে বহু আগে, কিন্তু অসুস্থতার জন্য আমার এই প্রিয় গল্পগুলি আবার প্রকাশে বিশেষই বিলম্ব হোল।
পাঠকদের অনুরোধে, নানা অসুবিধার মধ্যেও যে শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হোল সেজন্য জীবনের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

● ● ●

স্বপ্ন নয়—শান্তি নয়—ভালোবাসা নয়,
হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয়.
আমি তারে পারি না এড়াতে
সে আমার হাতে রাখে হাত ;
সব কাজ তুচ্ছ হয়—পণ্ড মনে হয়—,
সব চিন্তা—প্রার্থনার সকল সময়
শূন্য মনে হয়,
শূন্য মনে হয়।

... ...

সকল লোকের মাঝে ব'সে
আমার নিজের মুদ্রাদোষে
আমি একা হতেছি আলাদা?
আমার চোখেই শুধু ধাঁধা
আমার পথেই শুধু বাধা?

: জীবনানন্দ :

বেশ বুঝতে পারছি ক্রমশ: আমার ওপর বিরক্ত হচ্ছে মাধুরী। হয়ত হওয়াটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু আমারও তো কোন উপায় নেই।

কি-ই বা করতে পারি আমি? যা দেশের পরিস্থিতি, আর যা সময় চলেছে, এ অবস্থা তো শুধু আমার একার নয়, কত লক্ষ লক্ষ লোকের কত পরিবারের এই একই অবস্থা। কিন্তু কি করতে পারি আমি?

রোজই তো বেরিয়ে যাই, সারাদিন ঘুরে আবার সন্ধ্যাবেলা ফিরে আসি, কোন খবর ওকে দিতে পারি না যাতে ওর মুখ মুহূর্তের জন্যও হেসে ওঠে।

রোজ একই প্রোগ্রামের পুনরাবৃত্তি।

মাঝখান থেকে পাঞ্জাবীটা আরও ময়লা হয়, কেচে কেচে তার আয়ু কমে, পুরোন চটী শুধু ক্ষয়ে ক্ষয়ে ছিঁড়ে যায় তাই নয়, তালি লাগিয়ে, সারিয়ে আবার তাকে চালাতে গেলে চটীটা পথের মাঝখানে আমাকে অপ্রস্তুতে ফেলে।

সবই তো জানি আর নিরুপায় হয়েই বেকার জীবনের গ্লানি বহন করি, তেমনি মাধুরীর ক্রমবর্ধিত বিরক্তি সহ্য করি, উপেক্ষা করার চেষ্টা করি।

মাধুরী মুখে কিছু বলে না।

কিন্তু আমি বুঝি তো।

ওর নীরব ধিকার আমাকে নিয়ত বিদ্ধ করে। আমি অনুভূতিহীন মানুষ নই, ওর বিরক্তি, যে-কোন উপলক্ষ্যে হঠাৎ ওর জলে ওঠা আমাকে অস্থির করে, কিন্তু তবুও আমি কিছু করতে পারি না।

কেননা আমি বেকার।

আজ দু'বছরের ওপর আমি বেকার।

কিন্তু কি করতে পারি আমি?

শুধু নানা জায়গায় দরখাস্ত করে, অনর্থক পয়সা খরচ করা ছাড়া, শুধু পরিচিতদের কাছে কথার ছলে নিজের একটা চাকরির কথা উত্থাপন করা ছাড়া, আর কারও কাছে আশ্বাস না পেয়ে, শুধু সব জায়গা থেকেই মাথা নীচু করে বেরিয়ে আসা ছাড়া।

হ্যাঁ এইভাবেই তো দিন কাটছে।

এই রকমই তো রোজ চলছে।

কেননা আমি বেকার। হয়তো পরে বেকার থাকব না, কিন্তু তার মধ্যেই হয়তো মাধুরীর বিরক্তি সীমা ছাড়াবে, আমাদের দাম্পত্য-জীবনে ছোট ফাটল ক্রমশ বড় হতে হতে আমাদের মাঝখানে বিরাট এক গর্তের সৃষ্টি করবে। বিরাট খাদ—

আর সেই খাদ আমরা বুঝি আর কোনদিন অতিক্রম করতে পারব না।

তার আগে?

তার আগে যদি ছোটখাটো একটা চাকরিও পেতাম, অবশ্যই ভদ্রলোকের চাকরি, যদি মাস শেষে কিছু অর্থ এনে মাধুরীর হাতে সগর্বে তুলে দিয়ে আগের মতই বলতে পারতাম। এতেই চালিয়ে নাও…

আর মাধুরীর বিবর্ণ মুখ, কাজকরা ফাটা হাত সুখে আবার মসৃণ কোমল হ'য়ে আসত। সে তৃপ্তিতে চোখ নামিয়ে বলত, এই অনেক…

কিন্তু সে সুযোগ কোথায়?

আমার সঙ্গে মাধুরীর বিয়ে ঠিক প্রেম করে না হ'লেও চেনাজানার ভেতর।

আমার তিনকুলে কে আছে? ঐ বিজনদা ছাড়া? মাধুরী

বিজনদারই গ্রাম সম্পর্কে বোন। দেশ ভাগের পর পাকিস্থানের পাবনা জেলা থেকে ছিটকে আসা একদল উদ্বাস্তু সঙ্গে ওদের পরিবারও নতুন ঘর বাঁধবার স্বপ্ন নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিল।

তারপর ওদের ওঠা-নামার দীর্ঘ কাহিনী। তার ভেতরই কষ্টেসৃষ্টে স্কুল-ফাইনাল পাশ করেছিল মাধুরী। আমাকে যে নেহাৎই সুপাত্র মনে করেই, অন্তত দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পারবে, ভদ্রভাবে বাঁচতে পারবে মনে করেই বিজনদা আমার সঙ্গে মাধুরীর বিয়ের সম্বন্ধ এনেছিল—তাতে আর সন্দেহ কি?

আমার চেহারার কথা ওঠে না, তবে বিশ্রী নই।

আর মাধুরী মোটামুটি সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী মেয়ে।

গৃহকর্মে নিপুণাও বটে।

সন্দেহ নেই।

অন্তত মাধুরী তাই ছিল, সুশ্রী ও স্বাস্থ্যবতী।

অন্তত যতটা থাকলে বিবাহিত জীবন সুখের হ'তে পারে।

তাতেই চলে যাচ্ছিল। আমার সম্বল পারকিনসন কোম্পানীর কেরাণীর পদ।

বিয়ের পর তেমন কোন কষ্ট হয় নি।

বরং মাধুরীর খুসী খুসী মুখ দেখে বেশ একটা নিশ্চিন্ত ভাব আমার মনে এসে গিয়েছিল।

আর সেজন্যই যখন দুপুরের সময়টুকু নষ্ট না করে মাধুরী এই কাছের উষা কোম্পানীর মাসকয়েক আগে খোলা সেলাই শেখানোর স্কুলে সেলাই শিখতে যেত, তখন যেন কেমন ভাল লাগত না আমার।

যেন এটি স্বাভাবিক নয়।

কেন কি দরকার?

এত সৌখীনতা কেন?

আমার যা আয় তাতে মাধুরী ঘরের সব কাজ নিজের হাতে করে যেভাবে চালাচ্ছে তার ব্যতিক্রমে দরকার কি?

প্ল্যানটা আমার পছন্দ হয়নি।

কিন্তু মাধুরী স্কুল ছাড়ে নি।

ওর কেমন একটা জেদ আছে, সেই জেদের জন্যই শেষ পর্যন্ত শেখা শেষ করেছে ও।

আমি তো পরিহাস করার মত করে রাগ চেপে প্রশ্ন করেছি, ও আমায় রোজগার করে খাওয়ানোর কথা ভাবে কি না।

তার উত্তরে ও তো শুধু হেসেছে, কেন রোজগার করা ছাড়া এসব শিখতে নেই? আর নিজের জামা-কাপড়গুলোও তো।

বিশেষ কিছু বলি নি আর...

আর বিশেষ কিছু বললে মাধুরী তো আর শুনত না।

হঠাৎ আমার চাকরিটা গেল।

পারকিনসন কোম্পানীতে সব শ্রমিক-কেরাণী ধর্মঘট করল। চলল ধর্মঘট একমাস ধরে।

ইউনিয়নের নেতাদের গরম গরম বক্তৃতায় আমাদের মনের জোর ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। রোজই আমরা যেন আশা করতে লাগলাম আমাদের জয় সুনিশ্চিত।

মালিকপক্ষ নতজানু হতে আর বাকি নেই, হ্যাঁ তাও হল...

মালিকপক্ষ নতজানু হল, হার মানল বটে, কিন্তু আমাদের ক'জনের চাকরি গেল।

ইউনিয়ন জোর লড়াই চালাল, আবার ধর্মঘটের ভয় দেখাল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নাকি সকলের স্বার্থে ছোট স্বার্থ তারা ত্যাগ করল।

আমরা ক'জন ছাঁটাই হলাম।

যারা বড়সাহেবকে মারতে গিয়ে হাতে হাতে ধরা পড়েছিলাম।

বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ক্ষুদ্র স্বার্থত্যাগ।

স্বার্থ ওদের কাছে ক্ষুদ্র, সেই দেড় হাজার শ্রমিকের তুলনায় তিনজন শ্রমিকের স্বার্থ ক্ষুদ্র। হয়ত একথা ঠিক।

কিন্তু আমি নিজে?

আমার পৃথিবীতে আমার নিজের স্বার্থ তো সর্ববৃহৎ। কিন্তু তার কি হবে?

কিন্তু কাকে শোনাব?

কাকে বোঝাই?

আমি তো ইউনিয়নের নির্দেশমত কাজ করি নি। হঠাৎ মাথা গরম করে, বলা নেই, কওয়া নেই, বড়সাহেবকে মারতে গেলাম, তার শার্টের কলার ধরলাম, তাকে অপমান করলাম।

অথচ কে না জানে বড়সাহেব আছে বলেই তবু শ্রমিকদলের জন্ম সম্ভব হল। বড়সাহেব লোক ভালো সেকথা আমরাও স্বীকার করেছিলাম। কিন্তু কি করবো হাতের কাছে ওকেই যে পাওয়া গেল।

সেখানেই ভুল।

এসব সুপরিকল্পিত দাবীর অভিযানে হঠকারিতার স্থান কোথায়? সব মেপে, সব বুঝে, সব একসঙ্গে।

আমরা তিনজন দলছাড়া কেন?

কে বলেছিল আমাদের ওসব করতে?

ইউনিয়নের মিটিং-এও তো এসব কথা হয় নি? তবে?

অতএব তিন বছরের চাকরিটা গেল। ক্ষমা চাইলাম না আমি। কেন না নবীন আর সুরেশও চায় নি। অবশ্য চাইলেও পেতাম না হয়ত। আমরা তিনজনে বরখাস্ত হলাম।

নবীন আর সুরেশ শুধু অবিবাহিতই নয়, তারা ছিল শ্রমিক, ফলে মোটর কারখানায় কাজ পেয়ে তারা বেঁচে গেল। হাতে-গায়ে খাটতে শিখেছে তারা, কিন্তু আমি শ্রমিক নই, কেরাণী।

হাতে-কলমে কোন কাজ শিখি নি, করতেও পারব না।

ফল যা হবার।

দু'বছর বেকার।

এই দু'বছরে মাধুরী আরও রোগা হয়ে গেছে, সেই বিয়ের আগে কণ্ঠার হাড় বের করা অপরিণতদেহ মাধুরীর সঙ্গে এ মাধুরীর আবার যেন সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে।

মাধুরী সেই জীর্ণ অযত্নলালিত দেহ নিয়ে রোজ চাকরী করতে যায়।

কেন না মাধুরী একটি চাকরি পেয়েছে।

মাধুরী একটি স্কুলে চাকরি পেয়েছে। কাছেই যে জুনিয়র হাইস্কুলটা উদ্বাস্তুরা নিজেদের চেষ্টায় গড়ে তুলেছে, যেটা হাইস্কুল পরিণত করবার স্বপ্নে সেক্রেটারী রামসদয়বাবু প্রায়ই পাড়ায় চাঁদা তোলেন, যেখানে আগে আমিও মাঝে মাঝে চাঁদা দিয়েছি, সেই স্কুলে মাধুরী কাজ পেয়েছে।

নীচু ক্লাশে পড়ায় আর মেয়েদের সেলাই শেখায়।

সহজে পায় নি।

সহজে চাকরি কেউ পায় না।

মাধুরীও পায় নি।

তার জন্য ওকেও অনেক হাঁটাহাঁটি করতে হয়েছে, বহুবার রামসদয়-বাবুর স্ত্রীর ব্লাউজের ছাঁট ঠিক করে দিয়ে আসতে হয়েছে।

যা হোক তবে শেষ পর্যন্ত চাকরিটা পেয়েছে।

পেয়েছে তো?

কিন্তু আমি?

আজ দু'বছর চেষ্টা করেও আজ পর্যন্ত একটি চাকরি জোটাতে পারলাম না। মোটর কারখানা বা সাইকেল সারানোর দোকানে হয়ত ছুটকো কাজ মেলে কিন্তু সে চাকরি গ্রহণ করার তো প্রশ্ন ওঠে না।

সুরেশ আর নবীন নিতে পারে।

সুরেশ আর নবীন শ্রমিক শ্রেণীর।

আমি তা নই।

আমি গ্র্যাজুয়েট, আর কেরাণী ছিলাম, এখন বেকার।

আমি বেকার, এই পরিচয়টাই মাধুরীর কাছে বড় হয়ে উঠেছে। আমি চেষ্টা করেও যে চাকরি পাচ্ছি না সে কথা সোচ্চারে না বললেও ও বুঝছে।

কিন্তু মুখে না বললেও ওর বিরক্তি আমি বুঝতে পারছি। ওর

নীরব প্রশ্ন বারবার আমাকে আঘাত করছে. কিন্তু উত্তর খুঁজে পাচ্ছি না. কি উত্তর দেব ?

ওকে কেন বোঝাতে পারি না, মাধুরী চাকরি পেলেও আমি যে পাচ্ছি না সেটা আমার অপরাধ নয়। আর মাধুরী মাত্র স্কুলফাইন্যাল পাশ অথচ আমি একজন গ্র্যাজুয়েট হয়েও কেন চাকরি পাই না সেটা আমার ইচ্ছাকৃত নয়।

আমি কেন ওকে বোঝাতে পারি না, আমি যে কেন এত চেষ্টাতেও চাকরি পাচ্ছি না, তার কারণ, আমি নিজেই জানি না।

তার কারণ একটি মাত্র হতে পারে।

তার সম্ভাব্য কারণ, চাকরির জগতের এই নিয়ম।

আমি মাধুরীকে কি করে বোঝাব যে চাকরির জগতের এই নিয়ম। আকস্মিকভাবে সে নিজে চাকরি পেয়ে গেলেও আমি পাব না।

শুধু আমি কেন, আমার মত শত শত যুবক তাদের কর্মদক্ষতা, ক্ষমতা, বুদ্ধি, গুণ, কাজ করবার আগ্রহ ও আন্তরিকতা সত্ত্বেও বছরের পর বছর বেকার থাকছে. দিনের পর দিন আমারই মত তাদের গায়ের জামা ক্রমশঃ ময়লা হচ্ছে, পায়ের চটী ক্রমশঃ জীর্ণ হয়ে ছিঁড়ে আসছে, অথচ আমারই মত তারা ফিরে এসে কোনদিনই তাদের প্রিয়জনকে আশার বাণী শোনাতে পারছে না।

এ শুধু তো আমি নয়, একা নয়, শত শত হাজার হাজার যুবকের এই অবস্থা চলেছে।

কিন্তু তা হলে কি হবে ?

মাধুরী তো হাজার হাজার যুবকের কথা শুনতে চায় না। বাস্তবিক পক্ষে হাজার হাজার যুবকের কথা শুনে তার লাভ কি, শান্তি কোথায়, সান্ত্বনা কোথায় ?

সে তো আর হাজার হাজার যুবকের স্ত্রী নয়, সে আমার স্ত্রী, শুধু একজন মাত্র বেকার যুবকের স্ত্রী। আমার স্ত্রী হিসেবে সে শুধু আমার কাছেই কৈফিয়ৎ দাবী করতে পারে।

যদিও মাধুরী কোন কৈফিয়ৎ চায় না। মাধুরী তেমনি নীরবে

হঠাৎ গাওয়া গান।

থাকে। ভোরবেলা থেকে উঠে উনুনের ছাই তোলে, উনুনে আগুন দিয়ে বাসন ক'খানা মেজে নেয়, তারপর রান্না সেরে আমাকে খেতে দেয়, তারপর নিজে খেয়ে নিয়ে স্কুলে চলে যায়।

একবার বলেও না কেন মিছিমিছি রোজ যাও, কি হবে রোজ বেরিয়ে, তার থেকে ঘরে বসে থাকলেও তো পার।

আসা-যাওয়ার জন্য পয়সা ও নিজেই দিয়ে দেয় হাতে, একবার বলে না কি হবে মিছিমিছি এই পয়সা ক'টা ট্রামে বাসে খরচ করে, তার থেকে ঘরে বসে থাকলেও তো পার। পয়সা না আন, অন্তত পয়সা অনর্থক খরচ করার হাত থেকে তো অব্যাহতি দিতে পার।

মাধুরী কিছুই বলে না।

রোজকার অভ্যাসমত আমার বরাদ্দ পয়সা দিয়ে স্কুলে বেরিয়ে যায়।

আমি জানি মাধুরী ফিরবে অনেক রাত্রে। স্কুল থেকে বেরিয়ে ও তিনটে টিউশ্যনি করবে, তু'টো সেলাইয়ের একটি পড়ার।

তারপর ক্লান্তদেহে ফিরে, আবার রাত্রের রান্না চাপাবে।

ততক্ষণে আমি বাড়ী ফিরে নিজে চা করে খেয়ে নিয়েছি, আর বাইরের রকে বসে বসে চলমান জনস্রোত লক্ষ্য করেছি।

ক্রমশঃ সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, তারপর রাতের অন্ধকার, সেই উদ্বাস্তু পাড়ার অন্ধকারে ক্রমে ক্রমে বাড়ীগুলোতে হারিকেন আর কোন কোন বর্ধিষ্ণু দোকানে ডে-লাইট জ্বলে উঠেছে, আমি তখনও বসে থেকেছি, মাধুরীর প্রতীক্ষা করেছি অপরাধী মনে, আর মাধুরীর জন্য অপেক্ষা করেছি।

অবশেষে মাধুরীকে দেখা গেছে।

ওকে দূর থেকে দেখলেও আমি চিনতে পারি।

ক্রমশঃ রোগা হয়ে যাওয়া, ক্লান্তিতে ভেঙ্গে-পড়া, সেই দেহ আমার অতি পরিচিত, আমার সে প্রিয় দেহ জীর্ণ হয়ে পড়লেও যে আমি কোন কাজে লাগতে পারছি না, এ জন্য নিজেকে আমি অপরাধী বোধ করলেও আর কিছুই করতে পারি না।

কেন না আমি বেকার।

মাধুরী কিছু না বললেও বেশ বুঝতে পারছি, সব জিনিষের একটা সীমা আছে।

দিন দিন ও যেন একটু বেশী বিরক্ত হচ্ছে।

অবশেষে?

শেষ ভাবতে পারি না।

জীবনের সব সঙ্গীত আমার থেমে গেছে, জীবনের সব প্রবহমান নদীগুলো হঠাৎ বদ্ধ জলাশয় হ'য়ে আমাদের দু'জনের দম আটকে দিচ্ছে।

সব জানালাগুলোই যে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

আমি বেকার।

এই একটি সত্য আমার সামনে সূর্যের মত জ্বলন্ত।

সেদিনও তেমনি সারা ডালহৌসী স্কোয়ার ঘুরে ঘুরে ফিরলাম।

আজ শরীরটা ভাল ছিল না।

যে বন্ধুর অফিসে গিয়েছিলাম, সে না আসায়, সেদিন তার কাছে সময়মত চাটুকুও খাওয়া হয় নি।

তা ছাড়া এসেম্বলী যাবার জন্য প্রস্তুত একটা বিরাট মিছিলকে তিনটের পর থেকে পুলিস আটকে রেখেছিল। তার ফলে আরও বিশৃঙ্খল অবস্থা। মিছিলের চীৎকার এখনও কানে বাজছে। নিজেরও গলা মেলাতে ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু দু'বছর বেকার থেকে সে অধিকারও যেন হারিয়েছি।

অবশেষে বাড়ী ফিরেছি। শরীর টলছে।

অনেক পথ হেঁটে এসেছি।

আজকাল বেশীর ভাগ পথই হাঁটি।

কিন্তু তাতেই বা কি?

তবুও হাঁটি. আজও হেঁটে এসেছি অনেকটা।

বাড়ীতে আলো জ্বলছে।

কে আলো জ্বালাল?

মাধুরী ফিরে এসেছে নিশ্চয়ই।

ওর কাছেও ডুপ্লিকেট চাবি।

ওই এসেছে তাহলে। কিন্তু...

বৃষ্টি পড়ছিল আজ সারাদিন, ছাতা নয় শুধু, চটী, কাপড়, জামা সবই ভিজে গেছে। বোধ হয় মাধুরীও তাই আজ আর টিউশ্যনিতে যায় নি। ফিরে এসেছে।

ছাতাটা জল ঝরাবার জন্য ভেতরের রকে রেখে ঘরে ঢুকলাম।

মাধুরী শুয়ে আছে।

হঠাৎ যেন পাখীগুলো সব সমস্বরে গান আরম্ভ করে দিল। হঠাৎ অর্কেস্ট্রার সুরে বুঝি আকাশ বাতাস ভরে গেল।

মাধুরী শুয়ে আছে।—

মাধুরী বাড়ীতে আছে—

আমি ক্লান্ত হয়ে ফিরে এলাম, আর মাধুরী বাড়ীতে।

কতদিন এমন হয় নি।

কতদিন মনে মনে আকাঙ্ক্ষা করেছি, আমি আসার আগে মাধুরী আসবে, ও বাড়ীতে থাকবে, আমার জন্য চা করে দেবে। আমরা দু'জনে গল্প করব তারপর অন্য সকলের মত, অন্য বিবাহিত লোকদের মত ঘরকন্নার কথা আলোচনা করব। আমার স্ত্রী আমার ক্লান্তি মেটাবার জন্য কত রকম যত্ন করবে।

নীরবে সে নিজে ক্লান্ত চেহারা নিয়ে নীরব কর্তব্য করে যাবে।

কিন্তু তা হয় নি।

কেন না কোনদিনই মাধুরী আগে ফেরে নি। এমন কি রবিবারও না। সেদিন তার চারটে থেকে অন্য একটা টিউশ্যনি। বড়লোকের বউকে সেলাই শেখায়।

তাই রবিবারও সন্ধ্যাবেলা নিজে চা খেয়ে নিয়ে অপেক্ষা করি মাধুরীর ফিরে আসার।

তেমনি রকে বসে চলমান জনস্রোত দেখি, সন্ধ্যা দেখি, রাতের নেমে আসা গাঢ় অন্ধকারে, একে একে জ্বলে ওঠা বাতিগুলো দেখি।

একই নিয়ম।

কিন্তু আজ ব্যতিক্রম।

আজ মাধুরী আগে এসেছে, মাধুরী শুয়ে আছে, হঠাৎ মনে হল চীৎকার করে উঠব। দু'হাতে ওকে পাঁজকোলা করে তুলে আমার প্রথম দিনগুলোর মতো আদর করব।

কিন্তু মাধুরী ক্লান্ত।

ও ক্লান্ত হয়ে শুয়ে আছে।

আগে ফিরেও ও ক্লান্ত।

একেবারে কাছে চলে গেলাম, মাধুরী যেখানে শুয়ে আছে তার ক্লান্তদেহ ছড়িয়ে দিয়ে।

পাশে বসলাম।

ও আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল, আমি ওর একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিলাম। ও নিজেকে সমর্পণ করে দিল।

ওর ঘাড় আর গলার চামড়াটা দেখা যাচ্ছে। ওর হাত আর মসৃণ নেই। রুক্ষ, কাজ করা, খেটে খাওয়া, তেল-ক্রীম না মাখান হাত, ওর নখগুলোও পরিষ্কার করে কাটা না।

তবু সেই হাত আমার আজ আরও ভাল লাগল। বহুদিন বাদে, বহু যুগ পরে যেন প্রিয়াকে প্রথম স্পর্শ করতে পারলাম।

ঘরের সমস্ত হাওয়া যেন হালকা গোলাপী রং-এ ভরে গেছে, ওর সাদা চোখে যেন সেই গোলাপী রং ছড়িয়ে পড়েছে।

ও চোখ বুজল।

আমি অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকালাম।

হঠাৎ বেজে-ওঠা সঙ্গীতের জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। রিহার্সাল না-দেওয়া নায়কের মত আমি ষ্টেজে উঠে পড়েছি।

কিন্তু গান যে সুরু হয়ে গেছে।

সুর যে থামছে না।

ঘরের বাতাসে এখনও তো গোলাপী আমেজ।

মাধুরী! এই!

খুব আস্তে আস্তে ডাকলাম আমি।

উঃ......

আজ সকাল সকাল ফিরেছ যে......

এমনি!

না এমনি নয়, নিশ্চয়ই......

সত্যি এমনি!

খুব ক্লান্ত নয়?

না......

অসুস্থ লাগছে?

না......

তবে?......

প্রশ্নটা করেই ওর দিকে তাকালাম। কি মাধুরী? বল?

কিছু না।

নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে।......

ও মুখ টিপে শুধু হাসল।

ওর সেই রোজকার অভ্যস্ত নির্বিকার মুখে অন্য ছায়া। ওর সেই পুরুষালি হ'য়ে আসা, কাজ করে কঠিন হয়ে যাওয়া হাত হঠাৎ কোমল হল।

মাধুরী মুখ ফিরিয়ে নিল!

কি হয়েছে মাধুরী?

যা হবার......

কি চাকরী গেছে?

না......

টিউশ্যনি?

না......

তবে?

আমার গলা প্রায় বন্ধ হয়ে আসছে। হঠাৎ আরম্ভ হওয়া গান যেন না থেমে যায়। যেন কোন খারাপ খবর শুনতে না হয়।

কোনদিন ঈশ্বরকে ডাকিনি, আজ এই সময়, এই মুহূর্তে সেই ঈশ্বরকেও স্মরণ করতে দ্বিধা করলাম না। মাধুরী তখনও চুপ।

আমি অধৈর্য বোধ করছি, হয়ত তা উচিত নয়, বহুদিন বাদে আজ মাধুরী আমি আসবার আগেই বাড়ীতে ফিরেছে।

বহুদিন বাদে, বোধ হয় যুগ হবে, মাধুরীকে আমি দেখতে পেয়েছি, বাড়ী ফিরে ওকে দেখতে পেয়েছি, আমি ক্লান্ত হয়ে বাড়ী ফিরেছি, অফিস করে ক্লান্ত নয়, চাকরির চেষ্টায় ক্লান্ত। তবু ওকে ফিরে এসে দেখতে পেয়েছি।

আমি অনুভব করে সুখী হ'তে পেরেছি, আমার স্ত্রী আমার আগেই বাড়ীতে এসেছে, হয়ত কোথাও যায় নি, তাকে যেতে হয় না। সে বাড়ীতে সন্ধ্যাবেলায় আলো জ্বেলেছে। আর বাতিজ্বলা ঘরে বসে আমার প্রতীক্ষা করছে।

বহুযুগ বাদে, যেন মাধুরী আমার যথার্থ স্ত্রীর মত আমাকে স্বামীর সম্মান দিয়েছে।

আর পাঁচজন স্বামীর মত আজ আমি একটা বিশেষ অনুভূতিতে গৌরবান্বিত বোধ করছি। স্ত্রীর উপেক্ষা নয়, স্ত্রীর অনুকম্পা নয়, স্ত্রীর জন্য বাতি জ্বেলে বেকার জীবনের দিনান্তের প্রতীক্ষা নয়।

আমার জন্য স্ত্রী প্রতীক্ষা করছে।

আর পাঁচজন সাধারণ পুরুষের মত আমিও ফিরে এসে আমার প্রতীক্ষারতা স্ত্রীকে বাড়ীতে দেখতে পেয়েছি।

তাই এর জন্য মূল্য দিতে প্রস্তুত হলাম।

মাধুরীর এই নীরবতা মনে মনে আমাকে অস্থির করলেও আমি কষ্টে নিজেকে সংযত করলাম। অধৈর্য হব না।

ও সময় নিক, আরো অনেক সময় নিক। অবশেষে বলুক ওর যা বক্তব্য......

বলুক ওর চাকরী গেছে, বা ওর শরীর খারাপ ও আর পারছে না, কিন্তু মাধুরী সময় নিল না।

চাকরী যাওয়া বা অসুস্থতার কথাও বলল না। শুধু আস্তে আস্তে বলল।

আমার বোধ হয় বাচ্চা হবে……

না……

প্রায় আর্তনাদ করে উঠলাম। গান থেমে গেছে। বুঝতে পারছি না, আমার এতে আনন্দ পাওয়া উচিত, না বিরক্তি।

মাধুরীর মুখের দিকে তাকালাম। ওকি একটা বিরাট প্রত্যাশা নিয়ে এ-খবরটা আমায় দিল? বুঝতে পারছি না।

কিন্তু……

অসম্ভব……

অসম্ভব কিসে?

ম্লান হেসে জিজ্ঞেস করল ও।

ওর দিকে আবার তাকালাম। শিথিল বেশবাসে ওকে আর মোহনীয় মনে হচ্ছে না। ওরও কি আমায় তাই মনে হচ্ছে? আমাকে কি ও ঘৃণা করছে? দায়ী করছে আমাকেই?

বুঝতে পারলাম না।

কি করব এখন আমি? শুধু আস্তে আস্তে বললাম, অসম্ভব, কেন না, এখন উচিত নয় বলে? এর ওপর…

জীবন তো তা মানে না। জানি, কিন্তু একে এই অবস্থা, তার ওপর তোমার শরীর অচল হলে……

সেজন্য ভাবনা?…আমার শরীর অচল হলে পাছে……

না না সেজন্য নয়……

তবে?

তোমার রোজগারের জন্য শুধু নয়, এ-অবস্থায় আবার বাচ্চা আসা মানে কত খরচ ভেবেছ?

তা কি হবে?

অন্য উপায় দেখতে হবে!……

অর্থাৎ……

বিরাট প্রশ্ন করে তাকাল আমার দিকে মাধুরী। ও কি আমায় আরো বেশী ঘৃণা করছে এই প্রস্তাবের জন্য? আমাকে কি একেবারে অমানুষ ভাবছে?

বুঝতে পারলাম না।

ওর দিকে ভাল করে তাকালাম।

ঘরের গোলাপী হাওয়া ক্রমশঃ নীল হয়ে আসছে।

না……

দৃঢ় গলায় ও আবার বলল।

কেন?

তুমি কেন অন্য উপায়ের কথা ভাবছ বল?

কারণ সেটাই একমাত্র পথ বলে……

না……

তোমারই তো বেশী কষ্ট হবে……

হোক কষ্ট…এর থেকে আর বেশী কি হবে?

বেশী হবে বৈকি! তোমার 'পরই তো সব বোঝা……

হোক……

না মাধুরী……

কেন?

আমি এ হ'তে দেব না……

কেন?

আমি তোমায় ভালবাসি……

বলেই হঠাৎ লজ্জিত হলাম।

দীর্ঘকাল বেকার, স্ত্রীকে রক্ষা করতে পারছি না, তার কোন কষ্টের লাঘব করতে পারছি না, এ-অবস্থায় আমার মুখে ভালবাসার ঘোষণা, নিজের কাছেই দারুণ নির্লজ্জ লাগল।

কিন্তু মাধুরী হাসল না।

যা আশা করেছিলাম, আকাঙ্ক্ষা করেছিলাম, তেমন কোন ব্যঙ্গের হাসি ওর মুখে ফুটে উঠল না।

বরং অবাক হয়ে দেখলাম, ওর চোখের দৃষ্টি কোমল হল।

মনে মনে ও কি এমনিই একটি ঘোষণার জন্য কামনা করছিল?

আবার কথাটাকে উচ্চারণ করবার জন্য প্রবল একটা ইচ্ছে হল।

আমি আবার বললাম।

সত্যি যেহেতু তোমায় আমি ভালবাসি মাধুরী, তোমার এ-অবস্থা আমি হতে দেব না।

কি যে বল।......

না সত্যি......কথাটি ভেবে দেখবার মত। শুধু তো একটা বাচ্চা নয়, তার জন্য সমস্ত ভবিষ্যৎ দিনগুলো......

জানি......

জান। কিন্তু বিষয়টি বোধ হয় সবদিক দিয়ে বুঝতে পারছ না।......

মাধুরী কোন উত্তর দিল না।

আমার চট্ করে হয়ত কোন চাকরীর আশা নেই, সুতরাং এই সব পাগলামী......

পাগলামী নয়। এ আমার স্বপ্ন···আমি সব ভেবেছি...তবু এ আমার স্বপ্ন......

তোমার স্বপ্ন?···

প্রায় চীৎকার করে উঠলাম আমি।

তোমার স্বপ্ন? তুমি চেয়েছিলে? তুমি তাহলে সুখী হয়েছ? আমাকে ঘৃণা করছ না?

ঘৃণা?......

উত্তেজনায় উঠে বসল মাধুরী।

হ্যাঁ হ্যাঁ ঘৃণা! আমাকে ঘৃণা করছ না?

কেন?

আমিই দায়ী। আমার এ রকম অবিমৃশ্যকারিতা···আমার আরও সংযত হওয়া উচিত ছিল······না...

মাধুরী আরও কোমল হল। অনেকদিন আগের মত যেন। তারপর প্রায় ফিসফিস করে বলল। আমি সুখী,···আমি সন্তান চাই···

হঠাৎ আবার সব গান একসঙ্গে সুরু হ'য়ে গেল। আমি স্পষ্ট অনুভব করছি, ঘরের নীল হাওয়া পাখা উড়ে যাচ্ছে। অন্ধকার হয়ে আসা ঘরে হারিকেনের মিটমিটে আলোয় সূর্যের তেজ এসে পড়ল।

হঠাৎ একটা পোকা উড়ে এসে সেই কাচের ভেতর থেকে ছিটকে আসা আলোর রেখার চারিদিকে ঘুরপাক খেতে লাগল।

ঘুরপাক খাচ্ছে তো খাচ্ছেই।

ওদিকে সেই গান ক্রমশঃ জোরাল হয়ে উঠেছে, সমস্ত ঘর সেই গানের সুরে ভরে যাচ্ছে। আমি সেই হঠাৎ গাওয়া গানের স্রোতে ভেসে চলেছি। মাধুরী! আমার মাধুরী।

পাগলা······

আমার মাথাটা বুকে চেপে ধরল মাধুরী। তারপর আস্তে আস্তে আমার মাথায় হাত বোলাতে লাগল। ওর শির বের করা খসখসে আঙুলে হৃদয়ের সব ভালোবাসাটুকু যেন সঞ্চারিত করে দিতে চাইল।

ও আমার চুল এলোমেলো করে দিল। আমি ওর বুকে মাথা রেখে শুয়ে থাকলাম। অনেকক্ষণ বাদে আস্তে বললাম, মাধুরী!

বল!

আমার একটা চাকরির ঠিক হয়েছে। অল্প মাইনে অথচ দিনে দশ ঘণ্টা খাটুনি বলে নিই নি।

নিও না······

না এবার নেব।

কি দরকার? পরে ভাল পেলে···

আরও পর? কত পর?

কিন্তু কিছু বলতে পারলাম না।

মনে পড়ল এ রকম একটা চাকরি আরও দু'একবার পেয়েও নিই নি। কোথা থেকে একটা নির্লিপ্ততা এসে গিয়েছিল। এ রকম চাকরি করার থেকে রোজ বেরিয়ে গিয়ে সারাদিন চাকরি খোঁজার খেলা ঢের ভাল।

কিন্তু আর নয়।

আজ নিজেকে ভারী ছোট মনে হ'তে লাগল। নিজের সঙ্গে খেলাও যেন আর ভাল লাগল না। মনস্থির করে ফেললাম, পাড়ার ঐ সাইকেলের দোকানের কাজটাই নেব।

অবশ্য বুদ্ধিজীবি কেরাণী শ্রেণীতে আর থাকতে পারব না।

হোক……

তবু বেকার থাকব না তো……

মাধুরীর একার'পর সব বোঝা চাপিয়ে আর তো নিশ্চিন্ত থাকতে পারব না।

পারব না।

মাধুরী সন্তান চায়,…মা হ'তে চায়…তার স্বপ্ন…

আজ ও আমার কাছে ধরা দিয়েছে, ওর মন খুলে ধরেছে, স্ত্রী হিসেবে আমার কাছে তার মনের ইচ্ছা জানিয়েছে।

আমি আমার কর্তব্য করব।

সেই কাজই করব।

হঠাৎ গাওয়া গানকে থামতে দেব না।

ঘরের হাওয়া আবেগে কাঁপছে। হারিকেনের আলোটা কেঁপে কেঁপে হঠাৎ নিভে গেল।

বোধ হয় কেরোসিন ফুরিয়েছে, গাঢ় অন্ধকার।

শুধু সেই অন্ধকারে আমার মন অনির্বাণ শিখা হ'য়ে জ্বলতে লাগল।

হঠাৎ পাওয়া গান

দশটা বাজবার আগেই অফিসে এসে পৌঁছাল জয়ন্তী।

যতক্ষণ বাসের দেরী হচ্ছিল ওর অধৈর্য লাগছিল। দশটা বেজে গেছে বলে নয়, দশটার আগেই পৌঁছতে চায় সে। না হলে আবার তাপস রায়ের সেই বাঁকা বাঁকা কথা শুনতে হবে। কথার থেকেও বেশী ইঙ্গিত। পাগল করে দেয় তাকে।

প্রায় সাত মাস তাপস রায় তাদের অফিসে বদলি হয়ে এসেছে। প্রথম প্রথম অতটা বুঝতে পারেনি, শুধু সে কেন সকলেই ভেবেছিল লোকটা একটু বেশী খেয়ালী। তাছাড়া উপরওয়ালা, বস। না মেনে তো উপায়ও নেই।

তাই এ অফিসে যোগ দিয়েই তার নানা নিয়ম-কানুন বদলান, সকলকে ডেকে ষ্টাফ-কনফারেন্স করে তাঁর নিজস্ব মতামত ও মনোভাব বোঝান, এসব কিছু নতুন হলেও, এতে তারা ভয় পায়নি।

কিন্তু ক্রমশঃ যেন অসহ্য হয়ে উঠেছে।

লোকটা নিজেও অদ্ভুত। বিয়েই না হয় করেনি, তাই বলে সংসার নেই? নিজস্ব জীবন নেই? না হলে দশটায় অফিস আর নটা বাজবার আগে থেকে এসে বসে থাকবে কেন অফিসে? আর শুধু বসে থাকবে? আগের মত আর দেরী করে এলেও অনায়াসে দশটা পাঁচটা সই করে হাজিরা ঠিক রাখার উপায় নেই। আগের অফিসার নিজেই যে আসতেন এগারোটায় আবার তাঁর যাবার তাড়া পড়ত পাঁচটার বেশ কিছু আগে।

কিন্তু তাপস রায়ের অন্য ব্যাপার। ঘড়ি ধরে নটায় আসবে, আবার যাবেও ছটার পর। সকলে চলে গেলে।

বেশী বেশী কাজ দেখায়।

গজ গজ করে সবাই। কিন্তু বলার কিছু নেই। ঘড়ির নিয়মমাফিক অফিসের কাজ চলে। এতে যে অন্য সকলেরও কিছু সুবিধে হয়েছে, এই সাত মাসে সেটুকুও বুঝতে পেরেছে সবাই। তাছাড়া তাপস রায় নিজেই নটা-ছটা করে, কিন্তু তাই বলে পাঁচটার পর কাউকে তো আটকে রাখে না।

এমন কি আগে টিফিনের ঘন্টার কোন স্থিরতা ছিল না। ফলে হট্টগোল লেগেই থাকত। কাকে কখন পাওয়া যাবে, কোন স্থিরতা ছিল না। কিন্তু তাপস রায় সেখানেও নিয়ম বেঁধে দিয়েছে।

দুটো শিফ্‌টে সকলেরই এক ঘন্টা ছুটি একটা থেকে আড়াইটে। এতে কারও অসুবিধা হয় না অথচ সমানে কাজ চলে। আর তাপস রায় নিজে তো পনের মিনিটে ড্রাই লাঞ্চ সেরে নেয়।

কিন্তু একটু অসুবিধে হয় জয়ন্তীর আর সতীশের। এ অফিসের টাইপিষ্ট জয়ন্তী আর তাপস রায়ের খাস-চাপরাসী সতীশ।

সতীশের তো প্রায় রোজ, সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত। অবশ্য এজন্য ও দুপুরে ছুটি পায় দু-ঘন্টা। কিন্তু জয়ন্তী? মাঝে মাঝে জরুরী চিঠি টাইপ করার জন্য তাকেও তো আটকে যেতে হয়।

প্রথম প্রথম ভয় করত বেশ।

অফিসের সাহেবদের তার চেনা আছে। কত গল্প শুনেছে সে এদের সম্বন্ধে। কাজের ছলে আটকে রেখে তারপর......

কিন্তু না...একথা অতি বড় শত্রুও বলতে পারবে না তাপস রায় সম্পর্কে।

কাজ শুধু কাজ।

কাজের কথা ছাড়া, আর একটি কথাও বাহুল্য বোধে বলবে না তাপস রায়। শুধু ঘরে ঢুকলেই নমস্কার করে সুপ্রভাত জানান ছাড়া। সে তো সকলেরই সঙ্গেই। ভদ্রতা বা সৌজন্য রক্ষায় এদিক ওদিক হয় না কখনও

তাপস রায়ের। এমন কি পিওন জল দিলেও ধন্যবাদ জানাবে তাকে। এ তার স্বভাব।

অথচ অন্য দিকে অসম্ভব গম্ভীর।

কেউ গায়ে পড়ে ব্যক্তিগত কোন কথা বলবার, বা অন্য কোন কথা বলবার সাহসই পাবে না। না হলে গৌরদাসবাবু চেষ্টার ত্রুটি করেছিল নাকি?

দরজার বাইরের ফলকে তাপস রায়ের নামের তলায়ই দেখা করবার সময় লেখা আছে। বাইরের লোককে সে সময় মেনে চলতেই হবে। এর অন্যথা হবে না।

আগেকার অফিসার যতীন ধরের তো গৌরদাসবাবুই ডান হাত ছিল। ডান হাত কেন, যা করত সবই তো গৌরদাসবাবু। তার চোখেই দেখত, তার কানেই শুনত যতীন ধর।

কিন্তু তাপস রায় সব নিজে দেখে শুনে করে। আসার মাস খানেক পরেই তো তাই গৌরবাবুকে একটা বিলের ব্যাপারে হাতে নাতে ধরে ফেলল। যদিও কোন ক্ষতি না করে শুধু ওয়ার্নিং দিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল গৌরবাবুকে, কিন্তু তাপস রায় ভুলে গেলেও গৌরদাসবাবু সে অপমান ভোলেনি। ব্যাপার দেখে জয়ন্তী তো চাকরি ছেড়ে দেবেই ভেবেছিল। যা মেজাজ তাপস রায়ের।

তবে জয়ন্তীর একটা মস্ত সুবিধে হয়েছে। সমস্ত কাজ নিজের হাতে নেওয়ার ফলে তাপস রায় তাকে গৌরদাসবাবুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে। নটায় এসে সমস্ত ড্রাফট নিজে করে রাখবে। জয়ন্তীকে আর কাজ বুঝে নেবার জন্য গৌরদাসবাবুর কাছে যেতে হয় না।

ভারী খারাপ লাগে তার পান চিবোতে চিবোতে গৌরদাসবাবুর হাসি হাসি তাকান আর অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা।

কিন্তু একটা ব্যাপারে অবাক হয়ে যায় জয়ন্তী। লোকটা যেন কাউকে অবিশ্বাস করতে জানে না। ও বেশ লক্ষ্য করেছে এত কড়া হলেও অসম্ভব বিশ্বাস করে লোকটা মানুষের সততার ওপর। এমন কি এত কাণ্ডের পর গৌরবাবুকেও।

অথচ তাপস রায় না জানুক, জয়ন্তীর তো জানতে বাকী নেই এ অফিসের কয়েকজন ঘুঘু কর্মীদের। শুধু গৌরদাসবাবু কেন? সাধন দাস, ব্রজেন মিত্র, তারা কেউ কম যায় নাকি?

সকলকেই এই তিন বছরে চিনে নিয়েছে জয়ন্তী কিন্তু কি দরকার তার? তাপস রায় তো আর কচি খোকা নয়। ঠিক বুঝে নেবে। আর না হয় তো ভুগবে। জয়ন্তীর তাতে কি?

নিজে শুধু বিশেষ ভাবে সাবধান থাকে: তাকে অনর্থক কথা না শুনতে হলেই হল।

আর কাজের গাফিলতি ছাড়া বা হাজিরা সময় অবহেলা ছাড়া অন্য কোন বিষয় নিয়ে তাপস রায় তো মাথা ঘামায় না। লক্ষ্যই করে না।

সেদিনই তো অফিসে সাধন দাস আর পরমেশ দত্তর প্রায় হাতাহাতি হয়ে গেল। কি চীৎকার, অসভ্যের মত গালাগাল।

কিন্তু ঘর ছেড়ে একবার বেরোন দূরে থাক, বেয়ারাকে ডেকে ওদের থামতেও বলল না তাপস রায়। শুধু অনেক্ষণ বাদেও যখন ঝগড়া থেমেও থামছিল না, একটা ইংরেজীতে লেখা নোটিস আটকে দিয়ে গেল সতীশ, তাপস রায়ের সই করা।

অফিসে ডিসিপ্লেন আর সৌজন্য মেনে চলতে হবে সকলকে, না হলে তার বিরুদ্ধে এ্যাকসন নেওয়া হবে।

অবশ্য ঐটুকুতেই কাজ হল। আর সে চিঠি টাইপ করার জন্য তো ডাক পড়েছিল জয়ন্তীরই।

আপনি কি খুব ব্যস্ত, মিস সেন?

জিজ্ঞেস করেছিল তাপস রায়।

চিফের চিঠিটা টাইপ করছি। ওটা আরজেন্ট্।

চিঠিটা খুব বড় নাকি?

ফাইল দেখতে দেখতে ওর দিকে না তাকিয়েই জিজ্ঞেস করেছিল তাপস রায়। আর বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিল জয়ন্তী। অফিসে এসেই তো ডিক্‌টেসন নিয়ে গেছে ও তাপস রায়ের কাছ থেকে। তবে? জানে না নাকি?

চিঠিটা বড়ই, তবে শেষ হয়ে এসেছে।

আস্তে আস্তেই উত্তর দিয়েছিল জয়ন্তী।

তাহলে এইটা একটু টাইপ করে দিন কাইণ্ডলি।...হ্যাঁ।। দু কপি...

আচ্ছা।

হাতে তুলে নিতেই তাপস রায়ের লেখা নোটিসটা দেখতে পেয়েছিল জয়ন্তী আর বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিল ওকে মুখে কিছু কারণ না জিজ্ঞেস করাতে।

কিন্তু তাপস রায় তা করে না, তার স্বভাবই এই। শুধু মাঝে মাঝে দু একটি কথায় ওর অসন্তোষ জানানো ছাড়া।

অন্যদের কথা জানে না। ঐ সামান্য অসন্তোষের ইঙ্গিতেই জয়ন্তীর খারাপ লাগে। সেই তীক্ষ্ণ শ্লেষের আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচাতে চায় জয়ন্তী। তাই দশটার আগেই অফিসে পৌঁছতে চায় জয়ন্তী। জানে, ঠিক দশটা বাজলেই তাকে পিওন এসে জানাবে, সাহেব ডেকেছেন।

আজও সে এসে পৌঁছাল দশটার বেশ আগেই। দশটা বাজতে বার মিনিট।

ব্যাগটা পাশে রেখে কি ভেবে তার ভেতর রাখা ছোট্ট আয়নাটা বের করে মুখটা একবার দেখে নিল জয়ন্তী। যা ভিড় বাসে, পরিচ্ছন্ন বেশে আসবার উপায় কি? রীতিমত যুদ্ধ করতে হয় যেন উঠতে আর নামতে।

জয়ন্তীও তাই আর বিশেষ প্রসাধন করে না।

অথচ কলেজ-জীবনে সে ছিমছাম সাজপোশাক আর আলগা প্রসাধনকে বেশ একটু প্রাধান্যই দিত। অবশ্য মাস তিনেক হল তার যেন কি মনে হয়। কি জানি কেন বহুদিন আগেকার সেই প্রায় ভুলে যাওয়া অভ্যাস, হালকা করে ঠোঁটে একটু লিপস্টিক না লাগালে তার যেন কেমন অস্বস্তি বোধ হয়।

অবশ্য এটুকু গৌরদাসবাবুর চোখ এড়ায়নি। মুচকে হেসেই তিনি শুধু ক্ষান্ত থাকেন নি। বেশ অন্তরঙ্গতার সঙ্গে জয়ন্তীকে তাঁর মনোভাব জানাতেও ছাড়েন নি।

সত্যি মিস সেন! যখন আগেকার মেয়েদের মত পান খান না, তখন

ঠোঁটটাও যেন কেন একটু রাঙাতেন না তাই ভাবি। রাঙা ঠোঁট না হলে কি মেয়েদের মানায় ?

আমার দিকে লক্ষ্য না দিলে সুখী হব।

গম্ভীর হয়ে বলেছিল জয়ন্তী। রাগে ফর্সা মুখ টুকটুক করছিল। এর যথাযথ উত্তর দিয়ে অফিসে সীন করার মানে হয় না। দুচোখে দেখতে পারে না সে গৌরদাসবাবুকে। এত বয়স হয়েছে তবু······

তার সম্প্রতিতম সাজপোশাকের সঙ্গে তাপস রায়ের যোগাযোগ ঘটান গৌরদাসবাবুদের বিন্দুমাত্র আটকাত না, যদি না তাদের সকলের সামনেই সামান্য ভুল ত্রুটির জন্য তাপস রায় জয়ন্তীকে না ধমকাত।

জয়ন্তীর টাইপ আর সর্টহ্যাণ্ডে স্পিড ভাল। তাছাড়া কাজ তার ভারী পরিষ্কার আর তাড়াতাড়ি। এসব কথা যতীন ধরও বলে গেছেন। কিন্তু তাপস রায় যেন তাতেও সন্তুষ্ট নয়। কি চায় সে ?

একেবারে নিখুঁত কাজ।

কিন্তু মানুষ তো সবাই। আর মানুষ মাত্রেরই ভুল হয়। তবে ? একটু ভুল হলেও চলবে না। কথা শুনতে হবে। আর এজন্য সকলেই অসন্তুষ্ট। এত ভয়ে ভয়ে কাজ করা যায় ?

তাই একমাস হল তারা···

কেন না তাপস রায়কে সহ্য করা আর যেন সম্ভব হ'ল না। কিন্তু এসব নিয়ে জয়ন্তী মাথা ঘামায় না। এক অফিসে কাজ করে সুতরাং সকলে যা করে তাকেও তাই করতে হয়, কিন্তু যতটুকু না গলা মিলালে নয়, ততটুকু। অফিসে কারও সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা নেই।

আগের দিনই, টাইপে ইংরেজী একটা কথায় ভুল ছিল বলে তাপস রায় জয়ন্তীকে ডেকে ধমকেছে। সমস্ত সেন্‌টেন্সটার মানেই নাকি বদলে গেছে এতে। ভাল করে ইংরেজী শেখা যে একটি প্রয়োজন, সে কথাও বলতে ছাড়েনি। আরও কত কি ?

আজ অফিসে এসেও তাই জয়ন্তীর মনটা ভাল ছিল না। ব্যাগ থেকে আয়না বের করে মুখটা একবার দেখে নিয়ে, তার জন্য রেখে দেওয়া কাজ-গুলো একবার দেখে নিল জয়ন্তী। আজ বিস্তর টাইপ করতে হবে, তারপর

সারাদিনের আবার জমে যাওয়া কাজ তো আছেই। নটায় এসে সব ঠিক করে, যার যার টেবিলে পাঠিয়ে দেয় তাপস রায়। তারপর দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই একে একে ডাক পড়ে।

ডাকের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল জয়ন্তী। কে জানে আজ কি আছে কপালে, আবার দেরী হচ্ছে কেন ?

দশটা কুড়িতে ও সতীশকে না জিজ্ঞেস করে পারল না।

সাহেব আসেনি নাকি ?

হ্যাঁ' কখন···

তবে ?

দরজার দিকে চোখ দিয়ে ইঙ্গিত করল সতীশ।

একটু আগে বেরিয়ে গেলেন, কি কাজে। দেরী হবে আসতে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল জয়ন্তী। যাক বেশ কিছুক্ষণের জন্য শান্তি। ততক্ষণে কাজ যতটা পারে সেরে রাখবে।

কিন্তু এভাবে আর চলে না।

কাল ভাল করে ঘুমোতে পারেনি। বাড়ীর সকলের সঙ্গে কথাও হয়েছে। দাদা তো স্পষ্ট কতগুলো প্ল্যান দিয়ে দিল, এমন সব বসিং টেনডেন্সিওলা ওপরওলাদের তাড়াবার। অসহযোগ, উড়ো চিঠি, কত কি। এসব লোকেরা সাধারণতই নিজেরা চোরের একশেষ হয়, সুতরাং সব কঠোরতা দুদিনে ভেঙে দেওয়া যায়, এদের তো হৃদয় বলে পদার্থ থাকে না, চাকরিই এদের জীবন।

সব কথাই মেনে নিয়েছে জয়ন্তী। ও নিজেও তাই বিশ্বাস করে।

কিন্তু কি করতে পারে ও ? মেয়ে হয়ে ওসব প্ল্যানের কথা ভাবতেও পারে না।

কিন্তু ও নিজে না পারুক, সাধন, রমেন, পরমেশ ওরা তো কিছু একটা করতে পারে। জীবন যে বিষময় হয়ে উঠল, অফিসে আসবার নামে যে জ্বর আসে! কিছু একটা না করলেই যে নয়—

তাই বোধ হয় মাস খানেক আগে, তবে জয়ন্তী সেসব ভুলে গেছে।

কিন্তু কালকের বকুনির পর আবার তার মনে নিদারুণ একটা প্রতিশোধ স্পৃহা জেগেছে।

আজ ওদের সঙ্গে একটু কথা বলবে ঠিক করল জয়ন্তী। এ ভাবে আর পারা যায় না।

কিছুক্ষণের মধ্যে সকলেই এসে গেল। সতীশ ততক্ষণে আউট লেখা দিকটা এবার খুলে দিয়েছে। সকলের দৃষ্টি হাফ দরজার ওপাশে আউট লেখা ফলকে গিয়ে পড়ল।

ব্যাপার কি?

একমুখ হাসি নিয়ে পরমেশ জিজ্ঞেস করল।

সাহেব বেরিয়ে গেছেন।—বলে গেছেন ফিরতে দেরী হবে, প্রায় একটা—

সতীশ উত্তর দিল।

হুররে—

প্রায় লাফ দিল পরমেশ। সঙ্গে সঙ্গে বলাই সোম আর হরিদাস মিত্র।

এসব জানলে কোন শা—এত তাড়াতাড়ি পড়ি কি মরি করে আসতো কে। উঃ ভাল করে পানটা অবধি খাওয়া হল না মাইরি। বউ নিজের হাতে সেজে দিচ্ছিল।

নতুন বিয়ে করেছে বলাই সোম।

তুমি ঠিক জান, সাহেব একটার আগে আসবে না?

ঠিক জানি মানে? আমাকে তো তাই বলে গেছেন। আর আপনাদের সব ফাইলগুলো দেখে কাজ সব দিয়ে গেছেন।…কাজগুলো সেরে রাখুন…

তোমায় সেজন্য পাকাম করতে হবে না…

গৌরদাসবাবু ধমকে উঠলেন।

বেশী বাড বেড়েছ না? নিজেও তো সেদিন বেশ অপমানটি হজম করলে!

না, তা বলবেন না। বুড়ো মানুষ বলে সাহেব আমার অপমান কোনদিন করে না এ্যাকাউন্টবাবু!

আরে রাখো তোমার বুড়ো মানুষ!

উঃ ভারী যে ভক্তি দেখছি···

হরিদাস মিত্র এগিয়ে এল!

দাঁড়াও তোমার সাহেবের ব্যবস্থা আগে হোক তারপর তোমার।

নির্বিকার মুখে বসে রইল সতীশ।

রমেন আর সাধন কোথায়? ওদের যে দেখছি না গৌরদা? আরে, তারাই তো গেছে ব্যবস্থা করতে। হেড অফিসে গেছে। সাহেবের জন্য সেখানে শূল পোতা হয়েছে যে!

কি রকম?

সকলেই উদগ্রীব হল জানতে।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য...যাও যাও যে যার কাজ কর।

এই শ্রীধর, হাজিরে খাতায় সই করলিনে? আরে যে যার কাজে যা না। সে ব্যাটা ঘুঘু লোক, বলে গেছে একটা, দেখবে এক্ষুণি এসে পড়বে, তারপর এ অবস্থায় দেখলে হবে একচোট। যাঃ যাঃ গুলতানি করিস নি।

গৌরদাস বাবু সকলকে তাড়া দিলেন।

জয়ন্তী শুনতে পাচ্ছে সব। ও একবার তাকাল সতীশের দিকে। তাই আজ রমেন আর সাধন এখনও আসেনি। কিন্তু ব্যাপার কি? কি করতে চায় ওরা? কে জানে, তবে ওরা যে অনেকখানি এগিয়েচে তাতে সন্দেহ নেই।

কি আর করবে? সকলেই তো অতিষ্ঠ। কিন্তু যা সব এদের কাণ্ড, কোন রকম নোংরা কাজ করবে না তো? আর যাই হক্, তাপস রায় লোকটা ভদ্র, অন্তত যতীন ধরের মত ওয়ার্থলেস নয়, মুখ মিষ্টি করে, খারাপ সিসি-আর দেয় না। অবশ্য কতটুকুই বা চেনা গেছে তাপস রায়কে। যাকগে...

জয়ন্তী টাইপ মেশিনে কার্বন আর কাগজ ঠিক করে নিয়ে টাইপ করতে আরম্ভ করে দিল।

অনেকক্ষণ বাদে নজর পড়ল সতীশ ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

সতীশ বুড়ো হয়েছে। রিটায়ার করতে মাসখানেক বাকী। কথা বলে কম আর খাটেও কম। শরীরে তার কুলোয় না। বেশীর ভাগ সময়ই তো সে টুলে বসে ঝিমোয়। কাজে যোগ দেবার সময় বয়স কমিয়ে লেখানর জন্য কাজটা ওর টিকে আছে বটে, কিন্তু কে না জানে বয়স তার ষাট পেরিয়েছে বহুদিন।

ওর দিকে একটু মিষ্টি করে হাসল জয়ন্তী। টুল থেকে উঠে এল সতীশ। একেবারে ওর কাছে।

টাইপ করা থামিয়ে ওর দিকে তাকাল জয়ন্তী।

কিছু বলবে আমাকে সতীশ?

না...

আবার টাইপ করার দিকে মন দিল জয়ন্তী। পর্বত প্রমাণ কাজ দিয়ে গেছে। বেরিয়ে গেছে বলে যেন আরও। একটাও যদি শেষ হতে বাকী থাকে তো অপমানের একশেষ। ঠিক যে অপমানকর কথা বলে তাপস রায় তা নয়, কিন্তু তার দুএকটা তীক্ষ্ণ শ্লেষ, দুটো একটা ইঙ্গিত বা নীরবে সিগারেট টেনে যাওয়া, চোখের উপেক্ষা ভরা দৃষ্টি জয়ন্তীকে যেন বেঁধে মারতে থাকে। তার থেকে ঢের ভাল কাজ শেষ করে রাখা। জয়ন্তীর সঙ্গে তো কাজেরই সম্পর্ক।

দিদিমণি!

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ডাকল সতীশ।

বল না!

টাইপ করা না থামিয়েই বলল জয়ন্তী।

বলছিলাম কি, আমার ভাল লাগে না এইসব।

কি সব?

একবার অফিসের ওদিকটায় দেখল জয়ন্তী। তাপস রায় এ সুবিধাটা করে দিয়েছে। জয়ন্তীর টেবিলটা একেবারে এক কোণে,

জানালার ধারে।

শুধু যে চোখ মেললেই রাস্তার ধারে বিরাট তেঁতুল গাছটা চোখে পড়ে তাই নয়, সমস্ত অফিসের থেকে একটু যেন আলাদাই বসতে পারছে সে।

ঠিক গা ঘেঁষেই রাখা সাধন দাসের টেবিল সরিয়ে নিয়ে ওদের দিকটা সম্পূর্ণ আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। এতে জয়ন্তী বেঁচে গেছে, এইটুকুর প্রয়োজন ছিল। শুধু নিজের মনে কাজ করাই যায় না, বাড়ী থেকে আনা রুটি তরকারি বাক্স আড়াল দিয়ে বেশ খেয়ে নেওয়া যায়।

এর জন্য জয়ন্তী কৃতজ্ঞ তাপস রায়ের কাছে। কতগুলো ব্যাপারে লোকটার গুণ স্বীকার করতেই হয়।

বল না! আবার বলল জয়ন্তী।

সবাই যে এত ছোট হয়ে সাহেবের পেছনে লেগেছে এটা ঠিক নয়।

অবাক না হয়ে পারল না জয়ন্তী। হঠাৎ এত দরদ সতীশের? নিজেও কি কম অপমানিত হয়েছে? সেদিনই তো···

কি করে বুঝলে?

বেশ কঠিন স্বরেই বলল জয়ন্তী।

আমি জানি না? চুল পেকে গেল লোক চিনি না।

কারা পেছনে লেগেছে?

কেন ঐ সাধন বাবু, রমেনবাবু আর পাণ্ডা তো এ্যাকাউন্টবাবু।

নির্মল ওরা?

ওরা তত বিশেষ কিছু জানে না। এ্যাকাউন্টবাবুই পাণ্ডা।

এ্যাকাউন্টটেন্ট্ গৌরদাসবাবুকে চিনতে জয়ন্তীরও বাকী নেই। লোকটা সত্যিই যে কোন নোংরা কাজ করতে পারে। এতক্ষণে গৌরদাসবাবুর কিছু আগে বলা কথাটার মানে বুঝতে পারল জয়ন্তী।

কি করেছে ওরা?—টাইপ থামাল জয়ন্তী।

আপনি কিছু শোনেন নি?

কি শুনব?

ওরা সাহেবকে তাড়াতে চায়, চিঠি দিয়েছে ওপরে।

ওঃ।

একটু খুশীই হল বোধ হয় জয়ন্তী। এ চিঠির কথা সে জানে। তবে সে আর এমন কি ?

শুধু ওঃ বললেন ?

আর কি বলব ? আর তাছাড়া, আমাদের এর ভেতর কি করবার থাকতে পারে সতীশ ? আমরা কারও সাতেও নেই পাঁচেও নেই……

তা জানি…তবে…

তুমি বুঝি সাহেবকে পছন্দ কর ?

না…এমনি বলছিলাম। বুড়ো হলাম তো, এসব কাজ…সব জানি তো।

কোন উত্তর না দিয়ে আবার টাইপ করা শুরু করল জয়ন্তী।

সাহেব লোক ভাল…

অনেকক্ষণ পর নিজের মনেই বলল সতীশ। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তার নিজের টুলে গিয়ে বসল।

রমেন আর সাধন ফিরল তাপস রায় ফেরার মিনিট পনের আগে।

ভাগ্যিস…মনে মনে ভাবল জয়ন্তী।

বেলা বারটার পরও তাদের অনুপস্থিতিতে যা ভয় করছিল জয়ন্তীর। একটা কাণ্ড হ'ত আজ, খুব বেঁচে গেছে ওরা।

গট্‌গট্‌ করে নিজের ঘরে ঢুকে পড়ল তাপস রায় একটা বাজবার পাঁচ মিনিট আগে। একটু বাদেই বেল বেজে উঠতে সতীশ ঘরে ঢুকে আবার বেরিয়ে এল।

দিদিমণি, সাহেব ডাকছেন।

প্রস্তুতই ছিল জয়ন্তী। টাইপ করা চিঠিগুলো গুছিয়ে নিয়ে ঘরে ঢুকল।

গুড্‌ আফটারনুন্‌ মিস সেন।

গুড্‌ আফটারনুন্‌।

ওগুলো সব টাইপ হয়ে গেছে ?

হ্যাঁ।

তাপস রায়ের দিকে সাজিয়ে রাখা কাগজগুলো এগিয়ে দিল জয়ন্তী।

বসুন।

ধন্যবাদ।

চিঠিগুলোর ওপর একটা পেপার ওয়েট চাপা দিয়ে রাখল তাপস রায়। তারপর জয়ন্তীর দিকে সোজা তাকিয়ে বলল, মিস সেন!

বলুন।

এই প্রথম তাপস রায়ের গলায় অন্য সুর। আমি চলে যাচ্ছি।

হঠাৎ কপালে ঘাম দেখা দিল জয়ন্তীর। তাকে ডেকে একথা বলার অর্থ কি? তার থেকে ঢের বেশী তো পছন্দ করেন নির্মলকে। তবে?

কোন কথা না বলে তাপস রায়ের দিকে একবার তাকিয়েই চোখ নীচু করে নিল জয়ন্তী।

মিস সেন, আমি আজ সব ঠিক করে এলাম। অবশ্য আমি নিজেই রেজিগ্‌নেশন দিচ্ছি।

রেজিগ্‌নেশন? কেন?

এতক্ষণে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করল জয়ন্তী। এতটা ও ভাবেনি। তবে না নিয়ে বোধ হয় উপায়ও নেই। নিশ্চয়ই বিরাট একটা বিপদে পড়েছে। রমেন ওরা তো কম চালাক নয়। তাই!

এত বিশ্রী একটা ব্যাপার।

নিজের মনে যেন বলল তাপস রায়।

আমায় বলবেন?

নিজের প্রশ্নে নিজেই অবাক হল জয়ন্তী। আর সে গলার স্বরে কি ছিল জানে না তবু তাপস রায় তার গাম্ভীর্যের আবরণটুকু নিজেই যেন উঠিয়ে নিল।

সবটুকু বলতে পারব না, বলা সম্ভব নয়, তবে এতে আমার আত্ম-সম্মানের প্রশ্ন জড়িত।

কিন্তু এক্ষেত্রে আমি...

কুণ্ঠার সঙ্গে বলল জয়ন্তী।

আপনাকে বলছি, কেন না আপনাকে একটা প্রশ্ন...থাক...আপনার ওপর একটা ভার দিয়ে যেতে চাই।

আপনি কবে যাচ্ছেন ?

খুব সহজ ভাবেই যেন জিজ্ঞেস করল জয়ন্তী।

অর্ডার আসলেই। ওরা রেজিগ্‌নেশন্‌ এ্যাকসেপ্ট করেছে, আজ আমি সেজন্যই তো গিয়েছিলাম। করিয়ে তবে এসেছি।

অর্থাৎ সপ্তাহ খানেকের ভেতর...

অত লাগবে না। ঐ করেসপণ্ডেন্সের জন্য যেটুকু,...সময়...বোধহয় কাল পরশুর ভেতরই...

ও:।

আমার একটি বক্তব্য ছিল সতীশ সম্বন্ধে, বেচারা বুড়ো মানুষ।

ও:, তাই সতীশের এত আগ্রহ। জয়ন্তী ঠিকই বুঝেছিল। তাই সাহেব এত ভাল। ব্যক্তিগতভাবে উপকৃত সতীশ। কিন্তু জয়ন্তী তো ভাবতেও পারে না। একা কোন ফেভার চায় না সে। হঠাৎ কেমন কঠিন হয়ে গেল তার মন।

আপনাকে তাই একটা কথা বলব।

বলুন !

দেখুন একটা চিঠি আপনাকে টাইপ করতে হবে। হুইচ ইজ ভেরি কনফিডেন্সিয়াল।...

কখনও কি দেখেছেন ?...

জয়ন্তী সেন বলে উঠল। আজ ওর অনেক সাহস এসে গেছে।

না তা বলিনি।

তাপস রায় গম্ভীর হল। সেই চিরকালের চেনা তাপস রায়। চশমাটা একবার ঠিক করে নিয়ে আবার বলল, মিস সেন, ইস্যু ক্লার্ককেও তা দিতে হবে না, কেন না অফিসের এরা কেউ প্র্যাকটিক্যালি এটাকে সাপোর্ট করবে না, অর্থাৎ নিতান্তই...

বুঝেছি...আচ্ছা ডিক্টেশন কি এখনই দেবেন ?

আমি ড্রাফ্‌ট করে রেখেছি।...

ড্রয়ার থেকে ভাঁজ করা চিঠিটা বার করল তাপস রায়, ভাঁজ করা অবস্থাতেই জয়ন্তীর হাতে দিল, তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করল, মিস সেন! একটা কথা!

বলুন!

যে দরখাস্তটায় আপনি সই দিয়েছিলেন, সে বক্তব্যগুলিতে কি আপনার সমর্থন আছে?

জয়ন্তী রীতিমত ঘেমে গেল।

মনে পড়ল মাসখানেক আগে তাপস রায়ের বিরুদ্ধে কি সব লিখে, নিজেরাই টাইপ করিয়ে রমেনরা প্রত্যেককেই সই করিয়েছে—, অবশ্যই প্রত্যেকের জন্য আলাদা কপি ওরাই করিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু জয়ন্তী তো পড়েও দেখেনি। বাস ধরতে পারবে না বলে ছুটির পরে খুব তাড়াতাড়ি সই করে চলে গিয়েছিল। তাপস রায়ের অত্যাচার তার কাছেও যে কাম্য ছিল না, তা তো বলাই বাহুল্য। তাই তাপস রায় চলে গেলে একজন কোন ভাল নির্বিরোধী লোক আসে তো আসুক না? ক্ষতি কি? তাছাড়া সহকর্মীদের সকলের বিরুদ্ধে কোন কাজ করাও তো মুশকিল। তাই দ্বিধা থাকলেও জয়ন্তী সই করে নিজেকে অনর্থক চিন্তার হাত থেকে বাঁচাতে চেয়েছিল।

কিন্তু বক্তব্য? কি ছিল তাতে? তাপস রায় চুরি করেছে? আর কি বলবে সে? নিশ্চয়ই তার...

জানেন!

তাপস রায়ই আগে কথা বলল, সব থেকে অবাক হয়েছি, ঐ দরখাস্তগুলোয় আপনার আর নির্মলের সই আছে দেখে...বিশেষ করে আপনার...

কেন? আমিই বা ব্যতিক্রম হব কেন?

এতক্ষণে যেন সাহস পেল জয়ন্তী। চলেই তো যাচ্ছে তাপস রায়, তবে আর কিসের ভয়?

ওর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল তাপস রায়। তারপর খুব আস্তে আস্তে বলল, কেননা, আপনি আর ওরা এক নন বলে!

অবাক চোখে তাকাল জয়ন্তী তাপস রায়ের দিকে। তাহলে বোঝে

তাপস রায় ওর সঙ্গে ওদের পার্থক্য ? তবে ? ওদের সঙ্গে একই ভাবে জয়ন্তীকে ধমকায় কেন ? অপমান করে কেন ?

ওর চোখের দৃষ্টি লক্ষ্য করল তাপস, জোর দিয়ে আবার বলল, হ্যাঁ। আপনি আলাদা, একেবারে আলাদা।

কি জানি।...

জয়ন্তীর মনে পড়ল, সে আলাদা, সত্যিই আলাদা। অর্থনৈতিক কারণে এদের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে বটে, কিন্তু সত্যিই তার জগৎ আলাদা। তাই ওকে অবসর সময়ে অফিস টেবিলে সার্ত্র বা কামু পড়তে দেখলে সহকর্মীরা যে উপহাস করে সেটাও জয়ন্তীর কাছে কিছু অস্বাভাবিক লাগে না। ও তাপস রায়কেও সমগোত্রীয় ভেবেছিল, শুধু বেশী মাসিক মাইনের মালিক এই যা। কিন্তু আজ সে সত্যিই অবাক হল !

কি জানি নয়, তাই, আর সেজন্যই দুঃখ।—

দুঃখ ? তাপস রায়ের মত দাম্ভিক ব্যক্তিত্বের দুঃখ ? এর থেকে বেশী আর কি অবাক হবার থাকতে পারে ? সেই তাপস রায়, যে কেবল একটা মেশিনের মত ঘড়ি ধরে অফিস করে, একদিনও যাকে কেউ হেসে কথা বলতে দেখেনি, তার দুঃখ ? ওর হৃদয় বা অনুভূতি বলে পদার্থ আছে নাকি ?

মিস সেন ! আজ আর অফিস করতে পারব না। এখনই বাড়ী ফিরে যাচ্ছি। অফিসে এসেই ফোন পেয়ে হেড অফিসে গিয়েছিলাম। দেখলাম সব আপনাদের অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে। প্রথম অভিযোগগুলি আমি গ্রাহ্য করি না, নাথিং রং। কিন্তু শেষের অভিযোগ..., অভিযোগ না বলাই ভাল, যাক সেটি মারাত্মক...এর পর আর আত্মসম্মান বজায় রেখে আমার পক্ষে কাজ করা সম্ভব নয়। কেন না...

আমি দুঃখিত।

না না...অভিযোগ বা আপনাদের বক্তব্য তো সত্যি মিস সেন।

সত্যি ?

হ্যাঁ।

মানে আপনি তাহলে সত্যিই চুরি করেছেন ?

চুরি ?

ভ্রূকুঞ্চিত করল তাপস রায়।

তাই তো লেখা...

বেশ বুঝতে পারছি, দরখাস্তটা আপনি না পড়েই সই করেছেন, তাই···
মিস সেন! চুরির অভিযোগ নয়, আমার কলঙ্কিত জন্ম ইতিহাস নিয়ে···

না...

এতবড় নোংরা কথা তাপস রায় উচ্চারণ করল কি করে?

হ্যাঁ মিস সেন, আর সত্যিই আমার মায়ের সঙ্গে বাবার বিয়ে হয়নি। ···অর্থাৎ সম্ভব হয় নি।

প্লিজ···

মুখ নীচু করেই বসে রইল জয়ন্তী। এ রকম বক্তব্যে সে সই দিয়েছে। নিজের ওপরই হঠাৎ ধিক্কার এল তার।

মিস সেন!

হঠাৎ সেই পরিচিত দাম্ভিক তাপস রায়কে জয়ন্তীর কেমন শিশুর মত অসহায় মনে হল। ঘৃণা নয়, রাগ নয়, একটা তীব্র বেদনার্ত আবেগে তার বুকটা মুচড়ে উঠল যেন।...

অবশ্য তাতেও কিছু এসে যেত না, যদি না দরখাস্তে আমার মায়ের উল্লেখে এত অশ্রদ্ধা না প্রকাশ পেত। আমার মা! তাঁর তুলনা হয় না··· কিন্তু তাঁকে..., আপনি তো সব শুনেছেন...

নিজের ওপর তীব্র ঘৃণায় জয়ন্তীর মরে যেতে ইচ্ছে হল।

না আমি এসব কিছুই জানি না।

জানেন না অথচ সই তো দিলেন?

ওরা বলল, আপনাকে ওরা চায় না, তাই...

তাই কি?...

আমায় ক্ষমা করুন...

না না আমি জানি, দরখাস্ত আপনি পড়ে দেখেন নি, তবে আপনি হয়ত শুনেছেন।

না...

সেই তো, আমি তো জানি এর ভেতর আপনার সমর্থন থাকতেই পারে

না। যাক...আমি তো চলে যাচ্ছি। ভালই হল আপনাকে বলে...অন্ততঃ কন্‌ফারম্‌ড্‌ হলাম যে···

মুখ নীচু করে বসে রইল জয়ন্তী।

এখন বম্বে যাব মায়ের কাছে। বহুদিন থেকেই সেখানে অফার পেয়েছি একটা, কিন্তু আই লাভ ক্যালকাটা তাই কলকাতা ছাড়ব ভাবতে পারি না। কিন্তু এখন তো যেতেই হবে, জীবিকা···আফটার অল আই এ্যাম্‌ এ ম্যান। কলকাতায় থাকতেও ইচ্ছেও নেই।

কষ্টে নিজের চোখের জলকে সংযত করতে চেষ্টা করল জয়ন্তী।

মিস সেন! অফিসিয়াল কোন কঠোরতা রক্ষার জন্য যদি আমি কোন দুর্ব্যবহার করে থাকি তো ক্ষমা করবেন। আমি আজ সত্যিই খুব পার্‌টার-বড্‌—

টপটপ করে জল ঝরে পড়ল জয়ন্তীর চোখ থেকে।

হঠাৎ কি মনে হল তাপসের একটু ঝুঁকে পড়ে বলল, একি আপনি কাঁদছেন কেন? দেখুন তো! কি মুশকিল, আচ্ছা লোক তো আপনি—

আমায় ক্ষমা করবেন...

না না...একথা কেন বলছেন? আপনার তো এ ক্ষেত্রে ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্নই উঠতে পারে না। আপনি তো জানতেনই না...

তাহলেই বা, ছিঃ···ছেলেমানুষ তো নই···

জয়ন্তীর জল ভরা চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল তাপস। তারপর চোখ নামিয়ে বলল, আই এ্যাম ফরচুনেট।

তারপর আবার ফাইল দেখতে লাগল।

তাপস রায় চলে গেল দুদিন বাদেই। ওর কাছ থেকে চার্জ বুঝে নিলেন হুগলী ব্রাঞ্চ থেকে আসা অবিনাশ মৈত্র।

সতীশের জন্য অন্তত আরও ছয়মাসের এক্সটেনসন রেকমেণ্ড করে তাপস রায় নিজেই পাঠিয়ে গেছে যাবার আগের দিন। তাছাড়া সতীশের ছেলেকেই যাতে তার জায়গায় নেওয়া হয়, সে সম্বন্ধেও নোট দিয়ে গেছে।

রোজকার মত দশটার আগেই টেবিলে এসে বসল জয়ন্তী।

আজ আর ওর জন্য গাদা করা কাজ অপেক্ষা করে নেই। এসেই সব

ঠিক করে নিয়ে টাইপ আরম্ভ করতে হবে না। শুধু আজ কেন? হয়ত আর কোনদিনও নয়।

অফিসারের ঘরের দিকে একবার তাকাল জয়ন্তী।

অফিসের অতি উৎসাহী রমেনের দল তাপস রায়ের নেমপ্লেটটা সেদিনই খুলে ফেলেছে, সতীশ আর নির্মলের সোচ্চার আপত্তি ওরা কানে তোলেনি। জয়ন্তীর আপত্তির তো প্রশ্নই ওঠে না! ও সেই চিরদিনের নীরব টাইপিষ্ট। নীরবে শুধু লক্ষ্য করেছে, শেষ দিনও তাপস রায় দশটার বহু আগেই অফিসে এসে গেছে। নিজের নেমপ্লেটটা যথাস্থানে না দেখেও কোন প্রশ্ন করেনি। এদের ইচ্ছাকৃত অপমানের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার কোন চেষ্টাও করেনি সে।

নতুন অফিসারের নেমপ্লেটটা আজ কালের মধ্যে হয়ে আসবে। এখন পর্যন্ত সে জায়গাটা খালি।

সেদিকে তাকিয়ে হঠাৎ জয়ন্তীর চোখটা করকর করে উঠল।

নিজেকে সংযত করে, কার্বন আর কাগজ গুছিয়ে টাইপ করতে আরম্ভ করল···

পটস্ অফ ফ্লাওয়ারস্ এ্যাণ্ড অর্কিড, আর নেভার বোর্‌ড। দে আর টেকেন আউট হোয়েন দি সান শাইনস, এ্যাণ্ড ব্রট ইন হোয়েন ডাস্ক বিগিনস টু ফল···

অর্কিড

অনেকক্ষণ ধরে ঘুরিয়ে দেখল, একটার পর একটা বাছল, তারপর সেগুলো রেখে দিয়ে ছোটগুলোর দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল হরিপদ—

এগুলো কত করে ?

ফলওয়ালা ততক্ষণে খদ্দেরের পকেটের খবর বুঝে নিয়েছে। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জবাব দিল।

লাওনা বাবু এগুলোই, খুব সস্তা, টাকায় আটটি। ক টাকার লেবে ?

টাকায় দশটা হবে না ?

হরিপদ তবু আশা ছাড়ে না।

নাঃ

স্রেফ জবাব দিল ফলওয়ালা।

তা'হলে দুটো দাও।

পকেট থেকে পয়সা বার করল হরিপদ, তারপর পাশে অপেক্ষমান ছেলেকে বলল লেবু দুটো হাতে নেরে খোকা।

খোকা এতক্ষণ চুপটি করে পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। প্রথমেই বড় লেবুর দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে কেনার আব্দার করে বাবার কাছে সে ধমক খেয়েছে। চোখ দুটি তার জলে ভরে গেছে, আর সে কোন কথা বলেনি। কেবল তাকিয়ে তাকিয়ে বড় বড় টসটসে কমলা লেবুর দিকে সতৃষ্ণ নয়নে দেখেছে।

একজন মোটা মতন ভদ্রলোক গাড়ী করে এসেই দোকানের বড় বড়

কমলালেবুগুলো দিতে বললেন ফলওয়ালাকে। মোটেও দর করলেন না। বড় একটা ঠোঙায় দু টাকার কমলালেবু কিনলেন আর ফলওয়ালা কত তাড়াতাড়ি আগ্রহ করে সব থেকে বড় বড় লেবুগুলো বেছে বেছে তাঁকে দিল। আর নেবেন না বাবু! দিই আর দু টাকার।

দাও।

নেহাৎই হেলা হয়ে ভদ্রলোক যেন সম্মতি দিলেন আর ফলওয়ালা আরো এক ঠোঙা লেবু ভরল।

হরিপদ বেছে বেছে অতি সন্তর্পণে যেন দুটি লেবু কিনল।

এ দুটো লেবু কার কার বাবা?

এতক্ষণে খোকা আবার জিজ্ঞেস করল।

দুটোই তোমার মায়ের জন্য। চলতে চলতে জবাব দিল হরিপদ।

আমি একটা নেব বাবা?

না খোকা বেশী জালিও না।

তবে আমি যাব না। খোকা দাঁড়িয়ে পড়ল। আমাকেও একটা দিতে হবে। দুটো তো কিনলে।

কি মুস্কিল করলে। খোকা মার খাবে কিন্তু। আমার আর পয়সা নেই। কোথা থেকে পাব? জান তো তোমার মায়ের জন্য দুটোই দরকার।

তবে আমি একটা চেয়ে আনি। ফলওয়ালার তো কত আছে। যাই না বাবা।

বাবার হাত ছেড়ে দিল খোকা।

ঠাস করে এক চড় বসিয়ে দিল হরিপদ খোকার নরম তুলতুলে গালে।

বদমাশ ছেলে। পথের মাঝে অসভ্যতা? কারও কাছে চাইতে হয়? হ্যাংলা বলবে না তাহলে?

মার খেয়েও কাঁদল না খোকা! কেবল তার বড় বড় পাতাওলা কাল চোখ থেকে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। হরিপদ সেটা অনুভব করেও কিছু বলল না, শুধু খোকার হাতটা চেপে ধরে চলতে আরম্ভ করল।

ছেলেটিকে মেরে মনটা তার কেমন নরম হয়ে গেল। সে ডাকল; খোকা!

খোকা সাড়া দিল না।

খোকা! তুমি তো বাবা লক্ষ্মী ছেলে। বই পড়তে শিখেছ। তুমি তো জান কারও কাছে কিছুই চাইতে নেই। হাস না তুমি?

খোকার মুখের দিকে ঘাড় কাত করে তাকাল সে। দেখল একহাতে চোখের জল মুছে খোকা চলতে চলতে ঘাড নাড়ল।

শোন খোকা কাল তোমাকে আমি দুটো লেবু কিনে দেব। কেমন?

কোন উত্তর না দিয়ে খোকা বাবার হাত ধরে চলতে লাগল।

আশুতোষ কলেজের সামনে এসে হরিপদ একবার তাকিয়ে দেখল কলেজ বিল্ডিংটার দিকে। এখানেই সে পড়েছিল। তখন তার কত আশা। হরিপদ মিত্র তখন কলেজেরও আশা। যেবার ম্যাট্রিকে থার্ড হয়ে সে কলেজে ভর্তি হল সেবারই তার বাবা মারা গেলেন। ভাল ছাত্র সে, তাই সেইটুকুর উপর ভরসা করেই দাদারা তার পড়াশুনা চালিয়ে গেলেন বি, এ, পর্যন্ত। এর পর কোনদিনও সে সেকেণ্ড ছেড়ে থার্ডও হয়নি।

বন্ধুরা ওকে বলত 'বইয়ের পোকা'। কত ঠাট্টা বিদ্রূপ, কিন্তু হরিপদ গায়ে মাখেনি, শুধু হাসত, বলুক না বন্ধুরা, তারা কতটা জানে। হরিপদর দৃঢ় সঙ্কল্প যে ওকে ভাল করে পাশ করতেই হবে। তার ওপর শুধু সংসারের সুনামই তো নির্ভর করছে না, সারা কলেজের সুনামও, আর সেই সঙ্গে নিজের জীবনও। নিজের জীবন বলতেও ওতো পড়াই বোঝে। 'ওহে পরিপদ! বলি বই ছাড়াও বাইবের জগতে যে খবর কিছু আছে, সে খবর রাখ? তোমার জীবনে তো দেখছি বই ছাড়া কিছুই নেই'।

বন্ধুদের এ সব মন্তব্যে বিচলিত হয়নি হরিপদ। প্রাণপণে খালি পড়ে গেছে।

সেবার এম এ পড়ার সময় একজনের সঙ্গে তার প্রথম বন্ধুত্ব হ'ল জোর রকমের।

সে প্রণব।

সকলে কম অবাক হয়নি, তার এই বন্ধু নির্বাচনে। এতদিন পরে যখন বই ছাড়া অন্য বস্তু তাকে আকর্ষণই করল সে কিনা নারী না হয়ে পুরুষ? কিন্তু হরিপদ নির্বিকার। প্রণবকে ও ভালবাসে তার মনের জন্য। প্রণবের

জগতই আলাদা। পড়াশুনা তো করে প্রচুর তাছাড়া বাইরের জগতের কত খবর তার কাছে। হরিপদর ছোট আকাশের সীমানা ও যেন কত সহজে বাড়িয়ে দিতে পারে।

সেই প্রণবই একদিন খবর দিল অনিমার। আমার মাসতুত বোন। বেশী পাশ না করেও যে একটা মেয়ে কত শিক্ষিত হতে পারে তার প্রমাণ পেতে পারবে ওর সঙ্গে আলাপ করে।

আলাপ হল অতি সহজেই। হরিপদ তৃপ্ত হয়ত হয়েছিল, কিন্তু তার বেশী নয়। সকলের সব সন্দেহকে ভূমিসাৎ করে সে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিল যে বই ছাড়া আর কোন জিনিষকেই ভালবাসা তার পক্ষে সম্ভব নয়। বইকেই সে শুধু ভালবেসেছিল। কলেজের অধ্যাপকরা আশা করেছিলেন সে বেশ একটা রেজাল্ট করবে, কলেজের মুখ উজ্জল করবে। বাড়ীর লোকেরা স্থির নিশ্চিত ছিলেন সে ভালভাবে পাশ করে বড চাকরী পেয়ে সংসারের সব কষ্ট ঘুচিয়ে দেবে।

কিন্তু কোন কিছুই হ'ল না হরিপদর। এমন কি ফার্ষ্ট ক্লাশও পেল না। একটা উঁচু দরের সেকেণ্ড ক্লাশ পেয়ে তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হল। তার আজীবনের সাধনা একবারের অসাফল্যে নষ্ট হয়ে গেল।

যে ছেলেটি ফার্ষ্ট হল তার নাকি বরাবরের রেজাল্ট ভাল না। তার বাবা পরীক্ষক ও অধ্যাপকদের একজন বলে না আরও কি সব কারণে উঁচু নম্বর পেতে তার কষ্ট হয়নি। কেউই যদিও ফার্ষ্ট ক্লাশ পায়নি, তবুও তারই জন্য হরিপদ সেকেণ্ড ক্লাশ ফার্স্ট হ'তে পারল না।

হরিপদ রীতিমত ভেঙ্গে পড়ল। তার আশা ছিল এবার সে গবেষণা করবে। কিন্তু তাও তো হ'ল না।

পরিমল নামে যে ছেলেটি ফার্ষ্ট হল সে বিলেত যাবার আগে বিয়ে করে নিয়ে গেল অনিমাকেই। অথচ প্রণবের মুখে সে শুনেছিল অনিমার নাকি খাঁটি স্কলারদের ওপর বেজায় ঝোঁক যার জন্য হরিপদই তার মনোনীত ছিল। যাক সে কথা।

নিজের ময়লা ছেঁড়া পাঞ্জাবীটার দিকে তাকাল একবার হরিপদ।

পরার যোগ্য দ্বিতীয় পাঞ্জাবী আর না থাকায় এটাই তাকে পরতে হচ্ছে আজ সাতদিন না কেচে।

ঘরে সুরমা অসুস্থ। খোকা জন্মাবার পর একটি মেয়ে হবার পর থেকেই সুরমা ক্রমশঃ শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল। মেয়েটি মারা গেল তিনমাসের ভেতরই, কিন্তু তার মাকেও আধমরা করে রেখে গেল।

কত আশা করে সুরমার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন মা, হরিপদর প্রবল আপত্তি থাকা সত্ত্বেও।

বিয়ে না করলে কি চলে? আমি চোখ বুজলে সংসার দেখবে কে? মার চোখে জল, কিন্তু তাতেও টলেনি হরিপদ।

সে চলে যাবেই। যারা বিয়ে করে না তাদের সংসার চলে না? সবে যাহোক একটা চাকরিতে ঢুকেছি, এই তো মাইনে, এতে চালাব কোথা থেকে?

সেইজন্যেই তো গরীবের ঘরের স্বাস্থ্যবতী মেয়ে আনছি বাবা। গতরে খেটে সে তোমার সংসারে লক্ষ্মী আনবে।

লক্ষ্মী এনেছেই বটে।

মা তো তাঁর কর্তব্য শেষ করে চোখ বুজলেন। আর বিয়ের সাত বছরের মধ্যেই তিনটি ছেলেমেয়ের জন্ম দিতে গিয়ে লক্ষ্মীর আহ্বানকারিণী শয্যাশায়ী হলেন। গতরে খাটা তার হ'লই না। এখন তাকে রক্ষা করাই এক সমস্যা।

মাসকাবারে হাতের পয়সা একেবারে শেষ হয়েছে, অথচ লেবুর রসের সঙ্গে ঔষধটা তাকে খাওয়ানোর প্রয়োজন। তাই যে করেই হোক লেবু দুটি তাকে কিনতেই হল। অন্য অনেক অবশ্য করণীয় এজন্য তাকে বাদ দিতে হ'ল।

খোকার জামাটার দিকে একবার তাকাল হরিপদ। ছেলেটার এত শখ বাইরে বেরোবার। খাঁচার মত দুখানা ঘরের থেকে বার হতে পারলে যেন বেঁচে যায় সে। কিন্তু জামা কাপড় তো নেইই, তার স্বাস্থ্যও এত হাঁটার উপযুক্ত নয়। কিন্তু খোকা তো শোনে না। তাই অফিসে ছাড়া সব সময়ই খোকাকে সে সঙ্গে নেয়, তাতে বড় মেয়েটাও একটু রেহাই পায়। রান্না

থেকে আরম্ভ করে সংসারের যাবতীয় কাজ তো সেই-ই করে। ভাইটাকে বাবা একটু আগলালে তার খানিকটা সাশ্রয় হয়।

বাবা! ও বাবা।

চিন্তায় ছেদ পড়ল হরিপদর।

বল।

আচ্ছা, মা দুটোই খাবে কেন?

চোখদুটো জ্বালা করে এল হরিপদর। খোকা তাহলে এতক্ষণেও লেবুর কথা ভুলতে পারেনি। মার যে অসুখ বাবা।

আমারও কাল অসুখ করবে। আমাকেও দুটো দেবে তো বাবা।

যেন হৃৎপিণ্ডে একটা ধাক্কা লাগল হরিপদর, কি যে ভালবাসে ছেলেটা কমলালেবু। সামান্য তো জিনিষ, কিন্তু তাদের পক্ষে তাই বিলাসিতা। যে করেই হোক ও-মাসে মাইনে পেলেই হরিপদ একেবারে এক টাকার লেবু কিনে ফেলবে।

খোকা!

উঁ:—

তোমার খুব ভাললাগে কমলালেবু খেতে, না?

হ্যাঁ বাবা।

তোমার অসুখ করবার দরকার কি বাবা? দেখ না দুতিন দিন বাদেই তোমাকে একসঙ্গে এক টাকার কমলালেবু কিনে দেব।

এক—টাকার?

খোকা টেনে উচ্চারণ করল।

সেই লোকটা যেমন একটা ঠোঙা নিয়ে গেল তেমনি, না বাবা?

হ্যাঁ।

ছোট একটা উত্তর দিয়ে খোকার হাত ধরে মোড়টা পেরোতে গেল হরিপদ।

ঠিক এই সময়েই ওপাশের রাস্তা থেকে মোড় ফেরাবার জন্য গাড়ীটা এসে যে তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেবে তা কে জানত?

অনেক লোকজন ছুটে এল।

হৈ চৈ করে উঠল সবাই। ভিড় সরিয়ে লোকজনদের বুঝিয়ে গাড়ীর আরোহী ওদের কাছে এলেন। খোকার কিছু হয়নি, কিন্তু হরিপদ হুমড়ি খেয়ে রাস্তায় পড়েছে। হাঁটুর কাছে কাপড় খানিকটা ছিঁড়ে গেছে, হাতের চেটো আর কনুই থেকে অল্প অল্প রক্ত বেরোচ্ছে।

যেখানে হরিপদ পড়েছিল, সেখানেই তার হাত থেকে ছিটকে যাওয়া লেবু দুটো পড়ে রইল।

দামী সুটে নিজেকে মুড়ে যে ভদ্রলোক সান্ধ্য ভ্রমণে খুশী মনে বেরিয়েছিলেন, তিনি তাঁর বিরক্তিভরা মুখে কষ্ট করে হাসি টেনে সবিনয়ে এগিয়ে এলেন। হরিপদ ততক্ষণে ধুলো ঝেড়ে ওঠবার চেষ্টা করছে।

আমি সত্যিই দুঃখিত। আপনার খুব লেগেছে বুঝি ?

না তো কি ঠাট্টা করছি পড়ে যাওয়ার ভান করে, হরিপদ মনে মনে ভাবল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীর হয়ে বলল :

না বিশেষ কিছু হয়নি। অল্প ছড়ে গেছে।

চলুন আপনাকে পৌছে দিয়ে আসি।

ভদ্রলোক উৎসুক চোখে তাকালেন ওদের দিকে।

এস খোকা।

খোকার দৃষ্টি এতক্ষণ লেবু দুটোর ওপর ছিল। হাত বাড়িয়ে নিতে গেল সে লেবু দুটো আর সেই সময়ই খোকাকে হাত ধরে টানতে গিয়ে দামী জুতো শুদ্ধ পায়ে অজান্তে মাড়িয়ে দিলেন ভদ্রলোক লেবু দুটোকে।

আমাদের লেবু !

প্রায় আর্তনাদ করে উঠল খোকা।

কি হল ?

হকচকিয়ে একটু পিছু হটে গেলেন ভদ্রলোক। ছেলেটি হঠাৎ চেঁচাল কেন ?

আমাদের কমলালেবু।

প্রায় ফুপিয়ে উঠল খোকা।

কই, ওঃ! লেবু।

এতক্ষণে পায়ের দিকে চোখ পড়তে বুঝতে পারলেন উনি।

তাতে কি? এই নাও।

গাড়ীর ভেতর বড ঝুড়ির মধ্যে থেকে এক ঠোঙ্গা কমলালেবু বার করে আনলেন তিনি। খোকা দেখল ঠিক সেই ভদ্রলোকের ঠোঙ্গার মত মস্ত বড় বড় কলালেবুতে ভর্তি।

তাড়াতাড়ি সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে এগিয়ে বাবার হাত ধরল খোকা।

বাবা চল।

খোকা শোন। গাড়ীতে এস, তোমাদের পৌঁছে দেব।

না।

গম্ভীর হয়ে বলল হরিপদ।

হেঁটেই যাব, অভ্যেস আছে।

না আহত হয়েছেন, তাই……

দরকার নেই।

তাহলে এই লেবুর ঠোঙ্গাটা নাও খোকা।

ভদ্রলোকের গলায় বেশ আগ্রহ।

না।

এবার মোটা গলায় বলল খোকা। তারপর তার বাবার যাত ধরে এগিয়ে গেল।

বাড়ীর দরজায় এসে কডা নাড়ল হরিপদ। বাবা।

খোকা ডাকল, এতক্ষণ সে একটি কথাও বলেনি।

কি?

হরিপদর স্বর বিষণ্ণ।

আমাকে দিলেও আমি কিন্তু নিইনি বাবা। আমি তো চাইনি তবু দিল কেন বাবা? কিন্তু আমি নিইনি। আমি কি হ্যাংলা?

বড় বড় চোখ মেলে তাকাল খোকা বাবার মুখের দিকে। হঠাৎ কোন উত্তর দিতে পারল না হরিপদ; শুধু তার হাতটা আরো শক্ত করে ধরে বাড়ীর ভেতর উঠে এল।

কমলালেবু

খাবারের ঠোঙাটি হাত থেকে পড়ে গেল অমিতার।

"শেষকালে ঘুষ নিলে?" সমস্ত গা ঘিনঘিন করতে লাগল তার স্বামীকে এ কথা জিজ্ঞেস করতে।

"তাছাড়া উপায় কি?" নির্বিকারভাবে কোটটি আলনায় রাখতে রাখতে বললেন বিপিনবাবু।

বেশ খুশীই হয়েছিল সে হঠাৎ খাবার দেখে। এসব আনার অভ্যেস বিপিনবাবুর নেই। খাবার তো দোকানেই রয়েছে, সেখানে বসে খেলেই যখন ইচ্ছাপূরণ হওয়া সম্ভব তখন মিছিমিছি মোট বইবার বোকামি আর কেন? কিন্তু ঘুষের টাকায় কেনা খাবার? ছিঃ!

বয়সের ও স্বভাবের অনেক বেশি তফাৎ থাকা সত্ত্বেও বিপিনবাবুকে বেশ মেনেই নিয়েছিল অমিতা। স্বভাবতই বিপিনবাবু কড়া মেজাজের লোক। তাছাড়া অমিতা এও জানে—স্বার্থের খাতিরে না করতে পারেন বিপিনবাবুর কাছে এমন কাজ খুব কমই আছে। তবু শেষকালে তাঁর অর্থ-লালসা যে এমন একটি সর্বনাশের পথ নেবে, এতটা কল্পনা করতেও তার বাধছিল। চমক ভাঙল বিপিনবাবুর ধমকে।

"ওকি, খাবার ফেলে দিলে কেন?" ঠোঙাটি এমনিই পড়ে গিয়েছিল নিজের অজান্তে, কিন্তু সেই আকস্মিক ঘটনার ওপরেই নিজের ইচ্ছাকে আরোপ করে অমিতা উত্তর দেয় এবার:

"ও খাবার ছেলের মুখে আমি দিতে পারব না।"

"আলবাত দেবে।" দাঁত খিঁচিয়ে উঠলেন বিপিনবাবু, "বেশী তেজ হয়েছে, না? হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলে যে? তিন টাকার খাবার, সে হুঁশ আছে? তোমার বাপের বাড়ী থেকে আসেনি মনে রেখো।"

স্তম্ভিত হয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকে অমিতা। এ ব্যবহার তার কাছে নতুন নয়, কিন্তু প্রতিবারই বাপের বাড়ীর দৈন্যের উল্লেখে সে স্তম্ভিত না হয়ে পারে না।

"এ বুদ্ধি তোমাকে কে দিলে শুনি?" নিরুপায় হয়ে খাবারের ঠোঙাটি তুলতে তুলতে নীচু গলায় জিজ্ঞেস করল অমিতা।

"অন্তত তোমার থেকে তার বুদ্ধিটা কিছু বেশীই মনে হয়।" ক্যান্‌ভাসের ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে বললেন বিপিনবাবু।

"আচ্ছা কোন কথার ভাল উত্তর কি জীবনেও পাব না তোমার কাছ থেকে?"

"কেমন করে পাবে বল? আমি তো আর তোমাদের প্রগতিবাদী নব্য ছোকরা নই!"

বড় একটি নিশ্বাস ঠেলে বেরিয়ে এল অমিতার বুক থেকে। এ ইঙ্গিতের অর্থ সে বেশ ভালই বোঝে। প্রতিবাদ না করাই ভাল। আস্তে আস্তে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। এখনও কিছু কর্তব্য বাকি আছে তার।

কিছুক্ষণ পরে একটি রেকাবিতে কিছু খাবার নিয়ে অমিতা ঘরে ঢুকল। খাবারটা টুলে রেখে জল গড়াতে গড়াতে বলে, "নাও খাও।" তারপর ভাল করে তাকিয়ে দেখে—বিপিনবাবুর কোলের ওপর একখানা আধখোলা বই, যে বইখানা অমিতা একটু আগে পড়ছিল।

খাবার দেখে বেশ একগাল হেসে তারিফ করে বিপিনবাবু বলেন, "নাঃ, তুমি দেখছি একটা কিছু না হয়েই ছাড়বে না। দেখো বাপু, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের ভাতটুকু আর মেরো না।"

"মানে?"

"কার বই এখানা? কোলের ওপর থেকে বইখানা তুলে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে নিজের অনুমান জ্ঞাপন করেন তিনি, "বোধ করি তোমার সেই গুরুদেবের?"

এসব ব্যাপারে তাঁর অনুমান গোয়েন্দা-সিরিজের নায়কের চাইতেও অভ্রান্ত। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে একটু ইতস্তত করে বেশ স্পষ্টভাবেই উত্তর দেয় অমিতা, "হ্যাঁ, নিখিলবাবুই দিয়েছেন।"

"সে তো নিশ্চয়ই, নাহলে আর এ হেন রত্ন আমদানি করবেন কে"? বইখানি সশব্দে টুলের একপাশে রেখে দিয়ে বিপিনবাবু বলেন, "কিন্তু আমার বাড়ীতে এসব প্রগতি-ট্রগতি চলবে না এ আমি বলে দিলুম। হুঁঃ, প্রগতি! এজন্যেই শালা বিদুষী বউ ঘরে আনে না বুদ্ধিমানেরা।" অতএব বুদ্ধিমানের উপযুক্ত পরিচয়ে ডান হাতের কাজ চালাতে লাগলেন তিনি। আর খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে চলতে লাগল মন্তব্য, "তখনই জানি। অন্ত্যজ ঘরের মেয়ে আনতে নেই। সম্বন্ধই পাততে নেই। মান গেল, সম্ভ্রম গেল, ছেলেটারও যে কি শিক্ষা হবে—ছিঃ!" শেষ রসগোল্লাটি মুখে পুরে ঢক্‌ঢক্ করে একগ্লাস জল নিঃশেষ করে ফেল্লেন বিপিনবাবু।

চুপ করে থাকে অমিতা। মানসম্ভ্রম আর শিক্ষার ধারণাতেই যখন দুজনের আকাশ-পাতাল পার্থক্য তখন বাপের বাড়ীর মান-অপমান নিয়ে আর প্রতিবাদ করে লাভ কি? তাছাড়া পনেরো বছরের দাম্পত্যজীবনের টানা-পোড়েনে সে আজ ক্লান্তও বটে।

কিন্তু ক্লান্তিহীন বিপিনবাবু! গেলাসে আঙুল ডুবিয়ে আলগোছে ঠোঁট মুছে হঠাৎ পিতৃকর্তব্যের বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠেন তিনি।

"ছেলেটা গেল কোথায়? তার জন্য কিছু রাখলে? না বললে তো আবার সে জ্ঞানটুকুও থাকে না। যে মায়ের ছব্বা!"

রীতিমত অবাক হয় অমিতা। ধীরে ধীরে বলে, "রেখেছি, যদিও না রাখতেই উচিত ছিল। কিন্তু—" কথা না বাড়িয়েই প্রশ্ন করে অমিতা, "তোমায় একটা কথা বলব?"

"ও বাবা! এ যে একেবারে নভেলি ভূমিকা। যা বলবে চটপট বল। আমার সময় নেই। বেরোব।"

"এই সামান্য লোভটুকু ত্যাগ করতে পারলে না তুমি? পরের অনিষ্ট করে কি কখনও ভাল হয়? অন্যায়ের সায় দিয়ে যাওয়া তো আরও অন্যায়।

বিশেষ করে দীপু রয়েছে, তার কথাও তো ভাবতে হয়। এমনি করে এক দিনের লোভে কি ভবিষ্যৎ খোয়াবে তুমি ?”

“বলে যাও! বলে যাও! বক্তিমে তো ভালই হচ্ছিল। থামলে কেন? হুঁঃ লোভটা আমারই হল বটে। ওষুধে জল মেশাচ্ছে তাতে আমার কি? পুলিশ এল আর আমি অমনি তাদের গলা জড়িয়ে সব কথা ফাঁস করে দিই আর কি? বলি কোম্পানীটা বন্ধ হলে খেতে কি? ঘুষ! কর্ত্তা খুশি হয়ে কিছু দিলে তাকে ঘুষ বলে না, সেটা—সেটা বোনাস, বুঝলে বোনাস।” বেশ জুতসই একটা কৈফিয়ৎ দিতে পেরে নড়েচড়ে বসেন বিপিনবাবু, তারপর আবার বললেন, “লোভ! লোভী! জিজ্ঞেস করি তোমরা কি মুখে তালা-চাবি এঁটে রাখবে? পার তো আমার এই পাপের টাকাতে কেনা খাবারই তোমার গুরুদেবের জন্যেও একটু ঘেন্না-ঘেন্না করে রেখে দিও!”

ইঙ্গিতটা নিখিলের প্রতি। অমিতার বাপের বাড়ীর পাড়ায় থাকত, তার ছেলেবেলার বন্ধু। “নিখিলবাবু তো আর আসে না।” ধীরে ধীরে উত্তর দিল অমিতা।

“তবে বইটা কি উড়ে এল?” ঘাড় কাত করে প্রশ্ন করেন বিপিনবাবু।

“সমিতির একটা মেয়ের হাত দিয়ে পাঠিয়েছেন।”

“ও বাবা, আবার সমিতি! বলি ন্যাতা-ট্যাতা কিছু করে ছায়নি তো?”

“সে ভাগ্য কি আমার?” থালা-গেলাসগুলো তুলে নিতে নিতে যথা-সম্ভব শালীন্য বজায় রেখেই বলবার চেষ্টা করে অমিতা। যা তার জীবনের স্বপ্ন, যে জীবনাদর্শের কথা নিখিলের কাছে সে শুনেছে তাকে কি কোনদিনই সে জানতে পারবে? সে তো বন্দিনী। এক চাকাতেই বাঁধা তার জীবন। খাওয়ার পর রাঁধা। কি কাজ হবে তার দ্বারা? তার স্বপ্ন চিরদিন স্বপ্নই থেকে যাবে।—চিন্তায় বাধা পড়ে তার বিপিনবাবর কথায়।

“যাই, সন্ধ্যেটা আর তোমার সঙ্গে বসে বসে নষ্ট করব না। এতক্ষণে ওরা বোধহয় এসে গেছে।” হঠাৎ বেখাপ্পাভাবে উঠে আলনা থেকে জামা টেনে তাসের আড্ডার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন বিপিনবাবু।

ডালটা পুড়ে যায়নি তো? অমিতাও বেরিয়ে আসে ঘর থেকে।

একতলার দুটি ঘরে ওরা থাকে। উঠানের পাশে একফালি রোয়াকে রান্নার ব্যবস্থা। মাথার ওপর যে দরমার ছাউনি দেওয়া হয়েছিল, তার প্রায় সবটাই লোপাট হয়ে গেছে বহুকাল আগে। তাই বেলা থাকতেই রান্না চাপিয়ে দেয় অমিতা।

ডাল সাঁতলানো শেষ করে ভাত চাপাতে চাপাতে মনটা অনেক হাল্কা হয়ে আসে তার। কি লাভ অযথা মন-খারাপ করে। 'ছায়ার সাথে কুস্তি' —সত্যি কথাই লিখেছে দীপুর বইখানাতে। বইয়ের কথা মনে হওয়ায় ভাত চাপিয়ে ঘরে ফিরে এসে বিপিনবাবুর ফেলে-দেওয়া বইখানা টুল থেকে আবার তুলে নেয় অমিতা। বেশ লাগছে: যত পড়ছে, ততই ভাল লাগছে তার।

"মা জানো, আমায় ক্লাবের ক্যাপ্‌টেন করে দিয়েছে।" একটু পরেই চীৎকার করতে করতে ঢুকলো দীপক। তার বগলে ফুটবল, চোখ মুখ খুশিতে ভাসছে। বই থেকে চোখ তুলে হাসল অমিতা। তারপর তাকে কাছে বসিয়ে গায়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে অনুযোগ করে, "কিন্তু দীপু, দেরি দেখে তোমার বাবা কত রাগ করছিলেন। এত দেরি করে ফেরে কি ছোট ছেলেরা। এত দেরি কোরো না বাবা।"

"আচ্ছা মামণি।" কাদামাখা হাতে মার গলা জড়িয়ে ধরে প্রবলবেগে মাথা নাড়ে সে।—"কিন্তু এখন তো মোটে সাড়ে ছটা।"

"তুমি বুঝি রাগ করেছ মামণি।" আরও জোরে সে মার গলা জড়িয়ে ধরে।

"না রে পাগলা। আচ্ছা ছাড় দেখি আমায়। তোর খাবার দিই।" হাসিমুখে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় অমিতা।

খাবার খেতে খেতে অসীম উৎসাহে বলে চলে দীপক তার কৃতিত্বের কথা। জিজ্ঞেস করে, "হ্যাঁ মা, নিখিলমামা জানে যে আমি এমনি ভাল খেলতে পারি।"

"জানেন বৈকি রে। কত প্রশংসা করেন তিনি আমার কাছে।" ভাতের ফেন গালতে গালতে উত্তর দেয় অমিতা।

"নিখিলমামা আর আসেন না কেন মা?"

কি উত্তর দেবে অমিতা? নিজেকে আর প্রবঞ্চনা করতে ইচ্ছে হয় না, তবু বলে, "কাজে আটকা পড়েছেন বোধহয়।"

"তা কেন? আমাদের রাস্তা দিয়ে তো প্রায়ই যান।"

"তাই নাকি? তা হবে।" উনুনে তরকারির কড়া চাপিয়ে কথাটার ছেদ টানতে চায় অমিতা। কিন্তু দীপক যেন সদ্য পদপ্রাপ্তির আনন্দে ঘুরে ঘুরে নিখিলের কাথই জিজ্ঞেস করে আজ। নিখিল যে তার বড় আপন। দিন দিন সস্নেহ ব্যবহারে কাছে টেনেছে তাকে নিখিল। তার বাবার রূঢ় স্নেহহীন ব্যবহারের তুলনায় সে যেন সস্নেহ নীড় খুঁজে পায় মা ছাড়া একমাত্র নিখিলমামারই কাছে। বাবার থেকেও তাই সে বেশী ভালবাসে নিখিলমামাকে। একথা সে বারবার প্রকাশ করতে ছাড়ে না। কত বই পড়তে দিয়েছেন তাকে নিখিলমামা। কত দেশ-বিদেশের কথা শুনিয়েছেন তাকে। ভারী ভাল ভাল গল্প বলতে পারেন নিখিলমামা। মার সঙ্গেও কি সুন্দর ব্যবহার করেন তিনি। বাবার মতো রাতদিন দাঁত খিঁচিয়ে কথা বলেন না।

"বিচ্ছিরি লাগে বাবাকে আমার।" হঠাৎ বলে ওঠে দীপক।

"ছিঃ দীপু, বাবা হন না।"

"তা হলেই বা। বাবা কেন তোমাকে শুধু শুধু বকে? নিখিলমামা কত ভাল, তবু নিখিলমামাকেও বাবা ভালবাসে না।"

"হ্যাঁ তুই ভারী জানিস কিনা।" হেসে ফেলে অমিতা।

"জানিই তো।" প্রতিবাদ করে দীপক।

"তা হোক দীপু।" বাধা দেয় অমিতা।

"না মা। বাবা নিশ্চয়ই বিচ্ছিরি। নিখিলমামা যখন আগে আসত, তখন বাবা রোজ আমাকে জিজ্ঞেস করত, কি কথা বলে তোমাকে? আমি কিন্তু কিছু বলিনি মা। তুমি যে নিখিলমামার কাছে পড় তাও বলিনি। আমি খুব চালাক, না মা।"

চুপ করে থাকে অমিতা। নিখিলকে নিয়ে স্বামীর এই মিথ্যা সন্দেহ সব সীমাই ছাড়িয়েছে। সৌজন্য-জ্ঞান তো নেই-ই, সৎসাহসও নেই যে স্পষ্ট করে নিখিলের সামনে কিছু বলেন। সমস্ত রাগ তাই সুদে-আসলে মিটিয়ে নেন অমিতার ওপর। তাইতো নিজেই একদিন বারণ করে দিয়েছিল অমিতা

নিখিলকে, "তুমি আর এর বাড়ীতে এসো না। শেষে কি একটা কেলেঙ্কারি হবে?" গলায় তার রীতিমত ভয়ের আভাস ছিল।

"তুমি বলো তো আর আসব না। কিন্তু কেন?"

"ওঁকে তো চেন।"

"বুঝলাম।" বড় নিঃশ্বাস একটা ফেলেছিল, "কিন্তু তোমার ওপর ছোটবেলা থেকে কত জোর খাটিয়েছি আমি! আর আজ যখন নিজে সত্যিকারের একটা পথ পেলাম, তোমার কোন কাজেই লাগতে পারব না ভেবে দুঃখ পাই। উন্মুখ মন নিয়েও সমাজের কোন সেবা তোমার দ্বারা হবে না। কি অসহায় অবস্থা বল তো।"

"তোমার জোর তোমারই আছে। জানি না একদিন এ অবস্থার অবসান হবে কিনা। কিন্তু সমাজের জীব তো আমরা। স্বামীর অমতে কোন কাজ করা কি সম্ভব?"

"হয় তো সম্ভব, হয় তো নয়—যে যেমন মনে করে। যাক সে কথা।" কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিল নিখিল, "কিন্তু নিজেকে তুমি পরাজিত হতে দিও না অমিতা। আমি আসি বা না-আসি তাতে কিছু আসে যায় না। তোমার মধ্যে যে সঙ্কল্প দেখেছি তা যেন নিভে না যায়, মনে রেখো দীপুর ভার তোমার ওপর। ও যেন সত্যকারের মানুষ হয়।"

চোখে জল এসে যায় অমিতার, "ও যে আমার কত সাধের তুমি বুঝবে না নিখিল।"

"বুঝি অমিতা।" বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে নিখিল—"আর এও জানি আমার জন্যে দীপুকে অনেক অত্যাচারই সহ্য করতে হয়। সেই জন্যই তার কথা মনে হচ্ছে।" গলা ভারী হয়ে আসে নিখিলের, "আচ্ছা আমি যাই, কোন দরকার পড়লে আমায় খবর দিও।"

"দেব।"

"চলি। কয়েকটা দিন বড় দুঃখে কাটল তোমার।"

তারপর আরও কি বলতে গিয়ে হঠাৎ মোড়া থেকে উঠে পড়েছিল। প্রশান্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে অমিতার নীচু-করা মুখের দিকে একবার দেখে নিয়ে আস্তে আস্তে রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হয়েছিল।

সে আজ কতদিন।

মাস কয়েক পরের কথা।

শীতের ভোরে অনিচ্ছুক শরীর আর মনকে লেপের তলা থেকে যেন টেনে বার করতে হয়। পাশেই দীপক ঘুমুচ্ছে। ও পাশের তক্তপোশে আকণ্ঠ লেপ জড়িয়ে ঘুমুচ্ছেন বিপিনবাবু। মাথার দিকের জানালাটা বন্ধ করে দীপকের গায়ে লেপটা ভাল করে টেনে দেয় অমিতা। তারপর শাড়ীটা গুছিয়ে নেয়।

আজ বেশ শীত পড়েছে, মনে মনে ভাবে আর নীচু গলায় উচ্চারণও করে। কদিন থেকেই একথা বলছে সে। কে জানে এতে শীতজয়ের গরিমাটুকু বেড়ে যায় কিনা।

উনুনে আঁচ দিয়ে কড়া নাড়ার শব্দে খিড়কি দরজা খুলতে যায় সে। বাসন-মাজার ঝি এল বোধহয়।

"বড্ড বেশী দেরী করেছ।" দরজাটা খুলতে খুলতে বলে অমিতা।

"বিশেষ দেরি হয়েছে কি? এখনও তো ভাল করে ভোরই হয়নি" হাসতে হাসতে বলে নিখিল।

"একি তুমি!" আচমকা কয়েক পা পিছিয়ে যায় অমিতা।

"হ্যাঁ আমিই। একটা জরুরী কথা আছে। তোমার অনুরোধটা আর রাখতে পারলাম না তাই এসে পড়লাম।"

পায়ের নখ দিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগল অমিতা। নিখিলের হাসিকে হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা জানাতে পারল না। হঠাৎ যদি বিপিনবাবু এসে পড়েন। মনে তার যেন কাঁটা দিয়ে উঠল। নিখিলই কথা শুরু করল, "আজ সাতটার ট্রেনে বাড়ী যেতে হচ্ছে। বাবার খুব অসুখ।"

"তোমার জামাগুলো সেলাই হয়ে থাকলে অপর্ণার হাতে দিয়ে দিও, পার তো আরও কয়েকটা সেলাই করো। দক্ষিণের বস্তির বাচ্চাগুলো শীতে বড় কষ্ট পাচ্ছে। কাপড় অপর্ণাই দেবে। আর বইপত্র যা দরকার দীপুকে দিয়ে নরেনের কাছ থেকে আনিয়ে নিও। কিন্তু—" একটু থেমে বলে, "অসুবিধে হচ্ছে মেয়েদের কেন্দ্রটি নিয়ে।"

"কী অসুবিধে?" এতক্ষণে জড়তা কাটে অমিতার।

"গৌরীর বাবা আর ওকে পড়াতে যেতে দেবেন না। তুমি এর পরিপূর্ণ ভার নাও অমিতা।"

"কিন্তু আমার পক্ষে বাড়ীর বাইরে গিয়ে পড়ানো তো সম্ভব হবে না।"

"বেশ, তোমার বাড়ীতেই কর তাহলে, সপ্তাহে তিনদিন সেলাই আর তিনদিন লেখাপড়া। সে তিনদিন তোমার এখানেই তো হতে পারে।"

"কখন? দুপুর বেলাতেই তো?"

"হ্যাঁ। বেলা দুটো থেকে চারটে পর্যন্ত। কথা দাও অমিতা। নাহলে আমি ফিরে এসে দেখব কেন্দ্রটি ভেঙ্গে গেছে। কিন্তু তোমার ওপর আমার বিশ্বাস আছে।"

বিশ্বাস আছে তার ওপর? সে পারবে এতগুলো নীচুতলার মানুষকে খোলা হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিতে সাহায্য করতে? কেমন উন্মুখ হয়ে ওঠে অমিতার মন। বলে, "আচ্ছা, কিন্তু তুমি কবে ফিরবে?"

"বুঝতে পারছি না। দেরিও হতে পারে। তবে এর মধ্যেও ফিরতে পারি। সবই নির্ভর করছে ওখানকার অবস্থার ওপর।"

অমিতা চুপ করেই থাকে। নিজের থেকে জিজ্ঞাসা করা ওর স্বভাবের মধ্যে নেই।

"হ্যাঁ, দীপু কোথায়?" অন্য কথা পাড়ে নিখিল।

"ঘুমুচ্ছে, ডাকব?"

"থাক, বেচারাকে কষ্ট দিয়ে আর কাজ নেই। কতদিন যে আদর করিনি ওটাকে। আচ্ছা আজ চলি, কেমন?"

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে অমিতা। তারপর যতক্ষণ দেখা যায় দরজা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। যে দরজা দিয়ে সে বেরিয়ে পড়তে পারে বাইরের জগতের মাঝখানে অথচ সারাজীবনই যে মুহূর্তটির জন্য প্রতীক্ষা করে থাকতে হবে, সেই দরজা। ভেতরটা বারান্দায় আঁচ-ওঠা উনুনের মত গনগনে হয়ে ওঠে।

আঁচ বয়ে যায়।

ঘণ্টা তিনেক বাদে বিপিনবাবুর অফিস যাবার সময় আর একপসলা বর্ষণ হয়ে গেল। বলা বাহুল্য এক তরফা।

নিখিলকে অমিতা কথা দিয়েছে আজ থেকে পরিপূর্ণ ভার নেবে ও কেন্দ্রটির কিন্তু বিপিনবাবুর সম্মতি ছাড়া যে কোন মতেই তা সম্ভব নয় সে কথা বেশ ভালভাবেই জানে অমিতা।

কিন্তু কথাটা পাড়তেই যেন ঠিকরে উঠলেন বিপিনবাবু। অবশেষে গালিগালাজ এবং রীতিমত শাসানির পর তাঁর নাটকীয় প্রস্থান ঘটল।

দীপুর আজ ইস্কুলে যাবার তাড়া নেই, গা-টা যেন ছ্যাকছ্যাক করছে। [illegible]র ঘরে বসে বসে বই পড়ছে গল্পের। হঠাৎ যেন মায়া লাগল অমিতার নতুন করে স্বামী আর সংসারটার জন্য। সত্যিই স্বামী যেন তার এক রকমের! তিনি তাকে একটি সস্তা দরের আসবাব ছাড়া আর কিছুই মনে করেন না—এ কথা সে জানে। আর বারো বছরের দাম্পত্যজীবনের প্রথম বছর ছাড়া ভাল ব্যবহারও যে একদিনের জন্যও সে পেয়েছে তাও মনে করতে পারে না অমিতা। তিনি তার সংসারেরই অন্য আধখানা, তবু তিনি দীপুর বাবা, একথাও ভোলা যায় না। তাছাড়া স্বামী-স্ত্রীর এই দ্বন্দ্বে ক্ষতি দীপুরই সব থেকে বেশী, সে যদি তার বাবাকে না ভালবাসতে পারে, চরিত্রগঠনেও তবে তার ফাঁক থেকে যাবে এটা অমিতা ভালভাবেই জানে। কিন্তু অমিতা কী করবে। কোনদিনই সে কঠিন কথা বলে না। আঘাত আসে আচমকা। সে শুধু আত্মরক্ষা করে, নিজেকে টিকিয়ে রাখতে চায়। নিজেকে আর নিজের মনকে, মনের আদর্শকে। তার চরিত্রে কোথায় যেন একটা জোর আছে, নানা প্রতিকূল অবস্থায় যা চিরকাল চায় স্বাধিকারের প্রতিষ্ঠা। স্বভাব বদলাবে সে কী করে!

দুটো বাজবার আগে থেকেই মেয়েরা এসে গেল, অপর্ণাই তাদের নিয়ে এল। শোবার ঘরের পাশেই যে ঢাকা ফালিটুকু সেখানে তারা বসে পড়েছে ততক্ষণে।

"কই অমিতাদি!" অপর্ণা ডাক দেয়, "মেয়েরা এসে গেল। দুজন শুধু আসতে পারল না, একজনের ছেলের অসুখ, অন্যজনের স্বামী আসতে দিল না।"

"ময়নার সোয়ামিটা যেন ষণ্ডামার্কা গো!" একজন মেয়ে মন্তব্য করে, "আমার ঘরের লোকের তো কতই ইচ্ছে। তবে হ্যাঁ বাপু, ছেলে রাখতে পারবেনি, আগে থেকেই বলে দিয়েছে। তাইতো ছেলেটাকে টেনে নে এসতে হলো।"

"তা হোক, তবু তোমরা হাল ছেড় না।" অপর্ণা তাদের বোঝায়, "আজ না হোক কাল স্বামীরা বুঝতে পারবে যে তোমরা লেখাপড়া শিখলে তাদেরই ভালো। তোমাদের ছেলেমেয়েরা যাতে মানুষ হয় সে কথা তো ভাবতে হবে।"

অমিতা এ ঘরে ঢুকতে ঢুকতে শুনতে পায়। '—আজ না হোক কাল স্বামীরা বুঝবে—'

সত্যি সেই আশাতে ও-ও যে দিন গুণছে। কিন্তু সে কাল কবে?

"ঐ মাদুরটা পেতে বসো না ভাই তোমরা। মেঝেতে কেন?" মাদুরটা কোণ থেকে নিয়ে পেতে দিল অমিতা।

"আজ বেশিক্ষণ বসতে পারব নি।" রেবতী বলে, আমরা তো তোমাদের মত স্বাধীন নই গো দিদিমণি। আমার সোয়ামী তো এসতেই দিতে চায়নি। কত কষ্টে যে এসেছি!"

স্বাধীনই বটে। অমিতা মনে মনে হাসে। মুখে বলল, "তোমরা তো লেখাপড়া শেখ অপর্ণাদিদির কাছে। আমি তোমাদের সেলাই শেখাব। আর তাছাড়া রোজ আমরা খবরের কাগজ পড়বো। কি বল?"

"সে তুমি ভাল জান দিদি।" বয়স্কা একটি বৌ উত্তর দেয়, "তবে আমায় বাপু এমন করে শিখিয়ে দাও যেন রামায়ণটা অন্তত নিজে পড়তে পারি। নিজে চিঠিখানাও লিখতে পারি।"

"পারবে বৈকি! এই তিনদিন অমিতাদি তোমাদের সেলাই শেখাবেন। আমি পড়াব বাকি তিনদিন।" অপর্ণা তাদের উৎসাহ দেয়।

"অ! হ্যাঁ গা দিদি—তোমার শোবার ঘরে আমাদের বসালে, তোমার কত্তা কিছু বলবে নি?"

"না। এ তো ভাল কাজ। উনি বলবেন কেন?" অমিতা বলে

পড়ে মাদুরের একপাশে। শোন। আজ তোমরা সেলাইয়ের জন্য ছুঁচ-সুতো কিছু এনেছ? তোমাদের আসনবোনা শেখাব। এর জন্য খানিকটা চট...”

দরজায় অসময়ে কড়া নাড়ার শব্দ হল। অমিতা ওঠবার উপক্রম করতেই অপর্ণা বলল, “অমিতাদি আমি দরজা খুলে দিচ্ছি। তুমি কাজ কর।”

দরজা দিয়ে ঢুকলেন বিপিনবাবু। হাতে একটি নাতি-বৃহৎ বোঁচকা। ফুলকপির মাথা দেখা যাচ্ছে। দরজা দিয়ে ঢুকেই অপাঙ্গে একবার তিনি দেখে নিলেন অপর্ণাকে। একপাশে সরে দাঁড়িয়ে অপর্ণা হেসে বলল, “আজ আপনার বাড়ী চড়াও করেছি। সব ঘর বেদখল।”

“হুঁ।” গম্ভীরভাবে পাশ কাটিয়ে ঢুকলেন বিপিনবাবু। আবার সেই বস্তিঘোরা মেয়েটা! শোবার ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে গেলেন।

অমিতা ততক্ষণে বুঝেছে ব্যাপারটা। স্বপ্নের অগোচর বিপিনবাবুর এই আকস্মিক আবির্ভাব! সে যেন পাথর হয়ে গিয়েছিল। এমন অসময়ে? আর কিনা আজই! বিপিনবাবুর স্বভাব তার অজানা নয়, কিছুক্ষণ আগে মায়া-করা লোকটার জন্য সে ভয় আর বিতৃষ্ণা ছাড়া আর কিছুই অনুভব করতে পারল না।

“এদিকে শোন।” ঘরে যেতে যেতে চাপাগলায় অমিতাকে ডাকলেন বিপিনবাবু।

“যাচ্ছি।” সময় নেবার চেষ্টা করে অমিতা।

“যাচ্ছি নয়, এখনি এসো।” শোবার ঘর থেকে ক্রুদ্ধ আওয়াজ আসে।

“তোমরা বসো ভাই। আমি আসছি।”

ঘরে ঢুকতে গিয়ে একটু দাঁড়ায় অমিতা। দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা চেপে ধরে। তারপর সোজা ঘরের মাঝখানে গিয়ে হাজির হয়।

সঙ্গে সঙ্গেই উঁচু গলায় বলে ওঠেন বিপিনবাবু, “বলি ব্যাপার কি? স্বাধীন জেনানা নাকি?—একেবারে বাড়ীর ভেতর!”

“আস্তে বল, আস্তে! তোমার পায়ে পড়ি—”

“কিসের আস্তে? ভয়টা কাকে? ঐ মাগীগুলোকে নাকি?”

“দোহাই তোমার। আমি তো ভাবিনি তুমি এ সময়ে ফিরবে!”

"তা তো ... ভাববেই না! পতিচিন্তায় বিভোর হলে যে প্রগতি হবে না, ... ঘোষ ঘরে নেই, কেষ্ট ঠাকুরের আসতে সেকেলে হয়ে পড়বে! তা আর ... বিলম্ব কেন?"

"ছিঃ!" আকণ্ঠ ঘৃণায় মুখ বিকৃত করল অমিতা।

"কিসের ছিঃ!—নভেলিআনা না?—আবার ছিঃ—কোনটা বাকি রেখেছ শুনি। ও মাগীগুলোকে আমি চিনি না নাকি? ঢুকিয়েছ কেন ওদের এ বাড়ীতে? কার হুকুমে?"

"হুকুম আবার কিসের? নিজের সংসারে দুটো ভাল কাজ করতে পারব না?"

"ভাল কাজ!" তার সুর নকল করে খিঁচিয়ে উঠলেন বিপিনবাবু, "কতগুলো বাজারে-মাগীর হট্টগোল ভাল কাজ? বলি এটা ভদ্রলোকের বাড়ী নয়?" গলা তখন সপ্তমে চড়েছে।

"এখন তোমাকে দেখে তা মনে হচ্ছে না।"—চাপা অথচ জোর গলায় বলে অমিতা।

"কি? এত বড় আস্পাদ্দা! মুখে মুখে জবাব?"

এই সময়েই দীপু ঢুকল ঘরে। পাশের বাড়ীতে গিয়েছিল একটা গল্পের বই আনতে।

"এই যে শুয়ার। কোথায় যাওয়া হয়েছিল?" ছেলের মাথার চুল ধরে কাছে টানলেন তিনি।

"পাশের বাড়ী।" প্রায় আর্তনাদ করে উঠল দীপু।

"ইস্কুল নেই? আমি শালা মাস মাস টাকা গুনব আর তোমরা মায়ে-পোয়ে ফুর্তি মারবে! দাঁড়াও।"

"কি করছ?" এগিয়ে আসে অমিতা. "অরভাব বলে আমিই ইস্কুলে যেতে দিই নি।"

"সরে যা হারামজাদী। আমার বাড়ীতে যা ইচ্ছে তা চলবে না।" চড় পড়ল দীপুর পিঠে।

"আমার ওপর রাগ করে ছেলেটাকে মেরে ফেলবে নাকি? ছেড়ে দাও।"

ছাড়াবার চেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে একটা চড় এসে পড়ে তার হাতে। আর প্রবল বেগে মারতে থাকেন বিপিনবাবু দীপুকে।

"ছাখ, অনেক সহ্য করেছি, আর নয়।"—দৃঢ় গলায় বলে এগিয়ে আসে অমিতা। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এক প্রচণ্ড ধাক্কায় পড়ে যায় সে মেঝের ওপর। জলচৌকির কোণে লেগে তার কপাল ফেটে যায়। রক্ত ঝরতে থাকে।

"মামণি!" নিজের ব্যথা ভুলে মাকে জড়িয়ে ধরে দীপক। আর অসহ্য মানসিক উত্তেজনায় ফাটা কপাল চেপে ধরে জ্ঞান হারাবার আগে অমিতা দেখতে পায়—ছেলের ব্যাকুল মুখ, আর অপর্ণা আর ঐ মেয়েগুলির মুখ···রেবতী, পাঁচুর মা, কুসুম···

অমিতার চারিদিকে ওরা ঘিরে দাঁড়ায়।

সহকার

সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গেছে।

একেবারে চপ্ চপ্ করছে সারা শরীর! মোমবাতি জেলে হাত-ঘড়িটা একবার দেখল সীতেশ। এখনও ভোর হতে অনেক দেরী, মোটে তিনটে বার মিনিট।

বাতি নিভিয়ে পাশ ফিরে শুল আবার সীতেশ। নাঃ অসম্ভব। গায়ের এই চ্যাটচেটে ঘাম মুছে না নিলে শোওয়ার কোন অর্থ হয় না। সঙ্গে সঙ্গে ঘামে ভেজা চাদরটাও। টান মেরে চাদরটাও উঠিয়ে ফেলল সীতেশ।

এতে মুস্কিল আরও বেড়েই গেল। শুধু তোষকের ওপর শোওয়া তো অসম্ভব। বিলাসিতার জন্য নয়, শুধু তোষকে শুলে তোষকটাও ভিজে যাওয়ার সম্ভাবনা। তাছাড়া পুরোনো হয়ে যাওয়ায় ঠিক পিঠের নীচেই বেশ কয়েকটা জায়গা ডেলা পাকিয়ে আছে।

কেমন অস্থির অস্থির লাগছে সীতেশের। রাত্রে শোবার আগে গেঞ্জি বদলে শুয়েছে। অন্যটা কেচে দিয়েছে, বাইরের দড়িতে ঝুলছে এখনও। ভাল করে শুকোয় নি। খালি গায়েই শোয়া ভাল। ঘামে ভেজা গেঞ্জি আর গায়ে রাখা যাচ্ছে না।

কিন্তু আরতি খালি গা পছন্দ করে না। গরম দেশ হলেই বা, খালি গা নাকি ভারি বিশ্রী, একেবারে অসভ্যতা।

মরুকগে, এখন তো আরতি নেই। তক্তাপোষ থেকে নেমে দাঁড়াল সীতেশ।

ক্যাঁম-ক্যাঁচ শব্দ করে উঠল তক্তাপোষটা। পুরোন বলে একটু নড়লে-চড়লেই ওটা অমনি প্রতিবাদ জানাবে। অন্ধকার ঘর। বাতিটা আর একবার জ্বালালে ভাল হয়। নিভিয়ে দেওয়া বোকামি হয়ে গিয়েছিল। মিছিমিছি আবার একটা কাঠি নষ্ট হবে। কিন্তু কি আর করা যাবে। অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না।

সারা গা থেকে ঘাম গড়াচ্ছে, গা বেয়ে, কোমর বেয়ে, বুকের চপ্‌চপে ভেজা লোমের মধ্য দিয়ে। যেন ঘাম নয়, হাজার পোকা সারা গায়ে কিল-বিল করছে। জিভটাও শুকিয়ে, মুখটা তেঁতো হয়ে আছে। জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁটটা চেটে নিল একবার। ঠিক যেন শুকনো ব্লটিংপেপার চাটল।

আস্বাদনটা অদ্ভুত।

স্বাদ হীন। এক গ্লাস জল খেলে খানিকটা ভাল লাগবে। বাতিটা জ্বালাল এবার, তারপর কোণে রাখা মুখ ভাঙা কুঁজোটার থেকে জল গড়িয়ে এক গ্লাস জল ঢক ঢক করে খেল। খানিকটা শান্তি, জলটা তবু বেশ ঠাণ্ডা। এটুকুই যা বাঁচোয়া।

একটু কিছু খেলে হোত, খালি পেটে জল খেয়ে আরও গা গুলিয়ে উঠেছে। কাল থেকে পেটের ভেতর একটা মোচড় দিচ্ছে। কারণটা ও নিজেও জানে। না খাওয়ার মোচড়। ছোটবেলায় দিদিমা বলত পিত্তি পড়লে ওরকম মোচড় দেয়।

আরতি তো বুঝতেই পারে না, পিত্তি পড়া কাকে বলে। কোথা থেকে পড়ে পিত্তি; রক্তের মত তরল নাকি সেটা? পড়ে কোথায় যায়? দেখতে পাওয়া যায় নাকি? যত সব আজে বাজে কথা আরতির।

মরুকগে, এত অস্বস্তি লাগছে আরতির কথা ভাবতে আর ভাল লাগছে না।

আরতি নিশ্চয়ই এখন পাখার তলায়, নরম বিছানায় দিব্যি আরামে ঘুম দিচ্ছে। আরতির আবার ফুল স্পীডে পাখা না চালালে ঘুম হয় না। ও নিজেই বলেছে, আর সীতেশকেও বারবার প্রশ্ন করেছে তারও তাই অভ্যেস কি না।

সীতেশ মাথা না নেড়ে পারে নি।

আরও জোর দিয়ে বলেছে, শুধু পাখার ফুল স্পীডেই যথেষ্ট নয়, হাতপাখাও রাখে যাতে আরও কাছাকাছি, আরও হাওয়া পাওয়া যায়। অবশ্য আরতি তাতে আরও অবাক হয়েছে।

ওমা! হাতপাখা?

ঘোরাতে গিয়ে হাত ব্যথা করে না? ওতো পূজোর সময় ঠাকুরের আরতির জন্য পাখা চালাতেই হাঁপিয়ে ওঠে। বাবাঃ হাতপাখা চালান সোজা কথা নয়।

তবু ঠাকুমা জোর করে বলে চালাতে হয়, অন্ততঃ অষ্টমীর দিন সন্ধি-পূজোর সময়। ঠাকুমা বলে বাড়ীর মেয়েদের নাকি এটি অবশ্য কর্তব্য। বিশেষ করে আরতির। বেছে বেছে ঐ জন্যই তো ওর অমন নাম রাখা হয়েছে। তবে?

কত কথাই বলেছে আরতি চোখ নাচিয়ে নাচিয়ে।

সব কথা বলেছে তাকে। সীতেশের গায়ের জোর দেখে প্রশংসা করতে ছাড়ে নি। সশ্রদ্ধ বিস্ময়েও সীতেশের লম্বা-চওড়া দেহটার দিকে বারবার তাকিয়েছে।

আর সীতেশের মনে হয়েছে এণ্ডির তলায় সার্টের ছেঁড়া হাতটা বুঝি দেখতে পেয়েছে আরতি। ভাল করে ঢেকে দিতে চেষ্টা করেছে সীতেশ আর ওর কাণ্ড দেখে আরও জোরে হেসে উঠেছে আরতি। এত যখন গরম সীতেশের তখন শার্টের ওপর আবার এণ্ডি চাপান কেন? যদিও সীতেশকে বেশ ভাল দেখায় এণ্ডিচাদরে, বেশ ভবিসবি। কিন্তু কেমন যেন বুড়ো বুড়ো।

তবে ধুতির সঙ্গে চাদর আরতি পছন্দই করে। যার সঙ্গে যা, কোট প্যাণ্ট পরলেই যেমন জুতো মোজা টাই। যারা ট্রাউজার পরে, ঘরোয়া ভাব দেখাতে তার সঙ্গে চটি পরে, তাদের দু'চোখে দেখতে পারে না আরতি।

মরুকগে, আরতির কথা ভাবতে ভাল লাগছে না। এত কষ্ট হচ্ছে। ও কতটুকু জানে সীতেশের বাস্তব দৈনন্দিন জীবনকে?

সত্যিই আরতি জানে না, বাবা মারা যাবার পর থেকে কি ক'রে সীতেশের দিন কাটছে।

এই গরমে সীতেশের মত লোককে কি কষ্ট করতে হয়। মাসে পনের টাকা ভাড়ায় জানলাবিহীন একটা খুপরি ঘরে এই গরমে রাত কাটান কি অসহনীয়, আরতি তা কি করে বুঝবে? ও তো অন্য জগতের লোক।

তা না হলে সেদিন সন্ধ্যাবেলায় ওর দিকে আইসক্রীম এগিয়ে দিয়ে বলতে যাবে কেন, সীতেশ বাড়ির তৈরী আইসক্রীম বেশি পছন্দ করে কিনা।

সীতেশ অবশ্যই বলেছিল হ্যাঁ। বাড়ির তৈরী আইসক্রীমই সে বেশি পছন্দ করে। রেস্তোরাঁয় গিয়ে খেতে তার আলস্য বোধ হয়।

আরতি তো তাতে মহা খুশি। অনেক বিষয়ে ওর সীতেশের সঙ্গে মিলে যায়। ভারি ভাল লাগে ওর সীতেশকে এই জন্য। আরতিটা এত সরল।

আবার এক গ্লাস জল খেল সীতেশ, তারপর ফুঁ দিয়ে বাতিটা নিভিয়ে দিল।

গেঞ্জিটা একটানে খুলে ফেলল গা থেকে। আর খোলবার টানে ঘামে জবজবে ভেজা গেঞ্জিটার বগলের কাছে লম্বা করে ফেঁসে গেল। আরও একটু সতর্ক হওয়া উচিত ছিল।

একটা গালাগাল উচ্চারণ করল সীতেশ। গেঞ্জিটাকে না নিজের ভাগ্যকে নিজেই বোধহয় বুঝতে পারল না।

অসহ্য গরম পড়েছে। শালার গরম কমবার নাম নেই। ঘরের ভেতর আর থাকা অসম্ভব। তার এই বধূহীন বাসর জাগার পালা কবে ফুরোবে কে জানে। একটু বাইরে বেরোতে পারলে হোত।

ঘরের মধ্যে গরমটা যেন চেপে বসেছে ওর ওপর। সে আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য দরজাটা খুলে বাইরে আসতেই চোখে পড়ল ওপাশের রোয়াকে শুয়ে থাকা সোহাগীকে। গরমে বোধহয় ঘরে থাকতে পারে নি, তাই রোয়াকে শুয়ে ঘুমোচ্ছে।

ভেতরের উঠোনের চারপাশে পাড় দেওয়া খোলা রোয়াক। সব ঘরগুলোর সামনে দিয়েই ঘুরে গেছে, কারও একমালি সম্পত্তি নয়।

কিন্তু তা হলেই বা।

এমন বেলেল্লাভাবে, বেআব্রু শুয়ে থাকার মানে স্পষ্ট সকলকে

অবজ্ঞা দেখান। কেউ বেরোতে পারুক আর না পারুক, ও শুয়ে থাকবে। একেবারে গা খুলে শুয়ে থাকবে। ওর গরম হচ্ছে ও কি করবে? যেন আর কারও গরম হচ্ছে না বা হতে পারে না। যেন সবাই ওর মত বেপরোয়া নির্লজ্জ।

ওপাশের দিকের ঘরের হরিহর বাবুরা তো পাঁচটা কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে ঘরে খিল দিয়ে ঘুমোচ্ছে।

আর গণেশবাবু তো রাতে নাকি বাড়িই থাকে না। শুধু সোহাগীর গরম বেশি। কিছুক্ষণ আগেই উচ্চারিত গালাগালের পুনরাবৃত্তি করল সীতেশ।

এবার উদ্দেশ্য স্পষ্ট।

সোজাভাবেই ছুঁড়ে মেরেছে ও গালাগালগুলো। যদিও যার উদ্দেশ্যে, সেই সোহাগী বহির্জগৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন থেকে পরিপূর্ণ একটি নিটোল ঘুমের ব্যবস্থা করেছে।

ঐ রকমই ও বরাবর। শীতকালে রোদ্দুর আর গরমকালে হাওয়া। যেন আর কারও শীতকালে রোদ্দুরকে পিঠে নিতে ভাল লাগে না, বা কেউ গরমকালে হাওয়ায় বড় করে নিঃশ্বাস নিতে চায় না।

শীতের কথা ভাবতেও পারছে না সীতেশ।

শীতকালটা কেমন? মোটে ঘাম হয় না। না? এত গরমে শীতের কথা ভাবতেও পারছে না সীতেশ। আর এই অসহ্য গরম বলেই তো ও একেবারে আদিম মানুষের মত জঘন্য সব গালাগাল দিয়ে উঠতে পারছে। সহজভাবে চিন্তা করলে সে কথা ভাবতেও ওর লজ্জা হয়। তখন আর আরতির পছন্দ মত 'সফিসটিকেশনের' কোন তোয়াক্কা করতে হয় না।

মরুকগে, আরতির কথা ভাবতে ভাল লাগছে না।

গামছা দিয়ে ভাল করে গা মুছল সীতেশ। গামছাটায় কেমন একটা ভ্যাপসা গন্ধ হয়েছে। কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে গামছাটা একেবারে সপ্‌সপে করে ভিজিয়ে নিল।

মুখ মুছতে গিয়ে বুঝতে পারলো একেবারে তেলচিটে হয়ে গেছে গামছাটা। ঠিক যেন সোহাগীর গায়ের মত। তেলতেলা আর ময়লা,

ময়লা আর মসৃণ। হঠাৎ মনে হল সোহাগীর গা একবার ছুঁয়ে দেখতে পারলে হোত। এই গামছাটার মত এত তেলতেলা আর হড়কে যাওয়ার মত নাকি?

সীতেশের নিঃশ্বাস খুব গরম হয়ে গেছে! সোহাগীর দিকে আবার তাকাল সে। নিজের কাছেই ওর বুকের ওঠাপড়া একটু বেশি দ্রুত মনে হল। ভেতরের কোন একটা আদিম সত্তা বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে যেন। সোহাগীকে কি আজ নতুন দেখছে নাকি? তবে? ওর দেহের মধ্যে এ কিসের প্রস্তুতি। নিজের ওপর রাগ হল সীতেশের। সোহাগী ওর চিন্তার মধ্যে স্থান পায় কি করে? ৭৪

ছাত্রমহলে প্রিয় বিদগ্ধ কবি সীতেশ সেনের পক্ষে এ রকম জঘন্য চিন্তাও যেন অবিশ্বাস্য। দেহ কেমন সে কথা জানবার বাসনা তার মনে স্থান পাবে কেন? এটা কি ওর পক্ষে উচিত?

উচিত আর অনুচিত।

আজন্ম শুনে আসছে এই উচিত আর অনুচিত।

বেশ মনে আছে ওদের পাশের বাড়ির ব্রাহ্ম বুড়োটার কথা। সারা জীবন তার মুখে উচিত, অনুচিত—নিষ্ঠাচার। অথচ কি অনুচিত কাজই না করে বসল সে একদিন।

সেই সেদিন সীতেশের পরে চাইকয়েক মরে যাওয়া বোনটা ঐ পাশের বাড়ি থেকে চায়ের জল গরম করতে গিয়েছিল, ওদের উনুন ধরতে দেরি আছে বলে. আর আগুনের উত্তাপে লাল হয়ে যাওয়া ওর সেই বোনটার মুখে হঠাৎ চুমু খেয়ে বসেছিল সেই বুড়ো।

রাগে অবাক হয়ে ছিটকে সরে এসেছিল সীতেশের বোন সবিতা, আর প্রায় ফুটন্ত গরম জলে পা পুড়িয়ে দিয়েছিল ঐ বুড়ো মনোরঞ্জন বাবুর।

সবিতা ইচ্ছা করে পোড়ায় নি ওর পা, কিন্তু পরে বলেছে পারলে ও ইচ্ছা করেই পোড়াত শুধু বুড়োর পা নয়, বুড়োকেও। মাগো কি ঘেন্নার কথা, পা পুড়ে যাবার পরও নাকি বুড়ো বলেছিল, তাতে কি হয়েছে, বাড়িতে কেউ নেই, যে দেখে ফেলবে।

যেন কেউ দেখা না দেখাটাই বড় কথা।

কিন্তু এখন এসব ভাবতে ভাল লাগছে না সীতেশের।

অসহ্য গরমে ফুটন্ত জলের কথা ভাবলেও কেমন লাগে। ফুটন্ত জল বুড়ো সহ্য করল কি করে। সীতেশ তো ভাবতেও পারছে না। তার থেকে ঠাণ্ডা বরফ জল পেলে ভাল হোত। ঠিক যেমন ঠাণ্ডা জল ওদের ফ্রিজ থেকে বার করে আরতি ওকে খেতে দেয়। আর বোতলের গায়ে ঠাণ্ডা বাষ্প জমে থাকে, আঃ কি আরাম এই গরমে সেই ঠাণ্ডা বোতল স্পর্শ করা। হঠাৎ মনে হল সোহাগীর তেলতেলা উত্তপ্ত ঘামে ভেজা দেহ নয়। ঐ বাষ্পাক্ত ঠাণ্ডা জলের বোতলটাকেই ও আলিঙ্গন করতে চায়।

আধখোলা দরজা দিয়ে ঘরের মধ্যে আলো এসে পড়েছে।

আজ শুক্লপক্ষের চতুর্দশী, প্রায় পূর্ণ চাঁদের আলো শুধু সীতেশের ঘরেই আসে নি, সোহাগীর প্রায় নগ্ন যৌবনপুষ্ট দেহেও। ওর খোলা মসৃণ বুক চোখে পড়ল সীতেশের।

আরতির বুক ও খোলা দেখে নি। কি করে দেখবে? আরতির তো গরমের জন্য জামা খোলবার দরকার হয় না। ফুলস্পীডে চালান পাখার তলায় ও হাতকাটা ব্লাউজ ছাড়াও অনায়াসে এই গরমেও কনুই পর্যন্ত লেসওলা ব্লাউজ পরতে পারে, ফ্যাসান করবার জন্য। অবশ্য সীতেশ মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে তখন আরতির দিকে, ভারী সুন্দর আর কোমল দেখায় আরতিকে।

কিন্তু তবু আরতি অন্য জগতের লোক।

সেদিক থেকে বরং সোহাগীর সঙ্গে, জীবনের কিছুটা যোগ আছে সীতেশের। আরতি তার আপন হয়েও পর যেন।

ওপাশের কোণের ঘর থেকে হরিবাবুর নাক ডাকার শব্দ আসছে। নিজের কানে না শুনলে ও জীবনেও বিশ্বাস করত না কারও নাক থেকে ওরকম প্রচণ্ড গর্জন আর বিচিত্র শব্দ বার হ'তে পারে।

সকলেই ঘুমোচ্ছে, কেবল সীতেশ ছাড়া।

ভোর হতে এখনও ঢের বাকি। সময় যেন আর এগোচ্ছে না। আন্দাজে বুঝতে হচ্ছে ওকে। আবার আলো জেলে ঘড়ি দেখতে পারত। যদি আলো জ্বালার অত সুবিধেই হোত ত'হলে তো বই পড়েও রাতটা

কাটাতে পারত। কিন্তু তা সম্ভব নয়। তার আয়ের অনুপাতে সে বায়টা অনুচিত হবে।

হাসি পেল সীতেশের।

আবার উচিত।

জীবনটা উচিত, অনুচিত দিয়ে ঠাসা। না-হলে এইভাবে রাত কাটানর পরও কাল সন্ধ্যায় দিব্য ভদ্রলোক সেজে আরতিদের বাড়ি জলসায় গিয়ে হাজির হ'তে হবে কেন?

ভুলেই গিয়েছিল সীতেশ।

এখনই মনে পড়ল।

শক্তিগড় থেকে এসে পর্যন্ত ওর মাথায় কি আর কিছু আছে? যা কাণ্ডটা হোল, এখনও ভাবলে গা কেমন করে। অথচ এ-ছাড়া উপায়ই বা কি ছিল। লোকটাকে বাঁচানর শেষ চেষ্টা করা তো প্রয়োজন। সুতরাং সকলের পরামর্শ মত শেষ পর্যন্ত সীতেশই ঐ সাংঘাতিক কাণ্ডটা করল। কে জানত ওর দু' বছরের ডাক্তারি পড়া এভাবে কাজে লাগবে। লোকটার পা কেটে লোকটাকে গাড়ির চাকার তলা থেকে খুলে বার করতে হ'ল। পরে লোকটা অজ্ঞান হয়ে গেলেও পা কাটার সময় লোকটা কেমন চোখের সাদাটা পুরো বের করে সীতেশের দিকে তাকিয়েছিল।

সীতেশরই মাথা ঘুরে গিয়েছিল।

কিন্তু ঐ গ্রামে সীতেশ ছাড়া আর কারই বা সাধ্য ছিল? ভাগ্যে ও ডাক্তারি পড়েছিল। ভাগ্যই বটে, বাবা হঠাৎ এ্যাকসিডেন্টে মারা না গেলে ও-তো এতদিনে ডাক্তার হয়ে বেরোত।

অথচ আরতি এই তিন বছরেও জানে না একাণ্ড হয়ে গেছে।

ও ডাক্তারী পড়া ছেড়ে গত বছর বি-এ পাশ করেছে। মা আর ছোট ভাই দেশে চলে গেছে, কোলকাতার সংসার আর টানা সম্ভব নয় বলে।

সীতেশরা ভবানীপুরের সে বাড়ি ছেড়ে দিয়েছে আর সীতেশ গণপতি লেনের ঐ খুপরিতে আশ্রয় নিয়েছে।

কিছুই জানে না আরতি।

সীতেশ যে তিনটে টিউশ্যনি করে ওদের সংসার আর নিজের পেট

চালাচ্ছে তা একদিনের জন্যও আরতিকে জানতে দেয় নি। উচিত নয় বলে, যাহোক করে বাইরের আবরণটুকু রেখে ও আরতির সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখেছে।

কিছু সময় চায় ও, তারপর সবই বলবে ও, নিজেকে গড়ে নিক আগে। এখন আরতি শুধু জানে ও দু'বছর ড্রপ করেছে ডাক্তারিতে। ও মেডিকেল কলেজের মেসে থাকে।

এছাড়া উপায় নেই।

আরতি ওর নেশার মত।

আরতি ওর জীবন, ওর অস্তিত্ব। আরতিকে ছাড়া ও নিজের জীবনের কথা ভাবতেও পারে না। অথচ জেনে-শুনে ওকে এই প্রবঞ্চনা করে যেতে হচ্ছে। এ-ছাড়া পথ নেই বলে। নিজের অস্তিত্ব বাঁচাবার জন্য এই প্রাণপণ প্রয়াস। কেন না বেআব্রু বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়াতে ভয় পায় তার মন।

একটা ভদ্র আবরণ না থাকলে সমাজে চলা মুস্কিল। তাই এ প্রবঞ্চনা। আর প্রবঞ্চনা না করেও তো উপায় নেই। শুধু সে কেন, তার মত হাজার যুবক, হাজার হাজার মানুষ এই প্রবঞ্চনাকেই আশ্রয় করে নিয়েছে। কেন না জীবনে প্রয়োজনমত বাঁচাই তাদের কাছে সব থেকে বড় কথা।

কুঁজোটা হাতে নিয়ে বাইরে এল সীতেশ।

অসম্ভব।

খাওয়ার থেকে বড় প্রয়োজন গায়ে একটু জল ঢালা। হঠাৎ সমস্ত কুঁজোর জল উপুড় করে ঢেলে দিল সীতেশ নিজের গায়ে। তারপর ভিজে কাপড়ে মাথায় দাঁড়িয়ে রইল রোয়াকের ওপর। সোহাগী তখনও ঘুমোচ্ছে।

ঘরে এসে শুয়ে পড়ল জল গায়েই।

কখন ঘুমিয়েও পড়েছে সীতেশ। ঘুম ভাঙবার পর মনে হল তার জ্বর হয়েছে, অসহ্য ব্যথা মাথায় গায়ে হাতে, পা-টাও বেশ ফুলেছে। লোকটাকে ধরাধরি করে তোলবার সময় একটা লোহার রড ওর পায়ের ওপর পড়ে পা-টা ছেঁচে গিয়েছিল, কাল আর লক্ষ্যই করে নি।

আজ ব্যথায় পা নাড়তেই পারছে না। সারারাত তো অসহ্য গরমে

দুঃস্বপ্নের মত কেটেছে। ভোরের দিকে একটু ঘুমিয়েছে বোধ হয়। কিন্তু ঐ জলচালা ভিজে কাপড়ে শোয়ার ফলেই বোধ হয় জ্বরটা এসেছে। একটু নয়, বেশ জ্বর।

সীতেশ নিজেই বুঝতে পারছে। চোখ দুটো আর খুলতেই ইচ্ছে করছে না। আশ্চর্য লাগছে ওর নিজেরই। বহুদিন এত প্রবল জ্বর আসে নি। শুধু যে আরতিদের বাড়ি যেতে পারবে না তা নয়, বিকেলের দুটো টিউশ্যনিতেই বা যাবে কি ক'রে।

অথচ সামনেই ওদের পরীক্ষা।

আর নকুলেশ্বর লেনের ছাত্রের বাপের যা মেজাজ। এমনিতেই তো গৃহশিক্ষককে চাকরের মত মনে করে।

কিন্তু উপায় কি?

ক্রমশ জ্বর বাড়তে লাগল। দুপুরের গরমের সঙ্গে তাল রেখে গায়ের উত্তাপও যেন চড়ল হু-হু করে।

একটু ঠাণ্ডা জলপটি পেলে হ'ত। বা কারও হাত। কপালে নরম ঠাণ্ডা হাত। আরতির হাত।

অসম্ভব।

কল্পনা করাও অসম্ভব।

এখানে ওর এই ইঁদুরের খুপরিতে আরতি এসে তার ঠাণ্ডা হাত ওর উত্তপ্ত কপালে রাখবে ভাবাও যায় না। তাছাড়া আরতি তো জানেও না কিছু। এ জগতকে কতটুকু চেনে ও, কত যে ছেলেমানুষ ও তা তো সীতেশ ভাল করেই জানে। দারিদ্র্য, জীবনযুদ্ধ এ কথাগুলো বোধহয় ও শোনেইনি।

যদি তাকে সব কিছু জানাতে পারত সীতেশ অতি সহজভাবে।

আচ্ছন্ন ভাবটা একটু কেটে যেতে লাগল।

মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। কপালে ঠাণ্ডা স্পর্শ পেয়ে চোখ মেলে তাকাবার চেষ্টা করল সীতেশ। পাতা দুটো জুড়ে আছে যেন।

স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না মানুষটাকে।

কে ?

আমি।

আরতির গলার স্বর।

তুমি ?

আশ্চর্য হবারও বোধহয় একটা সীমা আছে।

হ্যাঁ আমি আরতি, দু'দিন তোমার খবর নেই, তুমি কি বলো তো ? এভাবে আমাকে কষ্ট দিয়ে তোমার কি সুখ।

কেঁদে ফেলল আরতি।

তবু বিশ্বাস হচ্ছে না সীতেশের। অসম্ভব, এ বাড়ির খোঁজ আরতি পাবে কি ক'রে ?

অসম্ভব লাগছে, তুমি কি করে......

বেশ টেনে টেনে বলল সীতেশ।

অসম্ভব কেন ? আমিই তো, এই তো তোমার কাছে।

সীতেশের উত্তপ্ত কপালে ওর ঠোঁট রাখল আরতি।

কত কষ্ট করে যে তোমার ঠিকানা পেয়েছি তা যদি জানতে। ভাগ্যে হরিহরবাবু তোমার নোটবুক দেখে আমায় খবর দিয়েছিলেন।

এটা, এ বাড়িটা, ঠিকানা...কি সব বলছ, এই বাজে বাড়ি...

তুমি এসব বাজে কথা ভেব না। চুপ করে শোও তো। ডাক্তারবাবু এক্ষুণি আসছেন। কত যে ভুগিয়েছ তুমি আমায়।

আরতি।

অনেকক্ষণ পর ডাকল সীতেশ।

উঁ।

তোমার ঘৃণা করছে না ?

কেন ?

এখানে এভাবে...

এখানেই তো তোমাকে পাব।

অবাক হচ্ছ না ? আমাকে জোচ্চোর ভাবছ না ?

আরতির হাতে নিজের হাত রাখল সীতেশ

জোচ্চোর ? আশ্চর্য তো।

ম্লান হাসল আরতি।

আশ্চর্য কেন ? এ যে ভীষণ প্রবঞ্চনা আরতি। তোমাকে তো আমি কোনোদিনই সত্যি কথা বলিনি। তুমি কি···

কিন্তু তাতে কি, এখন তো জেনেছি।

তাহলে ?

কি তাহলে ? কি ছেলেমানুষ তুমি বলো তো ? এত তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে ভাবছ এত ?

ছেলেমানুষ ? তুচ্ছ ব্যাপার ? সব জেনেও এত তুচ্ছ লাগছে এসব আরতির কাছে ? বলছে কি আরতি ? ওকেই তো সীতেশ চিরদিন ছেলেমানুষ বলে জানে।

একটা প্রবল কান্নার বেগ সীতেশের বুকটার মধ্যে তোলপাড় করে দিল। ও আরতির হাত নিয়ে নিজের চোখের ওপর চেপে ধরল।

সত্যি ? তুমি এত বোকা।

বোকা নয় আরতি। আমি যে কত অক্ষম, কত গরীব, তা তো আজ জানলে।

তাতে কি হয়েছে। সকলেই কি ধনী হয় ? তোমার নিজের মূল্য কি আমার কাছে যথেষ্ট নয় ?

কিন্তু আরতি।

কিছু কিন্তু নয়। তুমি চুপ কর। দু'দিন জ্বরে বেহুঁস ছিলে। হরিহরবাবুরা যে কত করেছেন এ দুদিন ···এখন ভালয় ভালয় সেরে ওঠো তো!

পাকা মেয়ের মত ওর মাথায় হাত বোলাতে লাগল আরতি।

আরতি তুমি এত ভাল ? এত বোঝ তুমি ? আর আমি একটা হতভাগা···

দু' চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল সীতেশের।

হঠাৎ গাওয়া গান

হঠাৎ একটা অদ্ভুত অনুভূতিতে মন ভরে গেল সীতেশের।

কতদিনের প্রবঞ্চনার খোলস আপনা আপনিই খসে গেল। কত দ্বিধার সমুদ্র পেরিয়েও যে সমাধানে ও পৌঁছতে পারে নি, আরতির ভালবাসা মুহূর্তেই তা সহজ করে নিয়েছে।

কিন্তু মুক্তির আনন্দের পরিবর্তে মনের মধ্যে একটা করুণ বেহাগের সুর বাজতে লাগল।

নির্মোক

হাতটা সজোরে মুচড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে উঠল খোঁড়াটা।

কদিন থেকেই লক্ষ্য করছে বিশ্বনাথ এই খোঁড়ার চালচলন। সোহাগীর সঙ্গে বেশ একটু মাখামাখি করবার চেষ্টা করছে সে। বিশ্বনাথ বহুবার সাবধান করতে গেছে সোহাগীকে। উত্তরে সোহাগী শুধু বোকার মত চেয়ে থাকে।

'ন্যাকা সাজে নাকি?' আপন মনে গজরাতে থাকে বিশ্বনাথ। কিন্তু উপায় নেই। অদ্ভুত জাত জানে মেয়েটা। কি যে আছে ওর চোখে, বিশ্বনাথ ভেবে পায় না। তার মত কড়া মেজাজের লোকও কিছু করতে পারে না যেন।

একটা ভিখারীর দলকে বস্তি থেকে চালিয়ে বিভিন্ন রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া—এই হল বিশ্বনাথের কাজ। মালিকের নাম বনওয়ারীলাল শর্মা। মানুষের দয়ার পয়সায় ভাগ বসানোর পাপকে ধর্মশালায় ধুয়ে স্বর্গের রাস্তা পরিষ্কার করছেন তিনি, নরকের পাহারাদারীর ভার বিশ্বনাথের ওপর। জাতে সে কায়স্থ। লেখাপড়ার কথা জিজ্ঞেস করলে বেশ গর্বের সঙ্গেই বলে 'থার্ড ক্লাস'। বাপ মারা যাবার পর গ্রাম থেকে এসে কয়েক বছর হোটেলের কাপ-ডিস্ ধুয়ে আর বিড়ির দোকানের পাতা কেটে পেট চালিয়েছে। হঠাৎ খোঁজ পেয়ে গেল এই চাকরিটার। বেশ চট্পটে দেখে বনওয়ারীলালও তাকে কাজে বহাল করতে দ্বিরুক্তি করেনি।

"তবে আর কি রে, কপাল তো ফিরে গেল! খালি মাইনে নাকি? উপ্‌রিও আসবে দেখিস্‌।"

চোখ টিপে ঠাট্টা করেছিল বিড়ির দোকানের মালিক।

"উপরিই বটে", মনে মনে হাসে আজ বিশ্বনাথ। কাজে নেমে প্রথম প্রথম রীতিমত গা ঘিনঘিন করত তার। ভোর না হতেই ঐ নোংরা বস্তিতে ঢোকা! গরীব তো সেও, কিন্তু এরা যেন মানুষ নয়। নোংরা কিলবিলে অন্য জগতের জীব। ঘেন্না করে তার। মারামারি ঝগড়া লেগেই আছে। বঞ্চিত হওয়ার সমস্ত প্রতিশোধ তারা নিচ্ছে পরস্পরকে আক্রমণ ক'রে।

কিন্তু সোহাগীকে দেখবার পর থেকে এ জগতটাই যেন বদলে গেল ওর কাছে। এই চার বছর কাজের ভেতরে আস্তে আস্তে সেই রোগাপটকা বারো বছরের মেয়েটা কবে যে একটি সতেজ যুবতীতে পরিণত হয়েছে, এত দিন তা সে লক্ষ্যই করেনি। হঠাৎ যেন আবিষ্কার করল তাকে। কোথা থেকে যৌবন আর সৌন্দর্যের এত রস পায় মেয়েটা? অবাক হয় বিশ্বনাথ। মালিক যা খেতে দেয় তাতে জীবনটা ধরে রাখা ছাড়া বাড়তি কিছু তো থাকবার কথা নয়, এত পুষ্টি ওর হয় কিসে কে জানে। সমস্ত শরীরটা নিটোল ছাঁদে গড়া। দেহের প্রত্যেকটি খাঁজ সুস্পষ্ট।

'আর কিছু না থাক, মেয়েটির গড়নটা বেশ কিন্তু', তারিফ না করে পারে না সে তার বিড়ির দোকানের বন্ধুর কাছে। বন্ধুর কাছ থেকে সায় পেয়ে সাহস তার বেড়ে যায়। ও যেন বুঝেই নিয়েছে যে সোহাগী তারই সম্পত্তি। খাওয়া-দাওয়া একটু ভাল করার চেষ্টা করে। এরই ভেতর যতটা পারে তলাকার ঘন খিচুরি বেশি করে দেয় সোহাগীর পাতে। খাক মেয়েটা, আহা শুধু তো এই-ই খায়। ভিক্ষের পয়সা থেকে দু পয়সা মুড়ির বরাদ্দও করে দিয়েছে সে। সাধ যায় একখানা কাপড় কিনে দেবার। কিন্তু সাহস পায় না। মালিক বড় জবরদস্ত এ সব বিষয়ে। এর মধ্যেই সোহাগীর জন্যে তার দরদের কথা নিয়ে কানাকানি চলছে ভিখারীদের ভেতর। মাঝে মাঝে টুকিটাকি কথাও কানে আসে।

"কি লা তোর রস যে দিন দিন বাড়ছে, ছিরিও খুলছে বেশ!" টেনে টেনে হেসে বললো সেদিন দুখির মা সোহাগীকে।

"তা আর বাড়বে না? ওরই তো দিন গো? আমাদের কি আর পদাথ বলতে কিছু আছে?" টিপ্পনী কেটে সায় দেয় আর একজন।

"সত্যি না।"—দুখীর মা জোর দিয়ে বলে, "কপাল ভাল তোর। সরকারবাবুর চোখ আছে তোর ওপর। তোর আর ভাবনা কি?"

"কেনো?" কথাটা বুঝতে চেষ্টা করে সোহাগী।

"আহা—খুকি।' হেসে গড়িয়ে পড়লো দুখীর মা মতিয়া বুড়ীর গায়ে।

"কিছু বুঝতে পারিস না তু?" মতিয়া হাসতে লাগলো ফোকলা দাঁতে, "সরকারবাবু যে তোকে পেয়ার করে?'

"ভাগ্—' বিব্রত বোধ করে সোহাগী, "আমরা যে ছোট নোক।"

"ঈস, ভারি যে আপসোস দেখি তাই নিয়ে।" ঝাঁঝিয়ে উঠলো দুখীর মা, "কই আমাদের তো অত কথা মাথায় ঢোকে না। সবই বুঝি লো—আর ছেনালি করিস নি মাইরি।"

তাড়াতাড়ি সরে যায় বিশ্বনাথ।

চিন্তার দায় এসে পড়ে সোহাগীর ওপর। কিন্তু সে যে বড ভয় করে সরকারবাবুকে। তার তাকানো সহ্য করতে পারে না সোহাগী।

রাস্তা পার করবার সময় সবাইকে বাদ দিয়ে সরকারবাবু তার হাত ধরতে যেতেই লজ্জায় পিছিয়ে যায় সেদিন—

"আমি ঠিক যাব বাবু। তুমি মিছে তাগিদ কর কেন?'

"তাগিদ করি কি আর সাধে। চাপা পড়লে তো আমারই ভোগান্তি। ধমক দিল বিশ্বনাথ।

"বাবু।' ও-পাশ থেকে চেঁচিয়ে উঠলো খোঁড়াটা, "আমি চাপা পড়লে আর ভোগান্তি নেই বুঝি।'

"চুপ কর্ হারামজাদা।" খেঁকিয়ে উঠলো বিশ্বনাথ—"অত তাড়া কিসের। একে একে যাবি তো। পাজি। হারামজাদা?" ভীষণ রাগে খোঁড়ার দিকে তেড়ে যায় সে। নাঃ, ব্যাচ বদলাতেই হবে। সোহাগীর সঙ্গে ওকে রাখা চলবে না।

"তোর তেল দিন দিন বাড়ছে, না?" শক্ত মুঠিতে তার হাত ধরে

রাস্তা পার হতে হতে বলে বিশ্বনাথ, "তেল বার করছি রাখ।"

"এই! কেনো বাবুর কথার জোবাব দিচ্ছিস রে?" বিশ্বনাথকে খুশী করার ফিকিরে ধমক দেয় তাকে মতিয়া বুড়ী।

অসম্ভব ভয় করে তাকে এই ভিখারীর দল। তাদের কর্তা তো বিশ্বনাথই। দারোগা যেমন থানার কর্তা, নায়েব যেমন মৌজার। "কাজ কি আমাদের ঘেঁটিয়ে?" বুদ্ধিমান বুড়ো ভিখারীরা সান্ত্বনা দেয় সকলকে, "ভাতে মরবো কি শেষে? যেতে যাও ভাই যেতে দাও!"

"যেতে দিলে ও শালা একদিন নিয়ে ভাগবে।" প্রতিবাদ করে খোঁড়া, "মালিকের কানে তুলে দিয়ে বোঝাব শালাকে। অত সোজা নয়। শা—লা।" গজগজ করে সে। খোঁড়া পায়ের কাঠটিকে ভীষণ আক্রোশের সঙ্গে ঠক্ ঠক্ ক'রে ঠোকে সে সিমেন্টের ফুটপাতে। কাটা পায়ে টোকা খেয়ে তার পঁচিশ বছরের তাজা রক্তের ধাক্কা হৃৎপিণ্ডের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে। কি একটা সঙ্কল্প করে সে এগিয়ে যায় সোহাগীর দিকে।

"আমরা হলুম গিয়ে এক দলের লোক—ভিকিরী—ও বাবু কেন আসবে আমাদের ভেতর?" ফিস্‌ফিস করে একটা জীবনমরণ সমস্যার বিষয় বোঝাবার চেষ্টা করে সে যেন। চোখ মুখ তার শক্ত, তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

"কেনো, বাবু কি করেছে?" বোকার মত জিজ্ঞেস করে সোহাগী।

"কি করেছে? ছুঁড়ির মত বকিস না। আরে মোদের সুখদুঃখ মোরাই বুঝবো। ও বাবুর অত মাথাব্যাথা কেন? ও কেন আসে তোর খাওয়া দেখতে, তোর হাত ধরতে?"

কেমন যেন কোণঠাসা হ'য়ে পড়ে সোহাগী। হঠাৎ ঝাঁঝিয়ে ওঠে—"তাতে তোর কি রে?"

"তুই কি ভাবিস বাবু তোকে নিয়ে ঘর করবে? মালিক টের পেলে কি করে দেখিস, তখন মজা বুঝবি।"

"তা নিয়ে তোর অত মাথাবাথা কেন রে লেঙা? আমার মজা আমি বুঝবো। তুই ভাগ!"

ফল হয় না কোনো, তবু আশা ছাড়ে না খোঁড়া। যৌবনের সহজধর্মে, তাড়া খেয়েও সোহাগীর কাছে ঘোরাফেরা করে।

বিশ্বনাথের নজর এড়ায় না কিছুই। কিন্তু সে দিন সে আর সামলে উঠতে পারল না।

"এই, তোর জায়গা তো ঐ ও-রাস্তায়। তুই এখানে এসে কি করছিস?" কড়া চোখে জিজ্ঞেস করল খোঁড়াকে।

"মোর বাট্টে বদলি হয়ে গেছে গো বাবু এর সাথে, তাই এসেছিনু"—মিথ্যে ব'লে খালাস পাবার চেষ্টা করে খোঁড়া। সোহাগী অবাক হ'য়ে খোঁড়ার মুখের দিকে তাকায় একবার। কিন্তু সত্যি কথাটা ফাঁস করে দেয় না। হঠাৎ তার জন্য একটু মায়াই বোধ করে যেন। হাজার হোক একই দলের লোক তো। না-ই বা জানল বিশ্বনাথ, কেন সে এসেছিল সোহাগীর কাছে। আজকের দিনটা উপবাসের হাত থেকে রেহাই পেতে পারে সে তাহলে। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সোহাগী।

"যা বাটি নিয়ে চলে যা।" ফুটো কলাইকরা বাটিটা বদলে নেয় ওরা,—বিশ্বনাথ বলে, "আর শোন—রোজগার ঠিক মত না হ'লে খাওয়ার বরাদ্দ কমবে। এখানে এসে খালি খালি গুজগুজ করা বের করব তোর!"

একটি লোক এসে দাঁড়ায় হঠাৎ তার খেয়াল হয়, সে ভদ্রবেশী পথচারী, সামনে যুবতী ভিখারী মেয়ে। অন্য পথিকের চোখে অবস্থাটা বিসদৃশ লাগবারই কথা। তাড়াতাড়ি পয়সা বের করতে গিয়ে একটা আনিই ছুঁড়ে দেয় সে সোহাগীর দিকে। তারপর চট ক'রে মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে যায়।

কিন্তু কাজের কি আর শেষ আছে? সারাদিন বিশ্বনাথকে কাজের হিসেব নিয়ে বেড়াতে হয়। খুশী মনে নিজের ডেরায় ফিরে গিয়ে যে একটু দিবাস্বপ্ন দেখবে সে উপায় রাখেনি বরাত। ভাদ্র মাসের রোদ্দুর অসহ্য হয়ে উঠছে। তবু তারি মাঝেই ছাতা মাথায় ঘুরে ঘুরে তদারক করে বেড়াচ্ছে বিশ্বনাথ। সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গেছে তার। মুখচোখ হয়ে উঠেছে দমফাটা রকম লাল। নাঃ, আর পারা যায় না। সোহাগীটা না থাকলে কি যে করতো, ভেবেই পায় না। দূর থেকে সে রোজ দেখতে পায় সোহাগীর মুখটা তামাটে হয়ে উঠছে। ফণা-বাঁকানো কটা কটা চুলগুলো শুকনো

হাওয়ায় উড়ছে। কেমন একটা মমতা হয় বিশ্বনাথের! মেয়েটাকে কি একটু সুখও দিতে পারা যায় না?

ঘেঙিয়ে চলেছে সোহাগী দুটো পয়সার জন্য চোখ বুজে একটানা সুরে। মানুষগুলোর কি দয়ামায়া নেই? সামনের পানের দোকানে দাঁড়িয়ে একটি বাবু হাসতে থাকে সোহাগীর দিকে চেয়ে। রক্তটা গরম হয়ে ওঠে বিশ্বনাথের। পর মুহূর্তেই দেখতে পায় বিশ্রী রসিকতার সঙ্গে একটা আনি ঠিকরে আসে সেদিক থেকে। চোখ খুলে একগাল হেসে আনিটা কুড়িয়ে নেয় সোহাগী। সত্যি সত্যি এবার রীতিমত জ্বালা অনুভব করতে থাকে বিশ্বনাথ। কিন্তু কিই বা করতে পারে সে? এদের হাত থেকে সোহাগীকে রক্ষা করতে গেলে একমাত্র যা উপায় তা অসম্ভব। পালিয়ে গিয়ে মালিকের শ্যেন-চোখকে ফাঁকি দেওয়া আরও অসম্ভব। অথচ এখানে থাকলে যে আর কিছুদিন পরেই মালিকের অন্য ব্যবসাতে চালান যাবে সোহাগী, এ কথাও স্পষ্টই জেনেছে সে বনওয়ারীলালের কাছ থেকে। না, তার আগেই বাঁচাতে হবে মেয়েটাকে। মনে মনে স্থির করে ফেলে বিশ্বনাথ। আজকের ভেতরই শেষ করবে সব ভাবনার।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। একটা মোটরের হর্ণে স্বপ্ন তার ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এদিকে ফিরে তাকিয়ে দেখে—চোরের মত খোঁড়া এগিয়ে আসছে সোহাগীর দিকে এপাশে ওপাশে তাকাতে তাকাতে। "হারামজাদা বড় বাড়িয়েছে দেখ্‌ছি।" ছিটকে এগিয়ে যায় বিশ্বনাথ সেইদিকে, রাস্তায় যানবাহনকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না যেন।

একটা ছোট্ট ঠেলা দেয় সোহাগী কি একটা কথায় খোঁড়াকে, আর সঙ্গে সঙ্গে খোঁড়াও দিল তার গালে একটা ঠোনা। জীবনে কখনও এদের গায়ে হাত তোলে নি বিশ্বনাথ। কিন্তু আর পারল না। মাথার সমস্ত রক্ত যেন বারুদের মত ফেটে পড়বে তার। প্রায় দৌড় এসে খোঁড়ার হাতটা সজোরে মুচড়ে দিল বিশ্বনাথ।

তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে উঠলো খোঁড়া। হাতটা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে অদ্ভুত ভাবে এক পায়ে লাফাতে লাগল লেজ নাড়ানো কুকুরের মত।

"কেমন? আর আসবি? মজা পেয়েছিস না? বিশ্বাস বারণ

করলেও শোনা হয় না। রস করতে এসেছেন—রস।" আবার একটা চড় কষালো সে। ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে পেছু হটে চললো ঘোঁড়া। "আর তুইও ঠিক তেমনি হারামজাদী, কতদিন বলেছি না তোকে ?" হাত ধরে টান দেয় সোহাগীর। "দাঁড়া মালিককে বলে তোর কি করি ছাখ। চল বাসায় !" বিশ্বনাথ পা বাড়ায়।

রীতিমত ভয় পেয়ে যায় সোহাগী—"হেই বাবু, আমাকে বকো কেনো ? ঐ মিন্‌সেই তো "—বিশ্বনাথের লম্বা পায়ের তালে চলতে চলতে একটানা কৈফিয়ৎ দিয়ে যায় সে।

লম্বা সড়কটা পার হয়ে তারা সোহগীদের খুপরিটাতে ঢুকলো এসে। বস্তিটা প্রায় খালি। সকলেই দুপুরের কাজে বা ভিক্ষেয় বেরিয়েছে।

"দরজা বন্ধ করে দে।" ধমক দিল বিশ্বনাথ, "ন্যাকামো বাড়ছে দিন দিন না ?" এদিক ওদিক চেয়ে মনের খুঁত্‌খুতি চাপা দিয়ে অগত্যা নোংরা মেঝেতেই গা এলাতে যায় সে।

"বাঃ—তুমি।" বিশ্বনাথের বর্তমান অবস্থা ও অবস্থানকে যেন বিশ্বাস করতে পারে না সোহাগীকে।

"এক্ষুনি যাবার জন্য এতটা পথ এলুম ?" খেঁকিয়ে উঠলো বিশ্বনাথ। তারপর নিজেই পা দিয়ে দরজার পাল্লা দুটো জোড়া লাগিয়ে দেয়, আর সঙ্গে সঙ্গেই দু হাতে বুকে জড়ায় সোহাগীর পাত্‌লা দেহ। বহুদিনের অতৃপ্ত ক্ষুধা আজ যেন আস্ত মেয়েটিকেই গ্রাস করবার জন্য মরীয়া হয়ে ওঠে। মুচড়ে, দুমড়ে একাকার করে দিতে ইচ্ছে করে সোহাগীকে।

"ছাড়ো বাবু লাগে।" প্রায় কেঁদে ফেলল সোহাগী এই অভাবনীয় ব্যাপারে।

"থাম্ !" বিশ্বনাথ ফিসফিসিয়ে বলল, "তোর ভাল লাগে না আমাকে ? চল না আমরা দুজনে গিয়ে ঘর বাঁধি। তোকেও আর ভিক্ষে করতে হবে না। কেমন রাজি তো ?"

বুঝতে পারে না সোহাগী, এ সুখ না শাস্তি ! জড়িয়ে জড়িয়ে উচ্চারণ করে, "আমরা ছোটলোক—গরীব—ভিকিরী—"

"সে তোকে ভাবতে হবে না। তুই যাবি কিনা বল !" দুহাত দিয়ে

তাকে জড়িয়ে ধরল বিশ্বনাথ। "সারাজীবন তো এভাবে কাটবে না সোহাগী! একা একা থাকলে মন্দ লোকের খপ্পরে তোকে পড়তেই হবে। আমাকে তোর বিশ্বাস হয় না বুঝি?"

বোকার মত চেয়ে থাকে সোহাগী। পাগলের মত কি সব যা তা বকছে বাবু! তাকে বাবুর এত দরকার?

"চল আমরা দুজনে গিয়ে ঘর বাঁধি! তোকেও আর ভিক্ষে করে খেতে হবে না, আমারও ভাল লাগে না এ জীবন। বুঝলি?" আবার বলে বিশ্বনাথ।

ঘাড় নাড়ে সোহাগী। সবই বুঝেছে সে। এই দুপুর রোদে তাকে আর ঘেঙাতে হবে না। গেরস্থ ঘরের বৌ-ঝির মত থাকতে পারবে, এত সোজা কথা বুঝতে ভিখারীদের দেরী হওয়ার কথা নয়।

আশ্বস্ত হয় বিশ্বনাথ। তারপর চলে তাদের আরো অনেক আলাপ, প্রায় একতরফা। ভবিষ্যৎ জীবনটা কথায় কথায় তাদের বর্তমান উপস্থিতির মতই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সন্ধ্যে নাগাদ বিশ্বনাথ বেরিয়ে এল সোহাগীর ঘর থেকে। কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত দেখাচ্ছে তাকে। আস্তে আস্তে পা ফেলছে সে, একটা অদ্ভুত অনুভূতিতে তার মন ভরে উঠেছে যেন। নিজের কাছেই তার নিজের দাম বেড়ে গেছে।

বড় রাস্তায় এসে চলবার গতি বাড়িয়ে দিতে হয়। এখন যেতে হবে আবার সব ভিখারীদের জড়ো করে আনতে। কিন্তু আজ আর তার বিরক্তি লাগছে না। আর ক'দিনই বা! নিজের মত করে জীবন শুরু করবার আগে এই অসহায় ভিখারীদের ওপর কেমন মায়াই অনুভব করছে সে যেন। এদের প্রতি নিজের দুর্ব্যবহার ও অবিচারের কথা স্মরণ করতে গিয়ে আজ সবার আগে মনে আসে খোঁড়ার কথা। আহা অতটা জোরে হাতখানা না মোচড়ালেই চলত। তারই খোঁজ আগে নেবার জন্যে তাগিদ বোধ করে বিশ্বনাথ।

কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না খোঁড়াকে। গেল কোথায় লোকটা? লাগেনি বোধ হয় বেশি। আর লাগলেই বা সে কী করতে পারে?

সোহাগীর সঙ্গে ভাব জমাতে না এলেই পারতো! নিজের কৃতকর্মের জন্ত একটু সাজা তার পেতে হবে বৈকি!

কাজ শেষ করে বস্তিতে ফিরে আসতে বেশ একটু রাত হয়ে গেল বিশ্বনাথের। বাচ্চা একটি ছেলে মায়ের কোলে সন্ধ্যে থেকে ঘেঙাতে সুরু করেছে, হরেক কোলাহলের মধ্যে সেই শব্দটাই বিরক্তিকর লাগে।

"থামা তোর ছেলেকে।" বিরক্ত হয়ে পথচলতি ধমক ছড়িয়ে যায় বিশ্বনাথ। এই সব ক্লেদাক্ত আবহাওয়ায় আর যে তাকে থাকতে হবে না এইটেই ভরসা।

চোখের সামনে উজ্জল ভবিষ্যৎ। পায়ের নীচে নোংরা গলি। চলতে চলতে সোহাগীর ঘরের দরজার সামনে এসে থমকে দাঁড়ালো বিশ্বনাথ। দরজাটা ঈষৎ ফাঁক। দূরের গ্যাসের আলোয় ছোট খুপরিতে মানুষের অস্তিত্ব বোঝা যায়। সোহাগীর কোলে মাথা রেখে শুয়ে রয়েছে—ও কে? খোঁড়া না? বিশ্বনাথ চোখের জ্যোতি তীব্র করবার চেষ্টা করে! কিন্তু সামনের দৃশ্যে ভুল দেখবার কোন ফাঁকই যে নেই! আরামে চোখ বুঁজে শুয়ে রয়েছে খোঁড়া, আর তার মোচড়ান বাহুতে হাত বোলাতে বোলাতে অনর্গল বকে চলেছে সোহাগী। মাঝখানে একটা কথা তীরের মত ছুটে এসে বিঁধে যায় তার কানে। "চল দুজনে ঘর বাঁধি। আর ভাল লাগে না এ বিস্তি।"

ঠিক এই প্রস্তাবই কি একটু আগে সোহাগীকে সে নিজে জানায় নি?

"শালার জাত যাবে কোথায়?" দাঁতে দাঁত চেপে মনে মনে উচ্চারণ করে বিশ্বনাথ। তারপর হাতের আধপোড়া বিড়িটার দিকে নজর পড়ায় মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে পা দিয়ে পিষতে থাকে।

জাত

বিয়ের দু'বছরের মধ্যেই জীবন এমন বিস্বাদ হয়ে যাবে কেই বা ভাবতে পেরেছিল?

জানলার গরাদে মাথা রেখে, হাতের সেলাইটা কোলের ওপর ফেলে, দূর আকাশে শিউলি তার দৃষ্টি ছড়িয়ে দেয়।

বহুক্ষণ কেঁদে কেঁদে খোকা ঘুমিয়েছে।

নিদারুণ ভ্যাপসা গরমে কাল সারারাত প্রায় একটানা কেঁদে গেছে খোকা, আর ততই রেগে গেছে সুকোমল শিউলির ওপর।

ছেলেটাকে থামাতে পার না?

থামছে না তো কি করব?

খোকাকে হাওয়া করতে করতে আস্তে আস্তে উত্তর দিয়েছে শিউলি।

থামছে না তো কি করব—মুখ ভেংচিয়ে বলে উঠেছে সুকোমল।

সারাদিন খেটে খুটে এসে রাত্রেও একটু নিস্তার নেই, জ্বালিয়ে খেলে।

বালিশটা বগলে চেপে ধরে—ক্লান্ত দেহটাকে কোনমতে টানতে টানতে পাশের বসার ঘরে চলে গেছে সুকোমল। আর ছেলেটাকে বিছানা থেকে টেনে তুলে কোলে নাচিয়ে নাচিয়ে একটানা সুরে তাকে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করেছে শিউলি।

শুধু কাল নয়, পরশু, তার আগের দিন। গরম পড়ে অবধি রোজই এমন হচ্ছে। প্রায় প্রতিদিন। শুধু গরম পড়েই বা কেন। হয়ত গরম পরে বেড়েছে, কিন্তু খোকার জন্মের কিছুদিন পর থেকেই যেন সুরু হয়েছে।

খোকা হয়েছিল শীতকালে। হয়ত যথেষ্ট শীতবস্ত্রের অভাবে, দারুণ শীতে কঁকড়ে কঁকড়ে কাঁদত খোকা, মায়ের বুকভরা স্নেহ-ভালবাসাও বোধ হয় তার কাঠির মত শরীরকে যথেষ্ট উত্তপ্ত করতে পারত না, আর ততই বিরক্তিতে যেন ফেটে পড়ত সুকোমল।

তবু শিউলি প্রতিবাদ করে নি।

সহ্যই করেছে সুকোমলের বিরক্তি, কটূক্তি—সব, সব। খোকার সারারাত কান্নার জন্য, যেন সে-ই একমাত্র অপরাধী। মেনেই নিয়েছে শিউলি।

সে তো বোঝে, সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর লোকটার একটু বিশ্রামের দরকার। একটু স্বাচ্ছন্দ্য চাই, যাতে আবার শরীরটা চাঙ্গা করে সে পরদিন কাজে যেতে পারে। যাদের জন্য সে খাটছে, তার সেই অতি প্রিয়জনদের কাছ থেকে সে এটুকু নিশ্চয়ই আশা করতে পারে। আর শিউলির দিক থেকে তো সেজন্য ত্রুটিও নেই। সংসারের অনেক ভাবনার হাত থেকে সে রেহাই দিয়েছে সুকোমলকে। ঘরের কোন কাজের জন্য সুকোমলকে ভাবতে হয়?

কিন্তু খোকার কান্না?

কি করতে পারে সে খোকাকে ভুলিয়ে ঘুম পাড়ানোর বার্থ চেস্টা করা ছাড়া?

খোকারই বা দোষ কি?

কাঠির মত চেহারা নিয়ে সে প্রাণপণে বিরক্তি জানায়, বর্তমান অবস্থার বিরুদ্ধে। দারিদ্র্যের চাপে শুকিয়ে যাওয়া তার দেহ। শুধুই রোগা হয়নি, খোকা জন্মাবার দু'মাসের ভেতরই তার বুকের অমৃত নিঃশেষিত হয়েছে, ছেলেটাকে থামানোর নিষ্ফল চেষ্টায় খোকার মুখে তার শুকনো স্তন গুঁজে দিতে চেয়েছে, আর ততই বঞ্চনার আক্রোশে আরও জোরে চেচিয়ে কেঁদে উঠেছে খোকা।

খোকা জন্মে অবধি তো এই চলছে। শুকিয়ে গেছে শিউলিরও একদা সতেজ দেহ। বিশ বছর বয়সেই যেন তার যৌবন ফুরিয়ে গেছে। চোখের তলায় পুরু কালি আর হাড়ওঠা বুক তার সমস্ত সৌন্দর্যকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছে।

গরাদে মাথা রেখে উদাস চোখে শিউলি সেই কথাই ভাবছিল।

কি যে সব হ'য়ে গেল। সবকিছু কেমন যেন গোলমাল লাগে শিউলির।

এই তো সেদিন বিয়ে হল তাদের। কত আশা, ভালবাসা, কত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তারা বিয়ে করল। ভবিষ্যতের কত স্বপ্ন তাদের চোখে। দু'জনের সম্মিলিত ভালবাসায় সারা জগতকে যেন তুচ্ছ মনে হয়েছিল তাদের কাছে। বাস্তব জীবনের গ্লানিকে তারা উপেক্ষা করতে চেয়েছিল।

অথচ আজ? তার আর সুকোমলের যে সম্বন্ধ দাঁড়িয়েছে, তা যে সুখী দাম্পত্য-জীবনের পরিচায়ক নয়, তাতে সন্দেহ কি? আর যাই হোক, সে-সম্পর্ক গভীর ভালবাসার নয়। আর তার জন্য দায়ী কি শুধু খোকা? খোকার কান্না?

খুঁটিয়ে ভাবতে চেষ্টা করে শিউলি।

খুব বড়লোক না-হলেও বেশ অবস্থাপন্নই ছিল শিউলিরা।

ছোটবেলা থেকে এমনি আবহাওয়া, এমনি স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেই বেড়ে উঠেছে শিউলি, যেখানে অভাব বা দারিদ্র্যের কথা শোনাও পাগলামো।

শুধু খাওয়া দাওয়া বা সাজ-সজ্জায় নয়, সব দিক থেকে আভিজাত্যের আবরণে মুড়ে রাখতে চাইতেন তার মা। স্কুল-কলেজে হেঁটে বা ট্রামে-বাসে যাওয়ার কথা ভাবতেও পারত না ওরা। বাবা অবশ্য অত মাথা ঘামাতেন না, কিন্তু মার মত অন্য। মা বলতেন, ওতে মান থাকে না,—তাই মান বজায় রাখতে হলে যা যা করতে হয় সব রকমেই অভ্যস্ত ছিল সে।

মায়ের মুখের ঐ কথাই ছিল—।—আজ না হয় তোমাদের অবস্থা তেমন নেই, তবু কত বড় ঘরের মেয়ে তোমরা তা ভুল না। নিজের মান বজায় রেখে তবে কাজ!

অন্য ভাইবোনেরা মান বজায় রেখেই কাজ করেছে। মাকে সুখী করেছে, বংশের মুখ উজ্জ্বল করেছে। কিন্তু শিউলি পারে নি।

মার মতে শিউলি বংশের মুখ পুড়িয়েছে, বাড়ির মান রাখতে পারেনি।

তা না হলে সে কেন তার অত দরিদ্র বন্ধু জয়ার দাদাকে ভালবেসে তাকে বিয়ে করার জন্য ক্ষেপে যাবে?

ঘেন্নায় মরে গেছেন মা, রায়বাহাদুর গগনচন্দ্র হালদারের স্ত্রী, মিসেস মনীষা হালদার, কিন্তু শিউলি লজ্জা পায় নি।

ও দারিদ্র্যকে চিনত না। জয়ারা নিম্ন-মধ্যবিত্ত নয়, বেশ দরিদ্র। জয়াদের সংসার দেখে শিউলি অবাক হয়ে গেছে—কিন্তু ঘেন্না করতে পারে নি মা বা দিদির মত। অথচ দারিদ্র্যের সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় তো জয়াদেরই বাড়িতে।

অত বড় কাপড় তুই কি ক'রে কেচে নিংড়োবি রে জয়া? ভারী লাগে না?

কতবার অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছে শিউলি জয়াকে কাপড় কেচে, অবলীলায় রাশকরা স্তূপ থেকে মেলে দিতে ভারী লাগে কিনা।

জয়া হেসে ফেলেছে শিউলির কথায়, তারপর কাপড় নিংড়ো'তে নিংড়োতে জবাব দিয়েছে—ভারী জিনিস ভারী লাগবে না? তাই বলে না বললে তো চলবে না, পারতে তো হবেই রে। না হ'লে কে কেচে দেবে রোজ?

কেন একটা ঝি রাখলেই পারিস?

ঝি বুঝি এমনি এমনি কাজ করে দেবে? তাকে মাইনে দিতে হবে না?

হবেই তো?

তবে?

বলে এমন একটা দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়েছে জয়া, যার পর শিউলি আর কোন কথা জিজ্ঞেস করতে পারে নি। কি জানি, এদের সব এমন অদ্ভুত। এমন অন্য জগতে বাস করে এরা।

অথচ সেই অন্য জগতের জয়ার মেজদাকেই ভালবাসল শিউলি।

জয়ার মেজদা সুকোমল, গম্ভীর চুপচাপ মানুষ। নিজের ঘরেই থাকে, অফিস যায় আর বাদবাকি সময় নিজের জীর্ণ তক্তপোষটার ওপর বসে মোটা মোটা বই পড়ে আর লেখে।

শুধু শিউলি কেন কারুরই লক্ষ্য পড়ে নি। দেরি হয়েছে অনেক।

ততদিন জয়া আর শিউলি দু'জনেই স্কুলের পরীক্ষায় পাশ ক'রল। জয়া তো আরও ভালভাবে। কিন্তু স্কলারশিপ পেল না বলে জয়ার আর পড়া হ'ল না।

কম আঘাত পেয়েছে শিউলি এতে? কত ইতস্তত করে তবে বলেছে,—আচ্ছা—জয়া। আমি যদি তোর মাইনেটা আমার হাতখরচ থেকে দিয়ে দিই?

কেন?

তোর বন্ধু বলে।

পাগল!

পাগল কেন? বল না জয়া, কেউ জানতেও পারবে না। বাবা তো আমায় পনের টাকা হাত খরচ দেন, তার থেকে তোর জন্য বুঝি দশটা টাকা খরচ করতে পারি না?

পারবি না কেন? তুই ভারি বোকা! আসল কারণ তো অন্য?

কি কারণ?

আরে আমার সময় কোথায়? দেখছিস না, স্কুলে যেতাম বলে দাদারা কতদিন হাত পুড়িয়ে খেয়েছে। তা...তখন না হয় ছোট ছিলাম, কিন্তু এখন তো সব বুঝতে পারি, দাদারা না বলুক, আমার একটা কর্তব্য তো আছে!

হ্যাঁ, সকলের মুখে এক কথা—কর্তব্য। জয়াদের বাড়িতে শুধু জয়া নয়, সকলেই এমনি যেন কর্তব্যপরায়ণ। মা-বাবা নেই জয়াদের, ভাইরা বুকে করে প্রাণপাত করে, ছোট ভাই বোনদের প্রতি কর্তব্য করেছে, কর্তব্য ছাড়া এরা যেন কিছু ভাবতেও পারে না।

শিউলিদের বিরাট তিনতলা বাড়ির পাশে জয়াদের দোতলা বাড়ির ভাড়া নেওয়া অংশ এক তলার সংসার। তিন ভাই আর জয়া। স্থান সঙ্কুলানের প্রশ্নই ওঠে না। দু'টি মাত্র ঘর আর তার সঙ্গে ঢাকা দেওয়া রোয়াক। কিন্তু সেই ছোট্ট সংসারটুকুই কত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সাজান-গোছান। সকলের হাতের নিরলস সেবায় সেই ছোট্ট সংসারের সব কিছু ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে।

কেউ বাদ যেত না কাজ করতে। সকলে। সকলের পারস্পরিক সাহায্যে গড়া সাজান সংসারে শিউলিও সাহায্য করতে এগিয়ে না এসে পারত না।

মায়ের বকুনি সত্ত্বেও সে বেশির ভাগ সময় এ-বাড়িতে থাকতে চাইত, কাজ করে জয়াকে সাহায্য করতে চাইত।

কখন এই সংসারটাকে, এদের সকলকে ভালবেসে ফেলল শিউলি, নিজেও বুঝতে জানতে পারে নি। তবে বি-এ পরীক্ষার আগেই সে বুঝে গেল জয়ার সেই রাত দিন বই পড়া, ইউনিয়ন করা মেজদা সুকোমলকে ও প্রবলভাবে ভালবেসে ফেলেছে।

মা তো রীতিমত চমকে গেলেন, দিদির মুখে একথা শুনে।

বলিস কিরে শিউলি? তোর রুচিতে বাধল না। অমন ঘরে একদণ্ড দাঁড়াবার কথাও যে আমরা ভাবতে পারি না!

তুমি পার না মা, আমি পারি।

দারিদ্র্যকে সম্মান করার গর্বে গর্বিত হয়ে বলে উঠল শিউলি।

তোমার পারা বের করছি। তোমার দাদা আজ বাড়ি আসুক। তখনই কর্তাকে বলেছি যার তার সঙ্গে ছেলেমেয়েদের মিশতে দিও না, আমি পছন্দ করি না, ওতে নজরও নীচু হয়…তা তোমার বাবা যেমন…

বাবার আর কি দোষ মা!

দিদি ফোড়ন কাটতে ছাড়ে নি। বাবা তাঁর ছেলেমেয়েদের অবিশ্বাস করবেন এই তুমি বলতে চাও? তারা যদি বিশ্বাসের যোগ্য না হয়, তো বাবার দোষ কি?

একফোঁটা পুঁচকে মেয়ে, তাদের আবার বিশ্বাস অবিশ্বাস কি? মন না মতিভ্রম। এসব মেয়েদের কড়া শাসন দরকার।

উনিও তাই বলেন মা। হাকিম-গিন্নী প্রণতি, তার দিন দিন মোটা হয়ে যাওয়া ভারী গা, ইজিচেয়ারে এলিয়ে দিতে দিতে বলেছে—তোমার জামাই তো আজকালকার এই সব প্রেম ট্রেমের নাম শুনলে জ্বলে ওঠে।

আর সত্যিই জ্বলে গেছে শিউলি। দিদির ওপর, মার ওপর, সংসারের সবলের ওপর। এক অদ্ভুত জগতে যেন ওরা বাস করছে। আজো

জয়াদের জগৎ তার কাছে অচেনা মনে হত, এখন কেন জানি, তার এই অতি আপনজনদেরই অন্য জগতের বলে মনে হয়। সে জগৎ বাস্তবের নয়, সেখানে খালি আরাম, খালি সুখ, খালি স্বার্থ। এদের কাছে সমস্ত জগতের প্রাণ-কেন্দ্র যেন কেবল নিছক আরাম, আর সুখ, আর অর্থে। আর শুধু তাই নয়, কেবল উপভোগেই তৃপ্তি নেই, তার প্রকাশে আনন্দ।

যতটুকু না অর্থ, তার সহস্রগুণ প্রকাশ। শিউলির সব কেমন নিরর্থক লাগে। এখানে সব মেকি, সব নকল। এমন কি দিদির, যার জন্য বহু দেখে শুনে আনা শাড়ি প্রেজেণ্ট করা পর্যন্ত। সব যেন মেকি, তাতে যেন হৃদয়ের স্পর্শ নেই। অথচ জয়ারা?

বাবা সব শুনলেন।

ধীরভাবে শুনলেন, মার মত অত হৈ-চৈ করলেন না। শুধু মাকে নয়, দিদিকেও থামালেন, দাদাকেও, তারপর একান্তে ডেকে নিলেন শিউলিকে।

বাবার কাছে শিউলি যেন সহজ হতে পারল অনেকটা।

মা শিউলি!

সস্নেহে কাছে ডাকলেন বাবা।

কি বাবা!

আমি সব শুনেছি, যদিও এর থেকে কোন কিছুতেই আমি বেশি অবাক হতাম না, তবু তোমার কাছ থেকে আমি নিজের কানে শুনতে চাই।

বলুন!

তুমি কি বেশ করে ভেবে দেখেছ এ বিষয়ে?

হ্যাঁ, বাবা!

তারপর বাবার সঙ্গে তার আলোচনা চলেছে অনেকক্ষণ। কত রাত হয়ে গেছে, বেয়ারা খেতে যাবার জন্য ডাকতে এসে, দরজার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কতবার ফিরে গেছে, অবশেষে মায়ের গম্ভীর উপস্থিতিতে আলোচনায় ছেদ টেনেছে তারা।

অনেক রাত হয়ে গেছে, কখন খেতে যাবে, সকলে বসে আছে যে তোমাদের জন্য…

মা খোটা গলায় বলেছেন।

আমরা যাচ্ছি তুমি যাও। খেতে আরম্ভ করে দাও…

মাকে পাঠিয়ে আবার বাবা শিউলিকে বারবার জিজ্ঞেস করেছেন কত কথা, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে। তবে সমস্ত আলোচনার ভেতর দিয়েই এ বিশ্বাস শিউলির আরও দৃঢ় হয়েছে যে, তার এ কাজে বাবার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকলেও কোথায় যেন একটা সমর্থন আছে। তা না হলে তিনি ঐ কথাটাই ওকে জিজ্ঞেস করবেন কেন?

শিউলি, মা!

কি বাবা!

সব তো শুনলাম, কিন্তু আমি তো ভাবতেও পারি না, তুমি এভাবে সুকোমলকে নিজের জীবনে জড়িয়ে এত দুঃখের ভেতর ইচ্ছে করে নিজেকে ঠেলে দেবে। আমি আমার আদুরে মেয়েকে চিনি তো!

জানি বাবা, তুমি আমায় ভালবাস বলেই ভয় পাচ্ছ। কিন্তু আমি দারিদ্র্যকে ভয় পাই না।

তুমি পাও না, কারণ তুমি অনভিজ্ঞ কিন্তু আমরা পাই, আমাদের অভিজ্ঞতা বলে এতে শুধু মানুষের কোমল প্রবৃত্তিগুলোই নষ্ট হয়ে যায় না, জীবনের সব শান্তিই চলে যায়।

আমি তা মানি না বাবা।

বড় ভুল করছ মা, এখনও ভেবে ছাখ।

ভেবে দেখছি বাবা, আমি স্থির করেছি সুকোমলকেই বিয়ে করব।

কেন! তোমাকে আর কি ব'লে বোঝাব। শুধু…

কিন্তু মা অত সহজে ছাড়েন নি। তাই বাবার নির্বুদ্ধিতার ধিক্কার দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হন নি। কড়া পাহারায় রেখেছেন তিনি শিউলিকে, যার ফলে অনেক কষ্টে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করল তারা।

মায়ের ইচ্ছা আর ঘোষণামত শিউলির নাম পর্যন্ত অস্বীকৃত হল সে বাড়িতে। সে কথা শিউলিরও কানে গেল। মা নাকি বলেছেন, সে এ বাড়িতে মৃত।

দাঁত দিয়ে নিজের ঠোঁট কেটে ফেলেছে শিউলি। কেঁদে ভাসিয়ে

দিয়েছে সুকোমলের বুক, আর ততই সুকোমল ওকে ভরিয়ে দিতে চেয়েছে আদরে, সোহাগে। সুখ, সুখ, সুখ।

সমস্ত জগৎ ভুলেছে শিউলি সুকোমলকে পেয়ে, সারা জগৎ মাধুর্যে ভরে গেছে, বার বার আবৃত্তি করেছে।

মধুময় পৃথিবীর ধূলি।...

গত দু বছরেও খোঁজ নেয় নি তার বাপের বাড়ি থেকে, সে বেঁচে আছে কি মরে গেছে। এর মধ্যে সুকোমল অন্য জায়গায় কাজ নিয়ে চলে এসেছে। জয়া আর ভাইরা সে বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র বাস নিয়েছে, মায়ের অত্যাচারে তাদের নাকি সেখানে থাকা সম্ভব হয় নি।

চলে এসেছে এই মফস্বলে শিউলিরা, তার ছোট সংসার পেতেছে সুকোমলকে নিয়ে, দিনের পর দিন দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেও মুখের হাসি অম্লান রাখতে চেষ্টা করেছে।

কিন্তু কেমন করে সুকোমলও যেন বদলে গেছে। শিউলি তো কোন অনুযোগ করে নি, অভ্যস্ত আরামের জীবনের কথা ভেবে সে তো খেদ করে না? তবে সুকোমল কেন এমন বদলে গেল? যার জন্য শিউলি তার আবাল্যের সুখ, পরিচয়, সম্পর্ক সব ত্যাগ করল তার এ কি ব্যবহার? সেই চুপ করে থাকা আদর্শবাদী লোকটা কেমন করে এমন হয়ে গেল? শিউলি তাহলে কি নিয়ে বাঁচবে? কেন এমন হল? কি কারণে? দারিদ্র্য?

ভাববার চেষ্টা করে শিউলি। জানলা দিয়ে নিজের উদাস দৃষ্টি মেলে একথাটাই বারবার মনের মধ্যে তোলপাড় করে শিউলি।

দারিদ্র্য?

হাতের সেলাইটা নিয়ে আস্তে আস্তে ফোঁড় দেয় শিউলি।

বাবা কি এই ভবিষ্যতেরই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন? তাই। সত্যিই তাই। দারিদ্র্যে জীবনের শান্তি নষ্ট নয়, সব সুকুমার প্রবৃত্তি, সব কোমলতা চলে যায়। ঠিকই বলেছিলেন বাবা।

অথচ এ জীবন সে মেধে নিয়েছে। এর থেকে তার অব্যাহতি নেই। ক্রমে ক্রমে সুকোমলের সম্বন্ধেও যেন তার সব আশার শেষ হয়েছে। মোহ ভঙ্গ হয়েছে বুঝি। না হলে যে সুকোমলের এক মুহূর্তের অদর্শনও তার সহ্য হ'ত না, তার দর্শনমাত্র সে ভয় পায় কেন? কেন এড়াতে চায় তাকে? সুকোমলের ব্যবহারই তার প্রতি বিরক্তি এনে দিয়েছে। সুকোমলও কি কম বিরক্ত? হয়ত আর ভালই বাসে না শিউলিকে।

সুকোমল ভাল ব্যবহার শিখবে কোথা থেকে? ও যে আজন্ম দরিদ্র। ওর মাধুর্য যে জন্ম থেকেই নিষ্পেষিত হয়ে গেছে, অভাবের তাড়নায়। তাই বুঝি তার পক্ষে এ ব্যবহার যেমন স্বাভাবিক, শিউলির পক্ষেও সে রূঢ় ব্যবহারকে উপেক্ষা করেও মুখ বুজে থাকাটাও তেমনি সহজ। ছোটবেলা থেকে সুখে, সংযত আরামে প্রতিপালিত বলেই না শিউলি এত ভদ্র থাকতে পেরেছে।

কিন্তু খোকা?

কি হবে খোকাকে নিয়ে? খোকাকেও তো এমনি দারিদ্র্যের ভেতর মানুষ হ'তে হবে। তাহ'লে? খোকাও অমনি হবে? অমনি রূঢ় কর্কশ? ভদ্র, সংযত, শান্ত হ'তে ভুলে যাবে?

একবার ঘুমন্ত খোকার মুখের ওপর সস্নেহে দৃষ্টি মেলে দিল সে। ক্রমশ যেন তার দেহ পুরন্ত হয়ে উঠছে। লাল ফোলা ফোলা গাল, লাল ঠোঁট দু'টি ঘুমের মধ্যেও যেন নড়ে উঠছে। খোকাকে আদর করবার একটা সুতীব্র ইচ্ছাকে দমন করে আবার সেলাই করতে লাগল শিউলি।

মফস্বল বলে কোলকাতার মত একখানা ঘরেই পচে মরতে হয় না এই যা রক্ষা। না হলে কুড়ি টাকা ভাড়ায় দু'খানা ঘরের কথা ভাবাও যেত না। কোলকাতায় এ ভাড়ায় পাকা ঘরও হত কি না সন্দেহ।

রান্নাঘরের পাশে যে ফালি জমিটুকু পড়েছিল তাতেই কতগুলো শাক আর আনাজের গাছ পুঁতেছিল শিউলি।

সেদিন বিকেলে খোকাকে কোলে করে একটা ছোট লাঠি দিয়ে লাউ শাকের ডগাটা রান্নাঘরের চালার ওপর তুলে দিচ্ছিল।

বাইরে একটা গণ্ডগোল শুনে হাতের লাঠিটা ফেলে একেবারে বাইরে রোয়াকে এসে দাঁড়াল শিউলি।

তাদের বাড়ির সামনে ভিড়। পাঁচ-ছ'জন লোক নেমেছে একটা ট্যাক্সী থেকে। গাড়ির ভেতর থেকে তারা ধরাধরি করে বার করবার চেষ্টা করছে একজনকে।

বুকটা ধড়াস করে উঠল শিউলির।

না—

সুকোমলের অচৈতন্য দেহকে শিশুর মত যত্নে নামাচ্ছে অফিসের লোকেরা। চীৎকার করতে গিয়েও হাত দিয়ে নিজের মুখ চেপে ধরল শিউলি।

কি হ'ল? আর্তস্বরে প্রশ্ন করল শিউলি।

সুকোমলবাবু অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

কখন থেকে? কেমন করে? কেন?—কত প্রশ্ন ভিড় ক'রে এল ওর মনে। কিন্তু শুধু ঘরের ভেতর ওদের ডেকে শান্তস্বরে জিজ্ঞেস করল, কখন?

এই দুপুরের পর। সঙ্গে ডাক্তার এনেছি, আপনি ব্যস্ত হবেন না।

তক্তপোষের ওপর টানটান করে পাতা বিছানাটা আর একবার ঝেড়ে দিল শিউলি। বড় ইচ্ছে করছে সুকোমলের মাথাটা কোলে নিয়ে বসে, কিন্তু এত লোক। খোকাকে কোলে নিয়ে কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল শিউলি।

এদের কাউকে চেনে না সে। চিনতে চায় না। এতদিনেও এদের সঙ্গে কোনদিন আলাপ করে নি সে। সুকোমলকে ভালবাসে সে, সহ্য করে তার সঙ্গে আসা দারিদ্র্যকে। কিন্তু এই সব দরিদ্রদের নয়, এরা তার কেউ নয়। প্রথমে বুঝি ভালবাসতে চেয়েছিল এদেরও, কিন্তু রূঢ় বাস্তব তার মনকে আবার ফিরিয়ে দিয়েছে। সকলে ব্যস্ত হ'য়ে ব্যবস্থা করছে, এর মধ্যে সঙ্কুচিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল শিউলি। হাত দিয়ে একবার ছুঁয়ে দেখল সুকোমলের কপালটা।

না টেম্প্যারেচার নেই।

ওর ঘোমটায় ঢাকা মুখের দিকে তাকিয়ে ডাক্তার ওকে সান্ত্বনা দিলেন।

আপনি ব্যস্ত হবেন না। মধ্যে তো জ্ঞান বেশ ফিরেছিল, এখন দেখছি আবার সেন্স হারিয়েছেন, তবু ভয় নেই।...আমরা তো আছি।

এবার ভাল করে তাকিয়ে দেখল শিউলি। রোগা, দারিদ্র্যক্লিষ্ট, খেটেখাওয়া ক্লান্ত সব মুখ। এরা তাকে ভরসা দিচ্ছে, কতটুকু জোর সে ভরসায়? তবু তাদের উদ্বিগ্ন মুখ দেখে একটু যেন ভরসা পেল শিউলি। আস্তে আস্তে সে সুকোমলের পাশে এসে দাঁড়াল।

প্রায় পনের মিনিট বাদে সুকোমল সম্পূর্ণ জ্ঞান ফিরে পেল আর তারও পরে বাঁ হাতটি বাড়িয়ে দিল শিউলির দিকে।

যতই বিরক্ত হোক তবু জ্ঞান পেয়েই সুকোমল শিউলিকে খুঁজেছে। চোখে জল এসে গেল শিউলির।

সুকোমলকে গরম দুধ খাইয়ে আরও একটু সুস্থ করে ওর পাশে এসে বসল শিউলি খোকাকে নিয়ে। ডাক্তার নাড়ী দেখে বললেন—বাস খুব ভাল আছেন সুকোমল। আর ভয় নেই। তাহলে বৌদি আমাদের জন্য চা আনুন—খুব ক্লান্ত আমরা।

সব থেকে কালো রোগা লোকটি বললেন মাড়ি বেরকরা হাসি হেসে।

বিব্রত বোধ করল শিউলি।

মাসের শেষ। যা চা আছে তাতে বড় জোর দু-তিন কাপ হ'তে পারে, অথচ এরা তো সংখ্যায় সাত-আট জনের কম নয়। তাহলে?

হঠাৎ তার মনে হল, সেও যদি এখন এমনি সুকোমলের মত পড়ে থাকতে পারত তো বেঁচে যেত। কিন্তু...

স তা ভুল হয়ে গেছে, জল চাপিয়ে আসি।

রান্নাঘরে চলে এসে ডালের কড়াটা নামিয়ে জলের কেটলিটা বসিয়ে দিল দিল উনুনে। সত্যি কান্না আসতে লাগল তার। এমন বিপদে মানুষে পড়ে। ভারি রাগ হ'ল সুকোমলের ওপর। তার সঙ্গে জীবন জড়িয়ে, কেবলই কি এমন লজ্জাকর পরিস্থিতির সামনে আসতে হবে তাকে?

মনে পড়ল তাদের বাড়ির চায়ের আসরের কথা। এতক্ষণে দাদা

হঠাৎ গাওয়া গান।

চায়ের গন্ধে, খাবার টেবিল সুরভিত হ'য়ে উঠেছে। মায়ের দৈনন্দিন উপদেশ আরম্ভ হয়ে গেছে, বিরক্ত হলেও কেউ কিছু বলবে না, বাবা তো নয়ই। কত ভদ্র ব্যবহার। আর এরা? নিজেদের মুখে, চা চেয়ে বসল। শুধু শিউলিকে অপ্রস্তুতে ফেলবার জন্যই নিশ্চয়ই। গোটা জাতটার ওপর নিদারুণ রাগ হ'তে লাগল শিউলির।

খোকা তার বুড়ো আঙুলটা মুখের ভেতর পুরে মহানন্দে নির্বিকারভাবে চুষছে। সকলের ওপর রাগ হ'ল শিউলির। সবাই নির্বিকার, যত দায় শুধু তার।

অসহ্য এই লোকগুলো। চা না খেয়ে যাবেও না। কি রকম হাসি-তামাসা লাগিয়েছে। যেন সব ভোজে নিমন্ত্রিত হয়েছে। ওদের ওপর রাগে জ্বলতে লাগল শিউলি। নিজেই অবাক হয়ে গেল অতিথিদের এত অসহ্য মনে হচ্ছে দেখে। কিন্তু, কি করবে? বাক্স হাতড়ে দেখেছে, দু-আনা পয়সা পড়ে আছে। আজই সুকোমলকে কিছু টাকা আনতে বলেছিল। সে প্রশ্ন তো ওঠেই না এখন। অথচ জল ফুটে এল। তারপর?

শুধু চা নয়, চিনিও নেই। খোকার দুধ থেকে দুধ দিয়ে না হয় কাজ চালাবে, কিন্তু চা, চিনি? দরিদ্র জাতটার ওপর ঘৃণা এসে গেল শিউলির। এরা জঞ্জাল, পৃথিবীতে এদের কোন প্রয়োজন নেই, ভার বাড়ানো ছাড়া, এরা পরাশ্রয়ী—প্যারাসাইট্......

বৌদি কোথায়?

ডাক শুনে চমকে উঠল শিউলি।

দেরি দেখে একেবারে অন্দরমহলে হানা দিয়েছে। আসুক, সে বেরোবে না। সামান্য এককাপ চাও না দিতে পারার লজ্জা থেকে অন্তত নিজেদের বাঁচাবে।

কই বৌদি! গেলেন কোথায়?

আবার ডাক এল।

একেবারে পর্দানশীন হয়ে গেলেন যে? তাহ'লে কি আর চলে?

না চলে না, রাগে গা জ্বলতে লাগল শিউলির। অবাক হয়ে গেল সে,

তাহলে তারও রাগ আছে, বিরক্তি আছে, শুধু সুযোগের অপেক্ষা মাত্র? চুপ করে বসে খোকাকে কোলে করে অকারণ দোল দিতে লাগল।

নাঃ বৌদি আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না।

একেবারে রান্নাঘরে এসে হাজির হল। সেই রোগা মতন ছেলেটা যার আধময়লা কাপড় আর কাঁধছেঁড়া জামা শিউলির চোখ এড়ানি।

বৌদি আমি অমল, সুকোমলদার সঙ্গে কাজ করি—এই জিনিসগুলো নিন, হাত যে ধরে গেল।

কি আবার জিনিস?

এই যে…,

আপনারা আমায় অপমান করতে চান, না?

মানে?

অতিথির জিনিসে অতিথিসেবা করব এত বড় অভদ্র আমি নই।

কথাগুলো নীচুস্বরে বললেও, প্রায় ছিটকে বেরিয়ে এল শিউলির মুখ থেকে। কিন্তু অমল একটুও রাগ করল না, বরং বেশ খানিকটা অবাক হয়েই বলল মৃদু হেসে, কি, কি বলছেন বৌদি! সুকোমলদার স্ত্রীকে অপমান—ভাবতেও পারি না যে। আর অতিথি কে? আমরা তো সব ফিস্ট করব। নিন ব্যবস্থা করুন এ সবের।

ওর হাত থেকে প্যাকেটগুলো নামিয়ে রাখল শিউলি। খাবারের ঠোঙাটা ও নিজেই রাখল একটা কাঁসি টেনে নিয়ে তারপর হাত ঝেড়ে এক মুখ হেসে বলল, যাক এবার নিশ্চিন্ত, এখন বৌদির ডিপার্টমেন্ট—আমরা ফ্রি।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল শিউলি অমলের দিকে। কৃতজ্ঞতায় চোখ দু'টো জলে ভরে এসেছে।

ও কি বৌদি! চোখে জল কেন!—আশ্চর্য…আরে সুকোমলদার কোন ভয় নেই। ডাক্তারবাবু নিজে বলেছেন।

অমলের আর যাওয়া হল না। এগিয়ে এল শিউলির দিকে।

দিন, খোকাকে আমার কাছে দিন। চা তৈরি করুন, জল তো অনেকক্ষণ ফুটে গেছে।

রান্নাঘরের চৌকাঠের ওপরই বসে পড়ল সে, জানেন বৌদি, সুকোমলদার জন্য আজ আমাদের—মানে এই কেরাণী জাতটারই মান বেঁচেছে। জানেন তো সুকোমলদার একটা লিফট্ হয়েছে। প্রায় পঞ্চাশ টাকার মত মাইনে বাড়ল। কিন্তু সুকোমলদাকে তো ওরা চেনে না। টাকা বা প্রমোশন দিয়ে ওঁর মুখ বন্ধ করবে? ফলে অর্ডার পাওয়ার পরই সুকোমলদা আর সকলের দাবী আদায় করার জন্য সারাদিন আজ যা করছে ...তার জন্যই তো...পরে সব ডিটেলস্ বলবো। তবে বৌদি সুকোমলদার শরীরটা কিন্তু বড্ড ভেঙ্গে গেছে। উত্তেজিত হওয়ার জন্য উনি যে এভাবে অজ্ঞান হয়ে যাবেন, তা আমরা ভাবতেও পারি নি। সত্যি সুকোমলদার জন্য গর্বিত আমরা।......

অনর্গল কথা বলে যেতে লাগল অমল। যেন কতকালের চেনা-জানা তাদের। আর যন্ত্রচালিতের মত কথাগুলো শুনতে শুনতে চা তৈরী করতে লাগল শিউলি।

বড কাঁসার থালাটায় খাবার গুছিয়ে আর একটা থালায় কাপ আর গেলাসের সংমিশ্রণে চা ঢেলে সাজিয়ে দিল, তারপর আঁচলে হাত মুছে খোকার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, ওকে দিন—

দিন নয় বৌদি, আপনি-টাপনি নয়, খোকা আমার কাছে থাক। সুকোমলদার কাছে ওকে নিয়ে যাই। জানেন, অফিসে তো জ্ঞান ফিরে পেয়েই আপনার আর খোকার নাম।

শিউলির কান্না পেল। সুকোমল তাহলে এখনও তাকে ভালবাসে? দারিদ্র্য তার কোমল প্রবৃত্তি এখনও তা'হলে নষ্ট করে নি?

অমল খোকাকে রেখে এসে নিজেই দু'হাতে থালাগুলো বাইরের ঘরে রেখে এল, যেন ও এ-সংসারেরই একজন। বাইরের ঘরের হাসি আর গল্পের পর্দা চড়তে লাগল। সামান্য চা আর খাবারকে ঘিরে তারা উৎসবে মেতে উঠল যেন। আর শিউলির মনে হল বাড়ির পচা ও গুমোটলাগা ঘরে যেন দক্ষিণের বাতাস এসে স্পর্শ করল।

কখন সে নিজেও বাইরের ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে। মানবিকতার কোন দুর্দমনীয় আবেগে ও ওদের মাঝখানেই এসে দাঁড়িয়েছে।

আসুন বৌদি!—

টাকমাথা মোটা লোকটি সাদর আহ্বান জানালেন।

আমরা গরীব মানুষ, খাবার দেখে উল্লাসটা বেশি করে ফেলি।

বড় বড় চোখ তুলে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল শিউলি এদের দিকে। নিজেদের আনা জিনিসকে, তারা কত মর্যাদার সঙ্গে, গৃহস্বামীর দান বলে স্বীকার করে নিচ্ছে। এরা দরিদ্র, তার আবাল্য পরিচিত সমাজ থেকে এরা পৃথক, তার বাবা-মা ভাই-বোনদের কাছে এরা উপেক্ষা বা কৃপার পাত্র। কিন্তু এরাই তো মানুষ, এদের হৃদয়াবেগ তাকে উদ্বেলিত করে দিল। এক চরম অনুভূতির কিনারায় পৌঁছে দিল যেন, তা না হলে সে কি করে বলতে পারল—

সে কি ভাই! আমি তো আপনাদেরই একজন, আমার কাছে কুণ্ঠা?

তৃতীয় মরম

মাঝরাতে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে চলল রমা।

এই! এই!! কি হয়েছে? বল, কি হয়েছে?

অনেকক্ষণ পরে ঘুমে-জড়ান চোখ খুলে ওকে ঠেলা দিতে লাগল চিন্ময়।

কিছু না, কিছু না।

কিছু না, তাহলে হঠাৎ কাঁদছ কেন? এটা কি কাঁদবার সময়? একটু ঘুমুতেও দেবে না। কোন দুঃস্বপ্ন দেখলে নাকি?

না—

নাক মুছতে মুছতে বলল রমা।

তবে? সত্যিই জ্বালালে। তোমার নভেলি ব্যাপার আর গেল না সারাজীবনেও। রাত্রে ভাল করে ঘুমুতেও দেবে না? সন্ধ্যায় অতগুলো খেলাম, চোখের পাতা যে জড়িয়ে আসছে।

তুমি ঘুমোও না, যেমন ঘুমোচ্ছিলে।

বললেই হ'ল না। পাশে একজন গলা ছেড়ে কাঁদতে থাকবে আর আমি ঘুমোব? কালা তো ন'ই। তাহলে তো ইঞ্জিন তৈরীর কারখানাতেও ঘুমোতে পারব।

তাও তো পার।

মনে মনে ভাবল রমা।

নাও, নাও ঘুমিয়ে পড়? জ্বালিও না। বালিশ টেনে পাশ ফিরতে ফিরতে আবার ঘুমোবার চেষ্টা করল চিন্ময়।

একটু পরেই গাঢ় ঘুমে তার নাক ডাকার আওয়াজ পাওয়া গেল।

রমা নাক মুছে আস্তে আস্তে উঠে বসল বিছানার ওপর। হাঁটুর ওপর মুখ রেখে সে কতক্ষণ বসে থাকল জানে না। চোখ দুটো আবার জলে ভরে এল। বুকের মধ্যে একটা কষ্ট, পাথরের মত ভারী হয়ে আছে যেন। অথচ ঠিক দুঃখের সংজ্ঞাও যেন সে খুঁজে পাচ্ছে না। ঠিক দুঃখটা কি তার? ভাল করে আবার সন্ধ্যাটা ভেবে দেখতে চেষ্টা করল সে। কারণ সে ভালবাবেই জানে। কিন্তু এর কি কোন যুক্তি আছে? আজ সাত বছর তাদের বিয়ে হয়েছে। কোন বাচ্চা-কাচ্চা আজ পর্যন্ত হয় নি। সেজন্য তার জীবনে প্রচুর অবসর। চিন্ময় লোকটা মোটামুটি ভাল, কিন্তু একটু স্থূল আর রাগী। সে কথা তো বিয়ের বছর থেকেই বুঝতে পেরেছে রমা। চিন্ময়ের মন রেখে একটু চলতে পারলে তো ভাবনা নেই, অবশ্য সর্বক্ষণ তটস্থ হ'য়ে থাকাও কম কষ্টকর নয়। তবু রমা তো কোন প্রতিবাদ করে না। নীরবে নিজের ভাগ্যকে মেনে নিয়েছে, তার কৈশোর-যৌবনের রঙীন দিনগুলোকে ও পড়ে-ফেলা বইয়ের মত একপাশ সরিয়ে রেখেছে। অনর্থক মনকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি?

তাছাড়া সর্বক্ষণ কিছু অশান্তি করে না চিন্ময়। ভালবাসার রোমান্টিক কোন অনুভূতি তার নেই, কিন্তু অন্যদিকে তো পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতই ব্যবহার। বরং একটু সাদামাটাই।

স্বামী তেমন রোমান্টিক নয়, সাদামাটা স্থূল—এই নিয়ে আবার কারও অভিযোগ চলে নাকি? তাকে কম সুখে তো রাখেনি চিন্ময়, তবে?

সাধে ওর যেকোন ভাবাবেগ বা উচ্ছ্বাসকে চিন্ময় নভেলি আখ্যা দেয়? সারাদিন প্রচুর পরিশ্রম করে রমারই সুখ-সুবিধের জন্য অর্থ রোজকার করে আনে চিন্ময়। তারপরও যদি রমার অভিযোগ থাকে, মনে তার গভীর দুঃখ আছে, তার স্বামী তার দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দিচ্ছে না, তার মনের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো বুঝতে পারে না, তাহলে আর বলার কি আছে?

মশারির ভেতর থেকে সন্তর্পণে বেরিয়ে এল রমা। চিন্ময়ের নাক বেশ জোরে ডাকছে। এও একটা ভারী অদ্ভুত ব্যাপার। স্বামীর নাক ডাকা অভ্যাস, অথচ সাত বছর ঘর করার পরও স্ত্রী তাতে অভ্যস্ত হ'ল না। গত বছর থেকে 'ইকোয়ানিল' খেয়ে ঘুমোতে হচ্ছে, তবু কোনক্রমে একবার

নাক ডাকা কানে গেলে আর রক্ষা নেই। সে রাত্রের মত ঘুম শেষ। অথচ এসব কথা ডাক্তারকেও বলতে পারে না রমা। বিবাহিত জীবনে পরস্পরকে খানিকটা সহ্য করে বলেও একটা কথা আছে। আসলে বোধহয় রমা স্বামীকে ভালই বাসে না।

নিজের মন তলিয়ে দেখতে চায় সে, খুব গভীভাবে চিন্তা করলে, যে সত্যের মুখোমুখি তাকে দাঁড়াতে হয়, তাতে উল্লসিত হবার মত কিছু নয়। বরং রমার দুশ্চিন্তা বেড়েই যায়। অথচ একথা স্বীকার করতেও সে কুন্ঠিত হয় যে, স্বামীকে সে ভালবাসে না, দিনের পর দিন এমনিই শুধু সাজান সংসার করে যাচ্ছে।

পাশের টেবিলে রাখা জলের জাগ্ থেকে গ্লাসে জল ঢালল রমা, এক চুমুকে প্রায় সব শেষ করল। তারপর জানলার কাছে সরে এসে অন্ধকারের মধ্যে দৃষ্টি মেলে দিল।

পাশের ঘর থেকে কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। এই গভীর রাত্রে পাওয়ার কথাও নয়। অথচ কিছুক্ষণ আগেও বোধহয় ছিল। চুড়ির আওয়াজ, মৃদু হাসি, পুরুষ গলায় মাঝে মাঝে অশ্রুত দু'একটা কথা, মেয়ে গলায় ফিসফিসানি, সব শুনতে পেয়েছে রমা। সমস্ত মন দিয়ে একাগ্র হয়ে ও-ঘরের শব্দ শোনবার চেষ্টা করেছে রমা, উচিত নয় জেনেও। আর তার প্রতিদিনের রাতগুলোর সঙ্গে মনে মনে তুলনা করেছে। আজ তার মনের মধ্যে যে ঝড় উঠেছে, তার পূর্বাভাসও সে পায়নি কোনদিন। আসলে সন্ধ্যে-বেলাই ঘটনাটার সুরু।

হাজারীবাগের এই 'কেনারি হিল' ফরেষ্ট বাংলোয় রমা আর চিন্ময় গত পাঁচদিন হ'ল এসে পৌঁচেছে, যাবে কাল সকালে। কলকাতার নাগরিক জীবনে হাঁপিয়ে উঠে এখানকার অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হলেও কোন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেনি রমা। চিন্ময়ের কাছে কোন আবেগ প্রকাশের ইচ্ছা তার করে না। তাই তারা এ-ক'দিন নীরবেই বেড়িয়েছে। কবে যে তাদের মধ্যে সব কথা ফুরিয়ে গেছে, তা তারাও জানে না। এখন শুধু নিয়মমত

দাম্পত্যজীবনে বাঁধা থাকা। অথচ অসহ্য নয় কারও কাছে। যেন দু'জনের কাছে দু'জনের প্রত্যাশাও কমে গেছে, তাই স্বাভাবিকভাবে দিন কেটে যাচ্ছে, খাওয়া-শোওয়া-বেড়ান—কোনটাই বা বাদ থাকছে ?

অথচ রমা জানে, দু'জন মানুষের মাঝখানের সুরটি যেন ঠিক বাজছে না। চিন্ময় অবশ্য এ নিয়ে মাথাও ঘামায় না। তার কাছে এ ছাড়া দাম্পত্য-জীবনে আর কি থাকতে পারে ? কোন মতানৈক্য নেই, কোন বিরোধ নেই, স্বচ্ছলতা আছে, শান্তিও।

কিন্তু রমার কাছে এ জীবন প্রায়ই দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। কি যে মুক্তি, তা সে জানে না, অথচ একটা ভারী ব্যথা তাকে অহরহ পীড়িত করছে, রমার নিজের কাছেই তা খুব পরিষ্কার নয় বোধহয়। সে নিজেও বুঝতে পারে না, যেন মৃতব্যক্তি বহনের মত এই অদ্ভুত বোঝা সে নীরবে প্রতিনিয়ত বহন করে চলছে।

কিন্তু এসব তো গা-সহা হ'য়ে গেছে, সব কিছু সে মেনে নিয়েছিল। বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ করার ইচ্ছাও তার জাগে নি বা 'নোরার' মত 'পুতুলের সংসার' ফেলে চলে যাবার কথাও তার মাথায় আসে নি। অন্তত আজ অবধি তার ছিল না।

কিন্তু আজকের সন্ধ্যা।

কোথায় ছিল এই সব ? সমস্ত প্রকৃতি যেন অনেকদিন অপেক্ষা ক'রে ছিল, আজ সন্ধ্যার বিরাট ঝড়ে তার সব উড়িয়ে ভাসিয়ে-ছুটিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তৈরী হয়েছিল। অথচ ঝড়ের কোন পূর্বাভাসও সে পায় নি।

সন্ধ্যাবেলা প্রত্যাহের বেড়ান শেষ করে ওরা দু'জনে সবেমাত্র এসে বসেছে বাইরের ঢাকা বারান্দায়, আর একবার চা-পর্ব শেষ করার জন্য। চিন্ময় অনেক কথাই বলে যাচ্ছিল তার স্বভাবমত, আর চা ঢালতে ঢালতে আপন মনে ভেবেই চলেছিল রমা। গাড়ী থামার আওয়াজে দু'জনেই তাকাল নীচের বাবুর্চিখানার দিকে।

সন্ধ্যার ম্লান আলোয় ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। তবু যে ছায়ামূর্তির

মত আস্তে আস্তে ওপরে উঠে আসতে লাগল, তাকে দেখে বিস্ময়ে হতবাক না হয়ে পারল না রমা।

হ্যাঁ, অরুণই বটে।

কিন্তু একা নয় সঙ্গে সুচিত্রা। বহুদিনের জানা যে নাম অরুণের সঙ্গে জড়িত। অরুণের দীর্ঘ একহারা দেহ ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন অথচ তার সঙ্গিনীর গতি চাঞ্চল্যে ভরা। চোখের কালো চশমা তখনও সে খোলে নি। মাথায় স্কার্ফও। একহাতে হাতব্যাগ অন্য কাঁধে লম্বা স্ট্র্যাপে ঝোলান ফ্লাস্ক।

আবার কে এল জালাতে, দিব্যি নিরিবিলি ছিলাম শান্তিতে।

চিন্ময় ওদিকে একবার দেখে বলল।

হ্যাঁ, 'কবরের শান্তি'।...মনে মনে ভাবল রমা, তবে কোন উত্তর দিল না।

বাঙ্গালী নাকি? ভদ্রমহিলাকে দেখে তো তাই মনে হয়। যা বড় সিঁদুরের টিপের ঘটা। গেল, নিজেদের মনে থাকাটা মাটি হল। ওর কথায় উত্তর দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে রমা।

একটু পরেই যখন বেরিয়ে এল রমা, তখন লাল কাজকরা শাল তার গায়ে জড়ান। বেরিয়েই একেবারে মুখোমুখি অরুণের।

রমা।

অরুণ।

চেন না-কি তোমরা দু'জনে দু'জনকে?

বিস্মিত চিন্ময় প্রশ্ন করল।

বাঃ চিনি মানে। আমরা—

অরুণের দৃষ্টি তখনও রমার দিকে। রমাও অরুণের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। ওর সমস্ত পৃথিবী যেন দুলে উঠল। এখানে এভাবে অরুণের সঙ্গে দেখা, এতদিন পরে?

ব্যাপার কি, হঠাৎ সব পাথর হয়ে গেল যে?

চিন্ময়ের গলার শ্লেষ অস্পষ্ট থাকল না।—এস আলাপ করিয়ে দিই। অরুণ সেন—আর আমার স্বামী চিন্ময় বোস।

অরুণ হাতজোড় করে নমস্কার করল। চিন্ময় হাত কপালে ঠেকাল।

তোমাদেরও আলাপ করিয়ে দিই। -রমা আমার বাল্যকালের বন্ধু আর সুচিত্রা।•

তোমার স্ত্রী তো!

বলতে পার।

এ আবার কি? বলতে পার মানে?

মানে...যাক্‌গে। চিত্রা, মহেন্দ্রকে বল তাড়াতাড়ি সরঞ্জাম নিয়ে আসুক, এমন সন্ধ্যাটা ফাঁকি দিয়ে চলে না যায়।

বলছি, একটু হাত-পা ছড়াও, আমি আসছি।

ঘরের মধ্যে চলে গেল সুচিত্রা।

কিসের সরঞ্জাম?

চিন্ময় অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল। বাঃ, প্রথম পরিচয়, সেলিব্রেট করতে হবে না? আচ্ছা মহেন্দ্র গোছগাছ করুক, আমিও একটু ভদ্রগোছ হ'য়ে আসি।

অরুণও ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। আর কিছুক্ষণ পরেই ট্রের ওপর একটা স্কচের বোতল, সোডা, আর চারটে গ্লাস সাজিয়ে মহেন্দ্র বেরিয়ে এল।

চিন্ময় তো রীতিমত অবাক।

ব্যাপার কি? ভদ্রলোক তো ওভার স্মার্টনেস দেখাতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তোমরা তো বেশ চেন দেখছি পরস্পরকে, অথচ কোনদিন তো বলনি এঁদের কথা? অবশ্য কি-ই বা বল।

ও: বলনি বুঝি? আমাদের প্রতিবেশী ছিল ওরা।

ও একেবারে বাল্য প্রণয়?

বলতে পার।

বলতে পার আবার কি? এত ঘনিষ্ঠ দু'জন অথচ কোনদিন এর নামও তো মুখে আন নি।

আমার সব পরিচিতদের নাম কি তোমায় বলেছি?

জানি না, তবে বলা উচিত ছিল।

কেন?

বাঃ স্বামীর কাছে কোন কিছু লুকোনর প্রশ্নই উঠতে পারে না।

লুকোন ?

ম্লান হাসল রমা।

তা নয়তো কি ?

লুকোব কেন ? তোমার অবকাশ কোথায় ?

কিসের অবকাশ ?

আমার কথা শোনবার।

বাঃ এর জন্য আমার কারখানা ছুটি দিয়ে দিনক্ষণ দেখে বসে অনুরোধ করতে হবে নাকি যে বল এবার তোমার সব প্রণয় কাহিনী।

প্রণয় কাহিনী ? স্ত্রী-পুরুষে প্রণয় ছাড়া বুঝি আর কিছু হ'তে পারে না ? অরুণ আমার বন্ধু।

আর আমি ? বোধহয় তোমার জন্মশত্রু।

বাঃ। আমি একটা মানুষই তো, নানাজনের সঙ্গে নানা সম্বন্ধে জড়িত আছি। কারও মেয়ে, কারও বোন, কারও স্ত্রী। বিভিন্ন রোল বলতে পারে।

হ্যাঁ ওর কাছে ক্রীম রোল, আমার কাছে বীফ্ রোল তাই না ? ফলে আমার কাছে নিষিদ্ধ তুমি।

বাবা, এতও জান তুমি।

হাসল রমা।

হাসির কিছু নয়। আই মীন্ ইট।

পাগলাম ক'র না।......

পাগলাম কিসের ?

আচ্ছা আচ্ছা, ওরা আসছে চুপ কর।

অরুণ আর সুচিত্রা দু'জনেই বেশ যেন ঘষে-মেজে নিয়েছে একটু। সুচিত্রার ফর্সা রং-এ হালকা হলদে রং-এর কোটা শাড়ী ভারী সুন্দর মানিয়েছে। খোলা শ্যাম্পু করা চুল কোমর অবধি ছেড়ে দিয়েছে, কানের পাশে মস্ত এক হলদে ফুল। বড় করে সিঁদুরের কোঁটা আর সিঁথি ভর্তি সিঁদুর।

রীতিমত মুগ্ধ হল রমা। একটা ঈর্ষার যন্ত্রণাও যেন অনুভব করল। দু'টি পুরুষের সামনে দুই নারী, একটি অতি মনোহারিণী। হঠাৎ রমার মনে

হল ও নিজেও একটু সাজগোজ করে প্রসাধন করলে ভাল করত। সে ইচ্ছা তার সাত বছরে একবারও হয় নি।

বউ তোমার খুব সুন্দর হয়েছে অরুণ।

তাই নাকি। এতদিন লক্ষ্য করিনি তো।

সুচিত্রার দিকে একবার তাকিয়ে সস্নেহে হাসল অরুণ। হঠাৎ সলজ্জ আনন্দে লাল হয়ে গেল সুচিত্রা আর রমার মনে হ'ল এমনিভাবে প্রেমিকের মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে লজ্জা পেতে ওরও বোধহয় ভাল লাগে।

আসুন, বসা যাক। যদিও আপনার সঙ্গে আগে আলাপ নেই. তবু রমার বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র পাওয়ার পর থেকে আপনাকে চিনি।

কি রকম ?

অর্থাৎ রমাকে জানি তো। ও যাকে নিয়ে সুখী হয়েছে, তাকে খানিকটা আন্দাজ করে নিয়েছিলাম। এখন মিলিয়ে নিলাম।

এখন খুব হতাশ হলেন তো।

মোটেই নয়, রমাকে সুখী করা সহজ কথা নয়। আপনি সাকসেসফুল।

সাকসেস! মাই ফুট......

খুব আস্তে প্রায় অনুচ্চারিতভাবে কথাগুলো বলল চিন্ময়, তবু রমা শুনতে পেল আর বিবর্ণ হ'য়ে গেল ওর মুখ।

ততক্ষণে মহেন্দ্র সোডার বোতল খুলে ফেলেছে। চারটে গ্লাসে মেপে খানিকটা করে হুইস্কি ঢেলে, তাতে সোডা মেশাতে মেশাতে বলল চিন্ময়— আপনাদের না জিজ্ঞেস করেই আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। নিশ্চয়ই আপত্তি নেই। তা ছাড়া এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায় আর কিভাবে প্রথম পরিচয় সেলিব্রেট করা যায়।

অরুণ গ্লাস এগিয়ে দিল রমার দিকে।

ধন্যবাদ আমি খাই না।

একটু সঙ্গদান কর। সুচিত্রা তোমার, নাও।

সুচিত্রা হাত বাড়িয়ে গ্লাস নিল। রমা নিজেকে আরও এলিয়ে ছেড়ে দিল চেয়ারে।

নাও রমা।

প্লিজ অনুরোধ ক'র না। এটা পারব না।

মহা মুস্কিল তো। আপনি আসুন। আপনার চলে তো?

ধন্যবাদ। চিন্ময় গ্লাস নিল।

দল ছাড়া হচ্ছেন কবে?

বারে, ওতো রোজই খায়, আমি তো এই রকম বসে বসেই সঙ্গ দি। আমাকে তুমি কখনও দেখেছ নাকি খেতে?

না, তা দেখিনি। তবে এখন তো আরও ম্যাচিওর হয়েছে।

ও সব ম্যাচিওরিটির পরীক্ষা বুঝি এইতে?

না, না। অদ্ভুত লাগে অন্য সব বিষয়ে এত তোমার রেভোলিউশানারি আইডিয়া আর হঠাৎ এ—ব্যাপারে।

যদিও এটা কিছু রেভোলিউশানারি ব্যাপার নয়। তবুও ওসব কিছুই ভাবি না। আমার ভাল লাগে না।

ওর তো কিছুই ভাল লাগে না। চিন্ময় গম্ভীর মুখে বলল।

চিত্রার আবার সব কিছু ভাল লাগে না? অবশ্য যদি সেটা আমার পছন্দমত হয়, কি বল চিত্রা?

গভীর দৃষ্টিতে তাকাল অরুণ সুচিত্রার দিকে। কোন কথা না বলে অরুণের চেয়ারের কাছে সরে এসে ওর একটা হাত নিজের হাতে রাখল সুচিত্রা আর রমার ভেতরটা যেন জ্বালা করে উঠল। হিংসা নয়, বেদনায়। ও বোধহয় কোনদিন কারও হাতে হাত রাখার এমন সুখ অনুভব করে নি।

চিন্ময়ের দিকে একবার তাকিয়ে ও দূরের অন্ধকার আকাশে দৃষ্টি মেলে দিল।

ওরা চিয়ার্স করল।

কতক্ষণ কেটে গেছে খেয়াল নেই। মহেন্দ্র ততক্ষণে ট্রানসিসটার রেকর্ড প্লেয়ারে বিলাতী গানের রেকর্ড চাপিয়ে দিয়েছে। ক্রমশ বোতল খালি হয়ে এসেছে। আর চিন্ময়, অরুণ মেতে উঠেছে গল্পে। গান ডুবে গেছে ওদের কথাবার্তার কোলাহলে. সুচিত্রা আরও ঘন হয়ে বসেছে অরুণের কাছে, বার বার কাঁধে মাথা রেখেছে। অরুণের একটা হাত সরেছে সব

সময় সুচিত্রাকে জড়িয়ে রেখেছে, আর তাদের কথাবার্তায় মাঝে মাঝে যোগ দিয়েও রমা যেন দূরের কোন অন্য জগতে থেকে গেছে সব সময়।

রমা একটা গান কর।

কি যে বল।

কেন? আগে তো বেশ ভাল গান করতে।

আর করি না।

একদম না?

না—

সব আগে। বুঝলেন সেন। সবই আগে, বর্তমানে নয়। অন্তত এই সাত বছরে আমি ওকে কোনদিন গান করতে দেখিনি।

চিন্ময় আস্তে আস্তে বলল।

তার গলার স্বর শুধু ভারী নয়, খানিকটা অনুযোগ যেন মেশান।

আশ্চর্য!

অরুণ সুচিত্রার হাতে মৃদু চাপ দিল—

কি আশ্চর্য?

চিন্ময় করুণ হেসে জিজ্ঞেস করল। তারপর একবার রমার দিকে তাকিয়ে বলল—

আশ্চর্য কি আর? ও তো একটা পুতুলের মত। আমার তো মনে হয় ওর মধ্যে কোন জীবনীশক্তি নেই। টু-মাচ টিমিড্।

না—

ভারী গলায় বলল অরুণ।

ও টিমিড্ নয়। কিন্তু নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে জাগাতে পারেনি।

কি বললেন?

প্রায় অনুচ্চারিত কথাগুলো চিন্ময় শুনতে বা বুঝতে পারেনি।

না, কিছু না, চিত্রা, ভাল লাগছে?

সুচিত্রাকে আরও কাছে টানল অরুণ। আর রমার দু'চোখ হঠাৎ জলে ভরে এল। নবকুমার জাগাতে পারেনি। ঠিকই বলেছে অরুণ। কে জাগাবে? কাকে? ভীড় করে এল অনেক কথা। বিয়ের পর কি জীবন

সে আকাঙ্ক্ষা করেছিল, আর কি হল। অথচ বাইরে থেকে কত লোক তাকে হিংসেই করে। এমন স্বামী, এমন সংসার, এত স্বাচ্ছন্দ্য। নিজের মনের ভেতর পর্যন্ত অনুসন্ধান করল রমা, কোথাও কোন দল নেই। একেবারে একা সে। ম্যাথু আর্ণল্ডের কবিতার "উই মিলিয়ন মরটালস্ লিভ এলোন"। সারাজীবনই তো তাকে এমনি সহস্র লোকের মাঝেও একাকিত্বের বোঝা বহন করতে হবে। আজও তাই।

হঠাৎ অরুণের গলা শুনল।

রমা, চিত্রা কিন্তু খুব ভাল গায়, জান?

তাই নাকি? আপনি গান তাহলে।

বাঃ, ওর যত সব বাড়িয়ে বলা।

বাড়িয়ে না, সত্যি। চিত্রার গান আমার খুব ভাল লাগে।

তোমার ভাল লাগে বলেই তো গাই গো। না হলে বুঝি জানি না, যে মোটেই ভাল গাইতে পারি না আমি।

ওরা পরস্পরের দিকে তাকাল কিছুক্ষণ।

অরুণ, কিছু মনে কোর না। তোমাদের কতদিন বিয়ে হয়েছে?

পাঁচ বছর। তবে পাঁচ বছর ঠিক বিয়ে নয়। কোর্টশিপ চলছে বলতে পার।

মানে?

চিন্ময় অবাক হল।

চিত্রার স্বামী ওকে এতদিন ডিভোর্স দেয়নি।

তাহলে তিনি কোথায়।

তিনি আমেরিকায় একজন মার্কিনী মহিলার সঙ্গে আরামে আছেন আজ সাত বছরের ওপর। অথচ ডিভোর্স দেবেন না।

কারণ?

কারণ তিনিই জানেন। তবে আমরা ও সব কেয়ার করি না। আইন মানতে গিয়ে নিজেদের জীবন তো নষ্ট করতে পারি না। আফ্‌টার অল ওয়ান লাইফ টু লীভ।

তাহলেও!

না, এই গতমাসে ডিভোর্স পাওয়া গেছে অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে। বোধহয় ভদ্রলোকের নিজের দরকার তাই মাস কয়েক আগে ছুটে এসেছিলেন নিজে। ওকে গতমাসে মুক্তি দিয়েছেন।

তাহলে তো তোমরা এখন বিবাহিত।

না, আইনত এখনও নয়। এক বছর আরও অপেক্ষা করতে হবে।

বাব্বাঃ! আচ্ছা ফ্যাসাদ তো! কিন্তু এভাবে...যাক...

চিন্ময় কথাটা যেন শেষ করল না।

না না, যাবে কেন? ইম্‌মর‍্যাল বলছেন এই তো? মিঃ বোস, আমার চিত্রার সুখ আমার কাছে সব থেকে বড়। ওকে একা ভাসিয়ে দিয়ে আমি বেঁচে থাকতে পারি না। আমি কি নিজেও কম ধাক্কা সহ্য করছি সমাজে? কিন্তু ওর চোখের জল যে মোছাতে পেরেছি, সেই আমার সব থেকে বড় পুরস্কার।

অরুণের কাঁধে মাথা রেখে চোখ বুজল সুচিত্রা।

গ্লাসটা ঠিক চোখের সামনে ধরে সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে হঠাৎ মোটা গলায় বলল চিন্ময়—

জানি না, এ এমন কি জিনিষ—যার জন্যে আপনারা এত সব রিস্ক নিতে পারেন।

আপনার দুর্ভাগ্য বলব মিঃ বোস!

কিন্তু নো রিস্ক, নো গেন।

হাসল অরুণ, আর ওদের দিকে তাকিয়ে রমার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল।

অবশ্য একেবারে হতাশ হবার মত নয় মিঃ বোস। কাশীতে গিয়ে শিব সাক্ষী করে একটা বিবাহ গোছ করে নিয়েছি। সবই চিত্রার ইচ্ছে। ওর খুব গোঁড়ামী আছে।

গোঁড়ামী নয়, এটা প্রয়োজন।

চিন্ময় বলেই চুপ করে মনে মনে বলল; গোঁড়ামীর তো পরাকাষ্ঠা।

চিত্রা! এবার একটা গান সুরু কর।

কি গান গাইব?

সেটা তোমার ইচ্ছা।

একটু গুন্ গুন্ করে চিত্রা আরম্ভ করল।

'আমি জেনে-শুনে বিষ করেছি পান।'

গানের মধ্যে যোগ দিল অরুণ। তারপর এক সময় রমার দিকে তাকিয়ে বলল—

রমা! তুমিও যোগ দাও।

না—

প্রায় কান্নাভরা গলায় বলল রমা। তারপর হঠাৎ দু'হাতে মুখ ঢেকে মাথা নীচু করল।

একদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল অরুণ। চিন্ময় ততক্ষণে তার গ্লাসে আরও হুইস্কি ঢেলেছে? রমা বুঝতে পারছে মাত্রা ছাড়াচ্ছে চিন্ময়। অবশ্যই যথারীতি এরপর ও ঘুমিয়ে পড়বে। খাওয়া হবে না এই যা। আর রমার কাছে ওর ঘুমই কাম্য। না হলে বড় বিরক্ত করবে শোয়ার পর। তবু এ-সব কোন কথা ভাবতে ভাল লাগছে না, ওর দু'চোখ ভরে এসেছে জলে। না ওকোন বিষপান করেনি, অন্তত এতদিন তাই জানত, কিন্তু আজ এই সন্ধ্যায় এই আলোছায়ার রহস্যময় নেশাধরা বারান্দায় বসে তার হঠাৎ মনে হল, সে বিষপান করতে চায়, সেই চরম অতৃপ্তিতে আকণ্ঠ মগ্ন হয়ে থাকতে চায়, প্রাণ সমর্পণ করতে চায়। কিন্তু কাকে? চিন্ময়কে? আজ যেন স্পষ্ট বুঝতে পারল, সে চিন্ময় নয়। তবে অরুণ? তার বহুদিন আগের ফেলে আসা কলেজ-জীবনের প্রায় ঘনিষ্ঠ হয়ে যাওয়া তার মুগ্ধ ভক্ত অরুণ। না, তাও নয়। এরা কেউ নয়, এমন কি যার সঙ্গে তার প্রথম সম্বন্ধ হয়ে দিনস্থির হয়েও শেষ পর্যন্ত বিয়ে হয়নি, সে-ও না।

কিন্তু শুধু একজন। যাকে জানে না, চেনে না—যার হয়ত অস্তিত্বই নেই, তেমন কেউ। যাকে ভালবাসলে সে দূরে গিয়েও ভুলতে পারবে না। কাছে থেকেও খুঁজে পাবে না, তেমন কারও জন্যে এক মন-কেমন-করা কান্নায় তার হৃদয় ভেঙে পড়তে লাগল।

* * * * *

যখন মুখ তুলল, তখন চিন্ময় তার ঘরে চলে গেছে। শুধু অরুণ সুচিত্রার মাথাটা নিজের বুকের পাশে নিয়ে একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

রমাকে উঠতে দেখে ও সুচিত্রাকে নাড়া দিল—চিত্রা! ওঠ, ঘরে যাও, আমি আসছি।

তুমিও এস, দেরী ক'র না।

না না, দেরী করব না, যাও। রমা বস, একটু কথা আছে।

কোন কথা না বলে রমা বসে থাকল।

রমা!

কি?

কাঁদছিলে কেন?

দুঃখিত।

নিজের নাক-চোখ মুছল রমা।

দুঃখিত হবার মত কিছু নেই। তুমি তেমনিই আছ।

না, অনেক—অনেক বদলে গেছি আমি।

কিছুমাত্র না। তেমনি ইমোশনাল, কিন্তু কেন রমা? চিন্ময়বাবু তো—

খুব ভাল লোক। আমার মন বুঝি এমনি খারাপ হতে পারে না?

পারে। তবে আজ বোধহয় কথাটা ঠিক নয়। আমার মনটা'ও তুমি দুর্বল করে দিলে রমা।

কেন?

কেন জান না?

না। অবশ্য জানতে চাইও না।

শোন রমা, তোমাকে আমি ভুলিনি। ভুলতে পারি না, এক সময় তুমি আমার কতটা ছিলে।

কেন বানিয়ে বানিয়ে বলছ অরুণ? চিত্রাকে তুমি কতটা ভালবাস তা তো জানতে আমার বাকী নেই।

ভালবাসি, হয়ত হবে। হয়ত ভালবাসাটা আমার স্বভাব বলে।

ভালই তো।

না! শুধু তাই নয়। যাকে আত্মহত্যার হাত থেকে বাঁচিয়ে নতুন জীবন দিয়েছি তাকে রক্ষা করাও যে আমার কর্তব্য রমা।

কোন উত্তর দিল না রমা।

আমি তো জানতাম তুমি সুখেই আছ।

আছিই তো।

না, সেটা সে কত বড় মিথ্যে, আজ আমি তা বুঝতে পারলাম।

বাঃ হঠাৎ ইমোশনাল হয়ে কেঁদেছি বলে ভেবে নিলে সারাজীবন দুঃখেই কাটছে আমার?

না হলেই সুখী হব। কিন্তু যাক—,

অরুণ! একটা কথার জবাব দেবে?

বল।

তুমি সুচিত্রাকে খুব ভালবাসো না!

খুব কাকে বলে জানি না, তবে ভালবাসি। ও আমাকে মস্ত বড় যন্ত্রণার হাত থেকে বাঁচিয়েছিল।

যন্ত্রণা?

হ্যাঁ, অপমানের যন্ত্রণা। তোমার বিয়ে হয়ে যাবার পর সকলের চোখে যখন অবজ্ঞা আর উপহাসের পাত্র হলাম, তখন সুচিত্রাই আমাকে সব অপমানের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। আমাকে ও আশ্রয় দিয়েছিল। অথচ তখন ও নিজেই অসহ্য অপমানে দিন কাটাচ্ছে। ওর স্বামী ওকে শুধু মারধোর করেই ক্ষান্ত থাকেনি। ওর গয়নাগাটি সর্বস্ব নিয়ে আমেরিকায় পালিয়েছে ওকে একা ফেলে। কি নিরাশ্রয় অবস্থা ওর। আবার আমাকে ও বুকে টেনে না নিলে আমারই বা কোথায় আশ্রয় ছিল বল?

অরুণ তুমি জান না, তোমাকে ও আশ্রয় দিয়ে নিজেই আশ্রয় পেয়েছিল।

হতে পারে। কিন্তু আমার সে সময়ে বড় প্রয়োজন ছিল ভালবাসার, না হলে আমিও বোধহয় বাঁচতাম না। অথচ তখন আমি একেবারে যাকে

বলে কপর্দকশূন্য। সব খরচ ও বহন করেছে। আজ অবশ্য আমি বড় চাকুরে? কিন্তু তখন?

জানি না অরুণ, কিন্তু তোমাদের দেখে আজ মনে হ'ল তোমরা পরস্পরকে ভালবেসে কত সুখী। একে অন্যকে পূরণ করছ। কিন্তু আমি কত একা।

আমারও সেটা মনে হয়েছে রমা। তুমি বোধহয় খুব একা, না?

ভীষণ একা অরুণ, ভীষণ একা। আমার এ নিঃসঙ্গতা যে কত বড় তা তোমাকে বোঝাতে পারব না। কিন্তু এসব তো ভুলেই ছিলাম। এ জগৎকে তো একেবারে অতীত করে দিয়েছি, শুধু যদি তোমাদের না দেখতাম। কেন তোমরা এলে?

দু'হাতে মুখ ঢাকল রমা।

অনেকক্ষণ পরে যেন বহুদূর থেকে ডাকল অরুণ।

রমা!

কি?

তোমার স্বামীকে তুমি ভালবাস না?

এতদিন জানতাম ভালবাসি। এটাই সহজ সাধারণ ভালবাসা। কিন্তু আজ বুঝছি হয়ত আমাদের ভেতর ভালবাসা জিনিষটাই জন্মায়নি। আমার ভাবতে বুকের ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে যে, চিন্ময়কে আমি ঠকিয়েছি।

না ঠকাওনি। তাছাড়া ইট্ ইজ নেভার টু লেট। ওকে সমস্ত আবেগ দিয়ে ভালবাস রমা, দেখবে এই অসহ্য যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবে। রমা, জগতে ভালবেসে নিজেকে দিয়ে দেওয়ার থেকে বড় আনন্দ, বড় মুক্তি আর নেই।

জানি অরুণ, কিন্তু মুক্তি তো ইচ্ছা করলেই পাওয়া যায় না।

আমার দিকে চেয়ে দেখ রমা! পারবে না আবার চিন্ময়কে নতুন করে ভালবাসতে?

জানি না।

না, জানি না নয়। চিন্ময় খুব ভাল লোক।

আমি তো বলিনি খারাপ। কিন্তু বলা অনুচিত, তবু তোমার কাছে কিছু গোপন রাখব না। ও এত স্থূল, আমরা যেন দু'জনে দু' জগতের

লোক। কি করে একাত্ম হব অরুণ? এতদিন তো সহ্যই করেছি, চিরদিনই করব, কিন্তু নিজের কাছে তো নিজের ফাঁকি ধরা পড়ে যাবে।

কোন ফাঁকি নয়। তোমার নিজের হাতে সব। রমা, সুখ পায়ে হেঁটে আসে না, তাকে কুড়িয়ে নিতে হয়।

কোন কথা না বলে রমা দূরে তাকিয়ে রইল। দূরের অন্ধকার আকাশে তখন মিট মিট করে জ্বলছে অসংখ্য তারা।

তোমরা সব খাবে না? চল, সব প্রস্তুত হয়ে গেছে।

সুচিত্রা খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল, হাতে একটুকরো মাছভাজা। অরুণের মুখে একটুকরো ভেঙে দিয়ে রমাকে জিজ্ঞেস করল—আপনাকে দেব?

না—

আমাকেই বা হঠাৎ এখন মাছভাজা দিলে কেন চিত্রা?

বারে, ইঞ্জিনে কয়লা না দিলে ইঞ্জিন চলবে কি করে?

সত্যি চিত্রা, তুমি না থাকলে বাঁচতাম কি করে তাই ভাবি।

ওদের দিকে একবার অপলক দৃষ্টিতে তাকাল রমা। তারপর উঠে নিজের ঘরে দ্রুতপায়ে ঢুকে গেল।

তারপর তো যথারীতি ঘুমিয়েই পড়েছিল ওরা। কিন্তু রমার ঘুম বার বার ভেঙে যাচ্ছিল। ওঘর থেকে শব্দমাত্রকে ওদের প্রেমালাপ বলে মনে করে অকারণে যন্ত্রণা পেয়েছে। ঘুমের ভেতর রমার বুকের ভেতর যন্ত্রণায় মুচড়ে উঠেছে বার বার।

জানলা দিয়ে দূরের আকাশে তাকাল রমা। একটা তারা তীরবেগে নীচে নেমে চলেছে কোথায় কে জানে। এই বিরাট মহামণ্ডলে তার কোথায় জায়গা আছে কে তা জানে। কিন্তু রমার এ স্থির বিশ্বাস কিছুতেই নষ্ট হয়

না, আবার নতুন করেই সুরু হয় তার···শুধুমাত্র রূপান্তর ঘটে। নিজের মন কি নিজেই জানে রমা? ঘুমন্ত চিন্ময়ের দিকে একবার দেখে নিয়ে আস্তে আস্তে তার পাশে এসে শুয়ে পড়ল রমা।

একটু দ্বিধা করে চিন্ময়ের বুক থেকে পাশবালিশটা সরিয়ে ওর বিরাট লোমশ বুকে নিজের মাথাটা গুঁজে দিল।

হঠাৎ আলো

যাবার আগের দিনই ওদের বাড়ীতে সকলের সঙ্গে দেখা হোল।

বাইরে খুব বৃষ্টি পড়ছিল।

সন্ধ্যা থেকেই সেই যে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে তার যেন শেষ নেই।

—সকলে এখানেই খাওয়া-দাওয়া করা যাক।—অশোক বলল।

—ড্রাইভারকে পাঠিয়ে দাও, কিছু চাইনীজ নিয়ে আসুক, আর লুচি ভাজুক, মাংস তো আছেই কিছু। কৃষ্ণা যোগদিল।

ওরা এমনিই।

স্বামী-স্ত্রী দুজনেই যেন এক সুরে বাঁধা। যখন যে কোন সময়ে সকলের অবারিত দ্বার ওদের কাছে। সুতরাং সে রাত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। রাত দেড়টা পর্যন্ত চলল খাওয়া, গান আর গল্প।

এর মধ্যেই রণেন ঘুরে এসেছে একবার অর্ডন্যান্স ক্লাবের সামনে থেকে ঐ চাইনীজ দোকানটার ফ্রায়েড চিকেন আনতে। কৃষ্ণার ভারী প্রিয়। সবাই তো এমনি। যেহেতু এই আনন্দ মুখর পরিবেশে সকলেই খানিকটা দক্ষিণের হাওয়া পায়। সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ে নাচতে চাও তো চলে এসো এখানে। সকলের আমন্ত্রণ, জগতে আনন্দ যজ্ঞের দরজা খোলা।—সকলের জন্য। যেন সব নদী এসে মিশেছে সাগরে—এমনি কলরোল, এমনি আনন্দ।

ততক্ষণে রাস্তায় জল জমে গেছে এক হাঁটু। নীচের তলায় গাড়ী গ্যারাজ করবার জায়গায় জল ঢুকেছে। কে আবার এত রাত্রে জল ঠেলে ঠেলে গাড়ীগুলো বার করে!

অতএব বাড়ী ফেরা নয়, আজ রাত্রের মত এখানেই।

তাহলে ঘুম? ঘুমের কি হবে?

...আজ আর ঘুম নয়। সারারাত গল্প আর গান। ড্রইং রুমের বিরাট কার্পেটের ওপর বসে ঢালাও আড্ডা আর গান। কারও ইচ্ছে হলে গড়িয়ে নাও। আমি কিন্তু আজ একেবারে ঘুমোব না।...গ্লাসে সকলের জন্য হুমস্কি ঢাল ত, অশোক বলল।

—বাঃ টায়ার্ড লাগবে না তোমার? পারও তুমি।—বিকাশ অবাক হল। বিকাশ অশোকের ভগ্নীপতি।

—লাগলেই বা। আজ ঘুম নয়, কাউকে ঘুমোতে দেব না। ভাই, যাচ্ছি ছুটিতে, ওখানে গিয়ে তো খালি ঘুমোবই। কেবল ঘুম আর বিশ্রাম। বুঝলে না, ছুটিতে যাচ্ছি তো। নাও!

ওরা চীয়ার্স করে গ্লাসে চুমুক দিল। এমনিই হয়।

অন্ততঃ সপ্তাহে একদিন। বিশেষ করে শনিবার রাত্রে। পরের দিন রবিবার, বেলায় উঠলেই বা ক্ষতি কি? তাই সকলে জড় হয় অশোকদের বাড়ী। শুধু বন্ধুরা নয়, ভাই-বোন সকলে। ওদের বাড়ী যে আনন্দ-নিকেতন। খাদ্য আর পানীয়ের অভাব হয় না। অতিথিপরায়ণ এই দম্পতি তো আছেই, তা'ছাড়া বন্ধু-বান্ধব যে যখন যা পারে, একজন না পারে, এস 'পুল' কর, সকলে মিলে ব্যবস্থা কর। কিন্তু আনন্দ করা চাই। অশোকের এক কথা "ওয়ান লাইফ্ টু লীভ।" সুতরাং 'হুকোমুখো হ্যাংলা' হয়ে থাকার অর্থ কি? আনন্দ কর। আর তাই তাদের এই আনন্দ-মেলায় সকলের নিমন্ত্রণ।

ভোরবেলাকার প্লেন।

আবার চলল পাঁচখানা গাড়ী করে সকলে ওদের এয়ার পোর্টে পৌঁছে দিতে দমদম পর্যন্ত। প্লেন না ছাড়া পর্যন্ত কারও ছাড়া আছে নাকি? আবার এয়ার পোর্টের ডাইনিং রুমে বসে ওমলেট সহযোগে কফি পান।

মুহূর্তও যেন ছাড়বে না ওরা।

বিশেষ করে এ ক'দিন যেন আরও।

সকাল সাড়ে সাতটায় বেরিয়ে গিয়ে অশোক ফেরে সন্ধ্যা সাতটায় রোজ। তাই শনিবার-রবিবার ছাড়া ও কাজ থেকে ছাড়া পায় কখন? এখন ছুটি নেবার ফলে যেন অন্য জীবনের সন্ধান পেয়েছে। মেতে উঠেছে আনন্দের নেশায়। কাজের ব্যাপারে গত দু'তিন বছর খুব অশান্তিতে ছিল। নানা ঝামেলাতে পাগল হয়ে যাচ্ছিল। সবেমাত্র সব কিছু শেষ হয়ে ও স্থিতি হয়ে বসতে পেরেছে, তাই একটু বিশ্রাম নিতে চায়। ছুটির মধ্যে দিয়ে ও পুনর্জীবন পেতে চায় যেন।

প্লেন ছাড়বার সময় হয়ে এল।

—আচ্ছা আবার দেখা হবে।

সকলের সঙ্গে সম্ভাষণ করল ওরা।

—ছোড়দি, গিয়েই তোর বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করব। ফোন নাম্বার-গুলো নিয়েছ তো কৃষ্ণা? সেই মজার নামটা কি যেন?

—হড়কো বাহাদুর।

হেসে উঠল অশোক।

—লোকটাও খুব মজার, আর ইন্‌টারেস্টিং। ছোড়দি যোগ দিল।

আচ্ছা চলি। রুনু সাবধানে থাকবি।

রুনু অশোকের সব থেকে ছোট বোন, বড় প্রিয় অশোক আর কৃষ্ণার।

তোরাও সাবধানে চলাফেরা করবি।

ছোড়দি আবার মনে করিয়ে দিল। সময়টা তো ভাল না। এই বরষায় কেন যে যাওয়া! তাড়াতাড়ি ফিরিস। তোরা ছাড়া কলকাতা অন্ধকার রে।

—আরে ভাবিস না। সাতদিনের ভেতরই ফিরছি। বুঝলি না। ছুটিটা ডিফারেন্ট ফেজে ভাগ ক'রে নিয়েছি। সব আমার প্ল্যানড্‌। ফার্স্ট ফেজ তো কমপ্লিট হল কলকাতায় এক সপ্তাহ, সেকেণ্ড ফেজ এক সপ্তাহ কাঠমুণ্ডুতে। এর পরের ফেজ আবার কলকাতায়, নানা জায়গায় আউটিং-এ আর কলকাতায় আড্‌ডা। আই এম ইন হলিডে মুড বাট অল প্ল্যানড্‌। ফিরে এসে কি করব তার পুরো প্ল্যান করা আছে। আচ্ছা চলি।

কৃষ্ণাকে জড়িয়ে ধরে আদর করল ছোড়দি, রুনু আর অন্য মেয়েরা। সুন্দরী কৃষ্ণা সকলের প্রিয়। হাত নেড়ে প্লেনের দিকে এগিয়ে গেল ওরা।

ওদের অপসৃয়মান দীর্ঘ দেহ আস্তে আস্তে দূরে চলে গেল।

কাঠমাণ্ডুতে গিয়ে ওরা যেন নতুন জীবন পেল। ওবেরয়ের হোটেল সোয়ালতিতে ওরা সুন্দর একটা ঘর নিয়েছে। বিয়ের সাত বছর বাদে আবার যেন নতুন করে পেল ওরা পরস্পরকে। এত আনন্দ, এত খুশীর জিনিষ যে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে, তা বুঝি ওরা আগে বুঝতে পারে নি। কলকাতার আড্ডা, বেড়ান—এ সবের আনন্দ থেকে এ আনন্দ আলাদা। সেখানে কাজ আর কাজ। তার মধ্যে অবসর পাওয়া যায় কতটুকু?

কিন্তু এখানে?

সদাই আনন্দ, সদাই অবসর।

সরল নেপালী লোকেদের সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প করে ওরা। অশোক বরাবরই এমনি। সকলের সঙ্গে বন্ধুর মত মিশে তাকে জানতে চাওয়া, তাদের জীবনযাত্রার আস্বাদ পাওয়া ওর স্বভাব। এখানেও তাই ও মেতে ওঠে নতুন নতুন লোকেদের সঙ্গ পাওয়ার লোভে। ধ'রে ধ'রে ওদের সঙ্গে ছবি তোলে ওরা। গ্রামের ভেতরে গিয়ে তাদের বাড়ীতে নেপালী খানা খেয়ে আসে, টিপিক্যাল নেপালী জিনিষে সুটকেশ ভর্ত্তি করে। নিউ রোডের কোন দোকান ঘুরতে আর বাকী নেই। অশোকের মনে হয় সবই কেনে সকলের জন্য।

দ্যাখ এত বিদেশী জিনিষের আমদানি এখানে অথচ টাকাটা এত লিমিটেড।

কিনোনা এত, কি দরকার?

না না কতজনকে দেওয়ার আছে ভেবেছ? রুনুর জন্য ভাল নাইটী একটা—নিতেই হবে। আর ঐ নকল আই ল্যাশ টা।

—এত জিনিষ নিয়ে প্লেনে যাবে কি ক'রে?—কৃষ্ণা অনুযোগ করে।

যাব ঠিকই। এক্সট্রা ফেয়ার দেব। উপায় কি? কি জান, কেনার নেশায় পেয়ে গেছে। তাও তো তোমার 'বকুটা' এখনও কেনা হয় নি।

—দরকার নেই।

—আমার আছে কৃষ্ণা। তোমাকে ভারী ভাল মানাবে। আমাদের এই ক'টা দিনকে ধরে নিয়ে যেতে চাই কলকাতায়। মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে পৃথিবীকে আমি এত ভালবাসি, এত এর থেকে নিতে চাই যে বলার নয়। কবির ভাষায় বলতে পার "মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।"

—হঠাৎ মরার কথা আসছে কেন? ভাল লাগে না।—কৃষ্ণা গম্ভীর হল।

ওকে কাছে টানল অশোক।

—আহা! এখনই মরার কথা বলছি না। কিন্তু আমার যেন কোনদিনই মরতে ইচ্ছে করছে না।

হবেও না, আমার সব আয়ু আমি তোমাকে দিয়ে দিলাম।

—ও তাহলে চাই না। তুমি-আমি দুজনে অনন্তকাল বেঁচে থাকব।

আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি
যুগল প্রেমের স্রোতে
অনাদি কালের হৃদয় উৎস হ'তে।

—বাবা! হঠাৎ যে ভীষণ রোমান্টিক হয়ে উঠলে? কৃষ্ণা হেসে ফেলল।

—বা রে, আমি বুঝি রোমান্টিক নই? একেবারে ঠাসা গদ্য?

—না গো! তুমি মূর্তিমান কবিতা।

ওর কাছে ঘন হ'য়ে সরে আসল কৃষ্ণা। তারপর হাত ধরাধরি করে ওরা পথে পথে হেঁটে চলল। সেই যেমন শিলং-এ হনিমুন করতে গিয়ে ওরা হেঁটে বেড়াত সাত বছর আগে!

—কৃষ্ণা!

—বল!

—আচ্ছা ভারী অদ্ভুত লাগে, না?

কি অদ্ভুত?

—এই ক'দিন আগেও আমরা কলকাতায় বেশ একটা সফিস্টিকেটেড লাইফ লীড্ করেছি, এখন একেবারে প্রকৃতির কোলে, আবার পরশুই ফিরে যাব সেই আমাদের চিরপরিচিত জীবনে।

—ভালই তো এই বৈচিত্র্য।

—ভাল তো নিশ্চয়ই। এই রিলাক্সেশনের দরকার তো অবশ্যই আছে। মাঝে মাঝে এরকম প্রয়োজন। মনে হচ্ছে দশ বছর বয়স কমে গেছে।

—কলকাতায় বুঝি বুড়ো থাক!

—না না। কলকাতা তো এভার ইয়ং। কলকাতা তো আমার জীবন। জান, বিলেতে থাকতে কলকাতার পথঘাটের জন্য পর্যন্ত আমার বুকের ভেতরটা টন্‌টন্ করত। কিন্তু মাঝে মাঝে এইভাবে ঐ ব্যস্ত জগৎ থেকে সরে এসে প্রকৃতির মধ্যে থাকতে ইচ্ছে করে। তাই না? বল! তাছাড়া এখানে এলে তোমাকেও কত কাছে পাই বল তো? একেবারে আমার!

—কেন, ওখানেও তো আমি তোমারই।

—কিন্তু লোকের ভীড়ে তোমাকে যে আমি হারিয়ে ফেলি কৃষ্ণা।

—আহা, তোমারই তো ব্যস্ততার শেষ নেই। সেই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তোমার কোন পাত্তা মেলে? আমার কত একা লাগে!

—কি করব কৃষ্ণা! কর্তব্য।

—কিসের কর্তব্য?

—বাঃ পুরুষ হয়েছি, কর্তব্য নেই? স্ত্রীকে ভাল রাখবার, তার সুখ-সুবিধে দেখবার। তাছাড়া জান—জীবনের প্রথমদিকে সব ব্যবস্থা করে নিলে শেষ জীবনে নিশ্চিন্ত হ'তে পারি।

—হ্যাঁ, ঐ করে জীবনটাই শেষ হয়ে যাক্।

—কি করব কৃষ্ণা! তোমার জন্যই তো আমার ভাবনা।

—কিসের?

—বাঃ, হঠাৎ যদি আমার কিছু হয়, তখন তোমায় কে দেখবে? আমি ছাড়া তোমার কে আছে বল?

—সত্যিই তো, তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই।

অশোকের কাছে সরে এল কৃষ্ণা।

—এই।

—কি ?

…ছুটিটা আরো বাড়িয়ে দাও না।

…আছে তো এখনও হাতে সময়।

…জান, এই ছুটি ছাড়া তোমায় কবে কাছে পেয়েছি আমি ? খালি তো তোমার কাজ।

…তাই তো এই রকম প্ল্যান করে নিয়েছি ছুটিটা কাটাবার, যাতে পরিপূর্ণ উপভোগ করতে পারি। ভাল করিনি ?

…খুব ভাল করেছ।

অশোকের কাঁধে মাথা রাখল কৃষ্ণা। সব দেখা হয়ে গেছে, পশুপতিনাথ তো আগেই। পশুপতির মন্দিরের সামনেই বৃষটির সোনায় মোড়া গা আর মন্দিরের দরজাগুলোর সোনারূপায় মোড়া চেহারা দেখে কৃষ্ণাও ঝলমলিয়ে উঠল। অশোক ঠাট্টা করতে যাচ্ছিল এ সব সোনারূপো কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করে, কিন্তু কৃষ্ণাও যেন ভক্তিরসে ডুবে গেল। রামচন্দ্র মন্দির, লবকুশ মন্দির সবই যেন নদী বাগমতীর সংগে পাল্লা দিয়ে অদৃষ্ট অথচ অবশ্যম্ভাবী আর একটি স্রোতস্বিনীকে সঞ্জীবিত করছে, সে স্রোতস্বিনী হৃদয় থেকে উৎসারিত।

দেখা হয়ে গেল পত্তন, পুরানো রাজধানী, যাঁর আগে নাম ছিল ললিতপুর। শহর কাঠমাণ্ডুর গা ঘেঁষেই একেবারে।

কলকাতায় ফেরার আগের দিন রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর ওরা হোটেলের সামনের বাগানে বেরিয়ে এল।

শুক্লপক্ষ। চাঁদের আলায় পৃথিবী যেন ভেসে যাচ্ছে। দূরের গাছগুলো স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে। হাতে হাত দিয়ে ওরা অনেকক্ষণ বসে থাকল।

…এই।

অশোক ওকে নাড়া দিল।

উঁ !

…চল ভেতরে, ঠাণ্ডা লাগতে পারে।

…আমার হঠাৎ মনে হচ্ছে কৃষ্ণা, জীবনে চাকরি, প্রমোশন, ক্লিক, হট্টগোল, সব থাকা সত্ত্বেও বেঁচে থাকবার, শুধু আমরা দু'জনে একান্তভাবে

বেঁচে থাকবারই একটা বিরাট অর্থ আছে। জীবনটা যে এত সুন্দর তা কলকাতার ভীড়ে একদিনও বোঝা যায় না। এত ক্লান্ত ছিলাম আমি।

...জানি গো। আমার মনে হয় আমাদের সব ভাবনা-চিন্তার দিন শেষ হল। এবার থেকে বেশ শান্তিতে থাকতে পারব। তাই না?

...এই ছুটিটা সত্যিই দরকার ছিল। গ্রেট রিলিফ...

...ভাগ্যিস ছুটি নিলে।

অশোকের হাত টেনে নিয়ে নিজের গালে রাখল কৃষ্ণা।

খুব ভোরে প্রায় রাত থাকতে রওনা হয়েছিল ওরা।

ভোরেই প্লেনে কলকাতা ফেরার কথা।

আগের রাত্রে অল্প বৃষ্টি হয়েছিল। তবে এখন আকাশ পরিষ্কার। এয়ার পোর্টে পৌঁছে দেবার জন্য গাড়ী বলা আছে। ঠিক সময়ে ড্রাইভার ল্যাণ্ডরোভার নিয়ে হাজির হ'তে খুসীই হল ওরা। শুভ লক্ষণ। জিনিষপত্র পেছনে তুলে দু'জনে এসে সামনের সীটে বসল।

ড্রাইভারের পাশেই বসেছে অশোক। ড্রাইভারকে নানা প্রশ্ন করতে করতে অশোক যাত্রাটা যেন আরও উপভোগ্য করে তুলতে চাইছিল। ড্রাইভারও বেশ খুসীমনে উত্তর দিচ্ছিল। কৃষ্ণা একমনে যেন শেষবারের মত প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখে নিচ্ছিল।

ওকে চুপচাপ দেখে অশোকও তার কথাবার্তা থামাল।

...কি, চুপচাপ যে কৃষ্ণা?

...ভাল লাগছে বেশ, পথটা এত সুন্দর। সত্যিই আমার একটা কবিতা আবৃত্তি করতে ইচ্ছে করছে।

...কর না।

...কোনটাই যে মনে আসছে না। সেই চিরকালের পথের কবিতা...

'পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি।

আমরা দু'জনে চলতি হাওয়ার পন্থী।

রঙীন মেঘের...

...সাবধান।

হঠাৎ একটা বাঁক পেরোতেই গাড়ীটা স্কীড্ করে গেল সেই পিছল রাস্তায়।

...কৃষ্ণা।

আর্তনাদ করে উঠল অশোক।

নিমেষের মধ্যে কি যেন ঘটে গেল। প্রচণ্ড শব্দে গাড়ীটা গিয়ে ধাক্কা লাগাল পাথরের দেওয়ালের গায়ে, তারপর উল্টে গিয়ে ক্রমাগত পাক খেতে খেতে ছিটকে চলল অনেক দূর পর্যন্ত।

অশোকের দীর্ঘ দেহ বেশ কিছুদূর গড়িয়ে একটা পাথরে এসে সজোরে ধাক্কা খেল। চোখ-মুখ রক্তে ভেসে যাচ্ছে, থেৎলান হাত দিয়ে একবার কৃষ্ণাকে পাশে অনুভব করতে চাইল, কিন্তু বৃথা চেষ্টায় কতকগুলো ধুলো-বালি আঁকড়ে নোনতা রক্তে ভেসে যাওয়া ঠোঁটে শেষ মুহূর্তে যেন অনুচ্চারিত স্বরে বলল...এ ছুটি আমি চাইনি কৃষ্ণা, এ ছুটি আমি চাইনি।

ছুটি

সকাল থেকেই ফাইফরমাসের অন্ত নেই।

লতা দুধের গেলাসটা ধুয়ে দিয়ে যাও।

লতা আমার সার্টের বোতাম এখনও বসাস নি ?

লতা ডিবেতে পান যে একেবারে নেই।

লতাদি আমার ক্রিকেট ব্যাট কোথায় রেখেছো ?

কত রকমের ফরমাস, কত রকমের আবদার। কোনটাতে অনুরোধের সুর, কোনটাতে হুকুমের। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। যাকে হুকুম করা হচ্ছে সে নির্বিকার। মেশিনের মত চরকি পাক ঘুরে সে সব কাজ সেরে ফেলবার চেষ্টা করছে। সবাইকেই তুষ্ট করার প্রচেষ্টায় হাত দুটোর আর আরাম দিচ্ছে না।

উপায় নেই। কাজ করবে আসলে একজন আর ফরমাস করবে সবাই। ফল যা হয়।

ভোর পাঁচটায় ওঠা আর রাত বারটায় শুতে যাবার আগে পর্যন্ত একফোঁটা অবসর পায় কি করে লতা, শুধু দুপুরে ঘন্টাখানেক। সকলে অফিস-ইস্কুলে গেলে আর কাকীমা ঘুমুলে। তাও লতা ঘুমোয় না। নিজের প্রিয় বইগুলো নিয়ে বসে যায় লতা জানালার ধারে, যেখান থেকে নীল আকাশ আর সাদা মেঘের দল দেখা যায়, যারা স্বাধীনভাবে যেখানে ইচ্ছা চলে যায়। হয়ত এ মেঘ নূরপুরেও যায় সেখানে অমলদা আছে আর আছে লতার ফেলে আসা বাল্যকালের দিনগুলো।

ঐটুকু সময়ই লতার নিজস্ব। তাই এ সময় লতা খালি নিজের কথাই ভাবে, নিজের অতীত, নিজের ভবিষ্যৎ। অতীত আর ভবিষ্যতের মাঝখানে এই বিবর্ণ বর্তমানকে লতা আমল দিতে চায় না। বর্তমান তো চিরদিন থাকবে না, একসময় বর্তমানও অতীত হয়ে যাবে, ততদিন সে অপেক্ষা করে থাকবে, আরও অনেকদিন অপেক্ষা করবে সে। শুধু এই দুপুরটুকুই মাত্র তার নিজস্ব। তারপর আবার ডাক পড়বে।

লতা, লতা, লতা……

লতা ওর ডাক নাম। ভাল নাম মালতী। বাবা আদর করে ডাকতেন মালতী ফুল, মালতী লতা।

ফুল না ছাই, লতা না ছাই। তাহলে আর এমনি জীবন হয়? আদর হ'ত না সে ফুলের? যত্ন হ'তনা? সাজিয়ে রাখত না কেউ? তবে? তবু বেশী ভাবতে চায়না মালতী, আর অবকাশও নেই। কাকার সংসারে দয়া করে আশ্রয় পাওয়া মেয়ের আবার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে নাকি? তাই মালতীও মেনে নিয়েছে এ জীবনকে। প্রাণপণ চেষ্টায় সকলকে খুশী করে কিন্তু তাতে কি সকলে সন্তুষ্ট হয়? তা না হলে পরশু সকালে ফুলদি তাকে অত কথা শোনাবে কেন? সোনাবৌদি সেদিন মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেবে কেন, চা আনতে দেরী হওয়ার জন্য? রাঙাদাই বা কাকীমাকে সমর্থন করে তাকে বাঁকা বাঁকা কথা বলতে যাবে কেন? শুধু ব্যতিক্রম ছোড়দা আর মিঠু। মিঠুর তো তাকে না হলে চলেই না। ছোড়দাটাও ভারী ভালো।

অথচ কাকীমা তাকে দেখতে পারে না। ফুলদিও। সোনাবৌদি আর রাঙাদা তো বলে, বখার একশেষ। কিন্তু মালতী ছোড়দাকে সব থেকে বেশী ভালবাসে।

সোনাবৌদি এমনিতে মানুষটা বেশ কিন্তু বড় খেয়ালী। কোন সওদাগরী অফিসে কাজ করে মাসে চারশ টাকা ধরে আনে। সকাল ন'টায় বেরিয়ে যায়, বাড়ী ফেরে সন্ধ্যারও অনেক পর। কতদিন আরও রাত্রে। বাড়ী এসে খুব গম্ভীর হয়ে থাকবে, মোটা গলায় কথা বলবে, ক্লান্ত হয়ে তাড়াতাড়ি শুতে যাবে, যা হোক দুটি খেয়ে বলবে মিটিং ছিল। কিন্তু মালতী ঠিক বুঝতে পারে সিনেমা দেখে ফিরছে। কেন বুঝবে না?

মালতী যখন সোনাবৌদির কাপড়-জামা পাট করে তোলে, ব্যাগ থেকে বাজে জিনিস, ময়লা রুমাল, ট্রামের টিকিট সব বার করে আনে, তখন বুঝি ওর সিনেমার টিকিট চোখে পড়ে না। একটা নয় দুটো টিকিট। সোনা-বৌদি যে একা সিনেমায় যায় না মালতী তা জানে, কিন্তু ও মাথা ঘামায় না। খেটেখুটে মাঝে মাঝে সিনেমা দেখবে বৈকি। হোক না সোনাবৌদি বিধবা। তা ছাড়া বিধবার মত কোনটা করছে সে? কাকীমা হাজার মুখ নাড়া দিক। সারামাস খেটে রোজগেরে ছেলের মত সে সংসারে চারশ টাকা এনে দিচ্ছে না? তবে?

বাতে পঙ্গু কাকীমা। বাঁদিকটা প্রায় অবশ। হাত-পা নাড়াতে পারে না, সংসারে ইচ্ছেমত গিন্নীপনা করতে পারে না। মুখে তার শোধ তোলে। সারাদিন যে কোন তুচ্ছ কারণে এমন চেঁচাবে যে বলার নয়। দুপুরে তবু দু-এক ঘন্টার শান্তি কাকীমা ঘুমুলে। কিন্তু বিনা কারণে রাত-দিন চেঁচালেও কেউ কিছু বলবে না। বলবে কোত্থেকে? কাকীমার বাবার দেওয়া এই বিরাট বাড়ীই শুধু নয়, অনেক টাকা, সব তার বড়লোক বাপের একমাত্র মেয়েকে দিয়ে যাওয়া যৌতুক। তাই সবাই মান্য করে কাকীমাকে মা বলে নয়, বাড়ীর গৃহিণী বলেও নয়। বহু টাকার মালিক কাকীমা।

শুধু ছোড়দা আর সোনাবৌদি কাকীমাকে ভয় পায় না। ছোড়দা তো বাড়ীতেই থাকে কম। আর সোনা বৌদির বাবাও কম দেয়নি এ সংসারে। ঝগড়ার সময় তো সোনাবৌদি বলেই দেয় সে সব কথা, তাই তো জানতে পারে মালতী।

জানতে পারে আর অবাক হয়ে যায়। সব শুধু টাকার জন্য? সব সম্বন্ধ এমনই হয় নাকি?

কই দাঙ্গার সময় বাবা মারা যাবার আগে সব ছেড়ে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসার আগে তাদেরও তো কত টাকা ছিল, তবে? এমন কি পাশের বাড়ীর হোসেন সাহেবরা, যাদের বড় ছেলে বাবাকে বাঁচাতে গিয়ে নিজেও প্রাণ দিল, তারা? তাদের তো কত টাকা ছিল। সেখানে তো টাকা থাকা না-থাকায় কোন প্রভেদ দেখেনি।

তা হলে? বোধহয় নূরপুর আর কলকাতার কথা আলাদা। তাই হবে। নূরপুরের কথা ভাবতে গেলে বুকের মধ্যে কেমন যন্ত্রণা হয় মালতীর। দুপুরে বই পড়তে পড়তে কতবার তার মন চলে যায় সেইসব দিনে। তার ফেলে আসা একান্ত আপন নূরপুরের কথা মনে পড়ে। সেই নূরপুর যেখানে তার আজন্ম কেটেছে—সেই স্কুলের জীবন, গলাগলি ভাব রাবেয়ার সঙ্গে জ্যোৎস্নার সঙ্গে, সেই বীণাদি—বীণাদির ভাই অমলদা।

চোখে জল এসে পড়ে মালতীর। কি হবে এ সব কথা ভেবে—অমলদা ভাই তোমায় আমি ভুলিনি।

নূরপুর তোমার আমি ভুলিনি। আপন মনেই যেন আস্তে আস্তে উচ্চারণ করে মালতী কোন গোপন নিজস্ব সম্পত্তির মত।

আর এখানে? খালি কাজ আর কাজ। আর তারই সঙ্গে বকুনি। ফুলদির তো উঠতে বসতে বকুনি। ফুলদির স্বভাবই ঐ। অথচ বাইরের লোক এলে বিশেষ করে সৌমিত্র এলে কি মিষ্টি করে কথা বলে। ভারি হাসি পায় মালতীর। ফুলদি বেশ এত মজার চরিত্র।

ফুলদির নাম কে মৈত্রেয়ী রেখেছিল কে জানে। ছোড়দা তো রোজই এ নিয়ে ঠাট্টা করে আর ফুলদি তাতে আরও চটে যায়। লেখাপড়ার মাথা সত্যিই ফুলদির একেবারেই নেই। তা না হলে তিনবার চেষ্টা করেও পার্ট ওয়ান পাশ করতে পারল না। থার্ড ডিভিশনে হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করেছে, ব্যস ঐ ঢের। মন কোথায় ফুলদির?

বাবা বলতেন পড়াশোনা একটা তপস্যা। মালতীও তাই মনে করে। ও তো অত অল্প বয়সে বি এ পাশ করতে পেরেছিল। অথচ ফুলদির ভাবখানা যেন পড়া ছাড়া আর কিছু জানে না। কোন কাজ বললে বই মুখে নিয়ে বসবে নিজের দক্ষিণের ঘরটায়, আর চিঠি লিখবে। একমাত্র মেয়ে বলে কাকীমার ভারী আদরের। মিতা বলে ডাকে ওকে, কত আদর করে। ফুলদিও কাউকে কেয়ার করে না। মেজাজ আর মুখ। সোনাবৌদি আর ছোড়দার সঙ্গে মাসের মধ্যে অর্ধেক দিন কথা বন্ধ।

ফুলদির ভারী রাগ সোনাবৌদির ওপর। শুধু মায়ের আস্কারা। না হলে বিধবা হয়েও সে কুমারী মেয়ের মত থাকে কি করে?

এতে সোনাবৌদি আরও রেগে যায়। বিয়ের এক বছরের মধ্যে তার টি-বি রুগী স্বামী মারা যায়নি? কোন সাধটা মিটেছে তার জীবনে?

তবে?

ভাই না হয় বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে, বৌদিরা পাপ বিদেয় করেছে। কিন্তু তারা তো এ সব জানত না। আর এরা যে জেনেশুনে তার এত বড় সর্বনাশ করেছে? ভ্যাগিস লেখাপড়া শিখেছিল! তা না হলে আজ কি হোত তার?

ভাবতেও পারেনা সোনাবৌদি।

সব কথাই তো ঝগড়ার সময় জানতে পারে মালতী। না হলে ওকে কেউ বলতে যায় নাকি? আর ঝগড়া তো সপ্তাহে একবার অন্তত হবেই। ভাগ্যিস মালতীকে কেউ দলে টানতে যায় না। মালতীর তো মাথা ঘোরে এসব শুনলে। নূরপুরে তাদের অতবড় সংসারে, পাশের বাড়ীতে হোসেন সাহেবের চারবিবির সংসারে, কোথাও সে এত অশান্তি দেখেনি। নাকি দেখবার চোখ ছিল না?

নিজেরা ঝগড়া করুক তাতে মালতীর কিছু যায় আসে না। সব কিছুকেই সহজভাবে মেনে নেওয়া তার স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। তাই হাসি তামাসার মত মাঝে মাঝে ঝগড়াকে সে স্বাভাবিক বলে মনে করে, কিন্তু ফুলদি যেন মাঝে মাঝে সীমা ছাড়ায়। তখনই রাগ হয় মালতীর। রাগের প্রকাশ সে করেনা. করলেই বা শুনছে কে? কিন্তু এই সব অশান্তিতে দুপুরের সময়টুকুও তার খারাপ লাগে। মনের মধ্যে আসতে চায় না, কিন্তু অশান্তি আর নীচতার এই গ্লানিটুকু সারাক্ষণই যেন বিঁধতে থাকে তাকে।

ফুলদির পরিচর্যা করতেই তো মালতীর বেশী সময় যায়।

ফুলদি সাজবে, সাড়ী জামা চতুর্দিকে ছাড়বে আর সব মালতীকে সাজিয়ে পাট করে গুছিয়ে রাখতে হবে।

সাজে পটু ফুলদি।

সব সময় সেজেগুজে পরিপাটি, এক চুলই সাত বার বাঁধবে। কাল বলে রং ফরসা করবার কত আয়োজন। দুধের ফেনা, কাঁচা হলুদ, বেসন গোলা কিছু বাদ দেবে না। সাড়ীর সঙ্গে ম্যাচ করে শুধু ব্যাগ চটি জুতোই নয়, লিপষ্টিকও লাগবে।

জিজ্ঞেস না করলেও মালতীকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলবে এ সব হোল লরেটোর চাল। লরেটোর মেয়ের সাজ মালতী বুঝবে কোথা থেকে? এসেছে তো পাকিস্তানের এক মফস্বল সহর থেকে।

মালতীর বোঝার দরকারও নেই। অত সময়ও নেই তার। আগেই ওসব ওর মাথায় আসত না। এখন তো কথাই ওঠে না। তবে একথা জানতেও তার বাকী নেই লরেটোর ছাত্রী বলে ফুলদির নিজেকে মনে করতে ভাল লাগে, তাই একথা বলে। নাহলে লরেটোর কলেজে ফুলদি পড়েছে মাত্র এক বছর। আর তো যায়ই না। ভাল লাগে না তার নিয়ম কানুন, মাদারদের কড়াকড়ি আর টিউটোরিয়াল ক্লাসের হাঙ্গামা তাই বাড়ীতেই পড়ছে।

পড়ছে যে কত তা সোনাবৌদি ভালই জানে। বলতেও তো ছাড়ে না। আসলে ছিল তো বীণাপাণি বিদ্যামন্দিরের ছাত্রী। একেবারে শেষ বেঞ্চের ছাত্রী, সে সবও জানে সোনাবৌদি। মালতীকে কতবার বলেছে, রাত্রে সোনাবৌদির ঐ এক দোষ। পরিষ্কার করে পাতা বিছানাও আবার শোবার আগে মালতীকে দিয়ে নিভাঁজ করাবে। অবশ্য নিজেও হাত লাগায়, তবু এ বাতিক ছাড়া আর কি?

কিন্তু ফুলদি তো নড়েও বসবে না। সাজবে, মার্কেটে যাবে, সিনেমায় যাবে আর খালি আড্ডা দেবে।

কাকীমাও ফুলদির কাছে জব্দ। হাজার অমত থাকলেও একটি কথা বলতে পারবে না। তাহলে কেঁদে অনর্থ বাধাবে না ফুলদি?

বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাওয়া বা আত্মহত্যার ভয় দেখাবে না?

তাই কাকীমা চুপ, সোনাবৌদি চুপ, রাঙ্গাদাও চুপ। শুধু চুপ নয় ছোড়দা।

ছোড়দা তো স্পষ্টই বলে যে ফুলদির সাজের বাহুল্য—উৎকট ফ্যাসান, আর গানের নাম করে নাকি সুরের কান্না ছোড়দা সহ্য করতে পারে না। ফুলদি অবশ্যই এরপরে কেঁদে, চুল ছিঁড়ে, মাকে নালিশ জানিয়ে অনর্থ করে, কিন্তু ছোড়দা ছাড়ে কই?

মালতীর ওপর তো ফুলদির রাগ কম নয়। মালতী সুন্দর বলে নয় ফুলদির ধারণা ওর সব সাড়ী জামার ওপর মালতীর লোভ, সে ইঙ্গিত করতে ছাড়ে না।

মালতীর তখনই অসহ্য লাগে। যা তার ধারণারও বাইরে তাকে সেই অপবাদ দেওয়া, কিন্তু নিজের ছোট ঘরে চলে গিয়ে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে মনের আবেগ আর বেরিয়ে আসা চোখের জলকে সংযত করা ছাড়া আর কিই বা করতে পারে সে?

এ বাড়ীতে ছোড়দা আর মিঠুই শুধু তার শান্তি।

ছোড়দা শুধু মালতীকে বই এনে দেয় গল্পের, তাই নয়, কোন ফরমাস করে না। মালতী যে অনেক খাটে, ছোড়দা আর তাকে খাটায় না। বরং মালতীকে বলে এত কাজ নীরবে না করতে। ছোড়দা ভারী ভাল।

কিন্তু মালতী না করলে করবে কে?

অবশ্যই ঠাকুর আর একটা চাকর আছে, বড় কাজ, রান্না এসব করবার জন্য। কিন্তু ঠাকুরের হাত জোড়া থাকলে? চাকর বাজার গেলে?

তাই বলে তো আর ছ সাতটা লোকের জন্য ছ-সাতটা চাকর বাকর রাখা যায় না। তবে?

তাই মালতী হাতের কাজ তাড়াতাড়ি সেরে ফেলে। তার নিজের জন্য তো দুপুরটুকু আছে। যখন সে চিন্তা করতে পারে নূরপুরের কথা, ছোড়দার দেওয়া বই পড়তে পারে, অনায়াসে এ জগতকে পেছনে ফেলে অন্য জগতে চলে যেতে পারে।

নূরপুরের কথা ভাবলেই চোখে জল আসে তার। সেখানে সব লোককে খুশী করবার দায় নেই। লোকের মেজাজ বুঝে চলতে হ'ত না। বাবার আদরে, বন্ধুদের স্নেহে আর প্রতিবেশীদের ভালবাসায় খালি আনন্দের দিন কাটান।

কি যে সব হয়ে গেল। বাবার অত স্নেহ পেয়ে মা হারানোর দুঃখ ভুলে ছিল বলেই বুঝি অত তাড়াতাড়ি সব শেষ হয়ে গেল।

এখানে ছোড়দা তাকে ভালবাসে তাই মালতীকে এম-এ পড়তে বলে। কাকীমার কাছেও সে কথা বলতে ছাড়ে না।

কাকীমা কথাটাকে ধর্তব্যের মধ্যে আনেন না। ছেলে তাঁর বোকা হ'তে পারে তাই বলে তিনি কি কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন।

নাকি, একে ঐ রূপ মালতীর, ভয়ে তিনি কাঁটা হয়ে আছেন, তার ওপর আরও লেখাপড়া শিখিয়ে বিবি সাজালে তাঁর মেয়ের দিকে কেউ ফিরে তাকাবে নাকি?

আর সেই জন্যই বাইরের লোকের সামনে তিনি মালতীকে বার হোতেই দেন না। বারবার বলে দিয়েছেন, ঠাকুরকে সাহায্য করুক, বিছানা করুক, পরিবেশন করুক, সব ঘর সংসারের কাজ করুক, কাজ না থাকলে নিজের ঘরে বা ছাদে যাক, কিন্তু হাজার প্রয়োজনেও যেন বাইরের লোকের সামনে কাজ না দেখাতে যায়।

এমন কি মিঠুর আবদারে তাকে স্কুলে পাঠাবার সময়ও যেন বাইরে না আসে।

কি দরকার?

সাজিয়ে গুজিয়ে তো ঐ দিচ্ছে। কাকিমা কি তাতে আপত্তি করেছেন?

তবে?

আবার আদিখ্যেতা ক'রে দরজা অবধি এসে হাত নাড়ার কি দরকার?

প্রথম দিনের ধমকের পরই মালতী তাই আর বার হয়নি। মিঠু অভিমান করেছে, তবুও নয়।

কাকীমার বারণ অনেক।

ছাতে চুল শুকোবার নাম করে পাড়ার ছেলেদের চুলের রাশ না দেখালেও চলবে। তার ঘন আর লম্বা চুল বলে এমনি হাতে ঝুলিয়ে দিয়ে শুকিয়ে নিক, না হয় খানিকটা কেটে ফেলুক কি হবে অত বাহার? থিয়েটারের নটী নয়ত।

তবে?

অথচ ফুলদির চুলের দরকার।

তাই তার মাথায় ঘষে ঘষে তেল, কেশুত পাতার রস মাখালেই শুধু হয় না, রাত্রে শুতে যাবার আগে, কাকীমার পায়ে তেল মাখাবারও আগে ফুলদির চুল একঘণ্টা ধরে আঁচড়ে বেঁধে দিতে হয় মালতীকেই। আগে আগে সোনাবৌদিরও চুল বেঁধে দিতে হত।

আজকাল সোনাবৌদির নিজেরই সময় হয় না, এই অফিসে ঢুকে অবধি। নটার ভেতরই ঘুমপেয়ে যায় সোনাবৌদির, তখন তো মালতীর রান্নাঘরের পাটই চোকে না।

ঠাকুর চাকরকে খেতে দিয়ে, নিজে খেয়ে, পরের দিনের ভোরের ভাঁড়ার বার করে, ভিজে কাপড় থাকলে তা নেড়ে দিয়ে, তবে সে আসে কাকীমার ঘরে তার নিজের বিছানাটা ছোট ঘর থেকে নিয়ে।

শোবার ব্যবস্থা কাকীমার ঘরের মেঝেতেই, তাঁর বিধবা হবার পর থেকে। কাকীমা একা শুতে পারেন না, তার ওপর একটা লোকেরও দরকার, রাতে তাই মালতী বিরাট মসৃণ মেঝেয় শুতে পারার অধিকারিণী হয়েছে।

অবশ্য বাইরের লোককে অন্যকথা বলেন। সোমত্ত মেয়ে, যেখানে সেখানে তো শুতে দিতে পারেন না. তাই নিজের কাছে নিয়ে শোন। নিজের মেয়ের থেকেও তাঁর পরের মেয়ের জন্য ভাবনা বেশী।

ছোড়দা হাসে। মার চালাকী সব ও জানে। কাকীমাকেও বলতে ছাড়ে নি। আসলে ঘরে না শোওয়ালে মালতী এগারটা অবধি পা টিপে চলে গেলে, ঘরের দরজা বন্ধ করবে কে? তাছাড়া রাত্রে পাঁচ ছবার জল খাওয়া, বাতের ব্যথা বাড়লে মালিশ লাগান, গরম জলের বোতল দেওয়া এসব করবে কে?

এ কথায় কাকীমা আরও রেগে গেছেন। কিন্তু ছোড়দা বলতে ছাড়ে নি। কাকীমা ছোড়দার সঙ্গে কিছুতেই পেরে ওঠে না। রেগে বলে, বিয়ে কর বাদল, তোর বৌ এসে সেবা করুক।

সেই ভয়ে তো বিয়ে করছি না।

কি বললি, বৌ-এর হাতের সেবা পাব না?

দুটো একটা বৌ তো এসেছে? একটা তো থাকেই না, অন্যজন তো আছে, কত সেবা পাচ্ছ তার কাছে? লতা না থাকলে তো মারা যেতে।

সে বেচারা সারাদিন অফিস করে না।

কাকীমা নিজের মান রক্ষা করেন।

এখন না হয় অফিস করে, আগে? কখনও তো এত রাজ-আদর তোমার দেখি নি।

পাকাম করিস নি বাদ্‌লা। সে আমি বুঝব। তুই বিয়ে কর ত।

রক্ষে কর, ও কাজটি আমা হ'তে হবে না।

হুঁ হবে না, ভাল হই, দেখাচ্ছি তোমায়। লতা! পানের ডিবেটা খালি যা।

গলায় যথাসম্ভব মাধুর্য আনেন তিনি ছোটছেলেদের সামনে। ছোড়দাকে ভয় করেনি তিনি।

শুধু ছোড়দা নয়, সম্প্রতি আর একজন যে তাকে সহানুভূতির সঙ্গে লক্ষ্য করে সেটুকু বুঝতে আর বাকী নেই মালতীর। ফুলদির জন্য কাকীমা অবশ্য তাকেই মনোনীত করে রেখেছেন।

সে হৃদয়বান, মালতীকে সে উপেক্ষা করে না সে পরিচয় বহুবার পেয়েছে মালতী। এজন্য সে কৃতজ্ঞ।

ছোড়দা তো শুনে হেসেই খুন।

কৃতজ্ঞ কি রে? সৌমিত্র শুনলে তো হেসেই মরে যাবে।

বা রে কত ভাল উনি।

ভালই তো!

তবে?

তবে আর কি? মা তো ঐ জন্যই ফুলদির জন্য ওকে হুক করতে চাইছে। দেখিস নি, সৌমিত্র আসলে তোর ফুলদির মুখের চেহারাই বদলে যায়।

ফুলদি ওঁকে ভালবাসে, না ছোড়দা ?

ভালবাসে ? হাসালি।

কেন ?

তুইও যেমন। ফুলদিকে চিনিস না ? আরে, বড় বাড়ী, ব্যাঙ্ক আর অমন চাকরি না থাকলে ভালবাসা কবে উবে যেত।

কেন চেহারাও তো বেশ ভাল।

সেটা তো বাহুল্য, চেহারা খারাপ হলেও কিছু এসে যেত না। কিন্তু ব্যাপার কি ?

কিসের ?

সৌমিত্রর চেহারা বুঝি তোর খুব ভাল লাগে ?

বাঃ—

বাঃ কি, দেখিস তুই আবার সৌমিত্রের প্রেমেট্রেমে পড়ে যাসনি যেন। ফুলদির সঙ্গে ডুয়েল ফাইটে পারবি না কিন্তু।

যাও কি যে বল।

বুকটা ধড়াস করে উঠেছে মালতীর। ছোড়দা যেন কি। অত ভাল সুন্দর লোককে ভাল লাগবে না। নূরপুরের অমলদাকেও তো ভাল লাগত। তাছাড়া সৌমিত্র কেমন সকলের কথা ভাবে। সেদিন ফুলদির জন্মদিনে ফুলদির জন্য দামী প্রেজেন্ট যেমন এনেছিল, তেমনি সোনাবৌদি আর তার জন্য দুটো টাটকা যুঁইয়ের গোড়ে। সোনাবৌদির জন্য তো প্রায়ই আনে তাই বলে মালতীর জন্য ? আর মালতী যখন যুঁইফুলের মালা অত ভালবাসে।

তাছাড়া অন্যদিন হলে নিতে ওর দ্বিধা হোত, কিন্তু সেদিন মালাটার ওর দরকার ছিল।

বাবার মৃত্যুদিন সেদিন।

বাবার ছবিতে একটা মালা দেওয়ার ইচ্ছে তার মনের কোণায় ছিল। কিন্তু বলবে কাকে ? ছোড়দাটাও দুদিন গেছে দুর্গাপুরে। সৌমিত্রের প্রতি এ জন্যও কৃতজ্ঞ বোধ করেছে মালতী।

ছোড়দা পরে শুনে বলেছে

সত্যি ভারী সুন্দর ছেলেরে সৌমিত্র।

ফুলদি খুব সুখী হবে দেখো। নীচু গলায় মালতী বলেছে।

কচু।

কেন?

ফুলদির ভেতর সুখী হবার মালই নেই, বরং আমার তো সৌমিত্রের জন্য দুঃখই হয়।

সেকি?

আহা ফুলদিকে তো চিনিস, আমি ভাবছি বেচারা সৌমিত্রর জীবনটা ফুলদি না নষ্ট করে দেয়।

ছোড়দা তুমি কি বলতো? নিজের বোন।

তা কি করব। আমি এসব ব্যাপারে খুব ইম্পারসিয়াল।

সোনাবৌদিও একথা বলেছে।

ছোড়দার মত স্পষ্ট করে না হলেও ইঙ্গিতে। সেই জন্মদিনের পার্টির মধ্যে গানবাজনার ভেতরই সোনাবৌদির হঠাৎ মাথা ধরে গেল আর মালতীর ডাক পড়ল সোনাবৌদির ঘরে। তখনই তো।

সোনাবৌদির বুকের জ্বালা স্পষ্ট দেখতে পেল মালতী। অনুভব করতে পারল, আকণ্ঠ কি পিপাসা নিয়ে এ সংসারে সোনাবৌদি বাস করছে।

কিন্তু কার জন্য পিপাসা, কিসের পিপাসা? তার পথ কই? সার্থকতা কোথায়?

মালতী ক্রমশই অবাক হয়ে যায় বেশী তারপর নিজের চিন্তার সঙ্গে কখন সোনাবৌদির সমস্যাও তার চিন্তায় স্থান পায়।

তাই আরও বেশী রাত্রে শুতে যাবার আগে যখন মালতীকে ডেকে চুপি চুপি সৌমিত্রকে দেবার জন্য চিঠি দিয়েছে, তখনও সেটা মালতী কিছুতেই দিতে পারে নি সৌমিত্রকে। তবে অবাক হয় নি, মালতীর হাত দিয়ে সৌমিত্রকে চিঠি দিতে সোনাবৌদির নির্লজ্জতা দেখে।

মালতী অবাক হয় না। ও জানে মালতীকে কেউ লজ্জা পায় না। ওর ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সবাই যেন সচেতন নয়, ওকে তাই কেউ লজ্জা পায় না, দয়া করে, অনুগ্রহ করে।

মালতী চিঠিটা সৌমিত্রকে দেয় নি। বারবার সোনাবৌদি বলে দেওয়া সত্ত্বেও চিঠিটা তেমনি খামসুদ্ধই ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। না পড়লেও বুঝতে পেরেছে সোনাবৌদি কি লিখেছে।

এটাও বুঝেছে সৌমিত্রর কাছ থেকে উত্তর না পাওয়ায় দারুণ রেগে গেছে সোনাবৌদি সৌমিত্রের ওপর, আর সৌমিত্র না আসা পর্যন্ত সে রাগ কমে নি।

কিন্তু নিজেকে অপরাধী মনে হয়েছে মালতীর। তাই টাটানগর থেকে ট্যুর করে ফেরার পরই যেদিন সৌমিত্র এখানে এসেছে, সেদিনই তাকে বলেছে।

আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।

আমার সঙ্গে? বল।

সোনাবৌদি আপনাকে দিতে একটা চিঠি দিয়েছিল আমাকে?

আমাকে?

অবাক হবার ভাণ করেছিল নাকি সৌমিত্র।

হ্যাঁ, আপনাকে।

তুমি কি করে জানলে?

একটু গম্ভীর হয়ে গেছে সৌমিত্র।

আমাকেই দিতে দিয়েছিল।

কৈ সে চিঠি?

ওর আগ্রহ দেখে অবাক হয়ে গেছে মালতী।

আপনাকে দিতে বলেছিল, কিন্তু—

কিন্তু কি? হারিয়ে ফেলেছ বুঝি?

মানে, সে চিঠি—

ঠিক আছে।

কিছু মনে করেন নিতো?

তোমার নিজের লেখা চিঠি আমাকে না দিয়ে হারিয়ে ফেললে ঠিক মনে করতাম।

খুব গাঢ়স্বরে বলেছে—সৌমিত্র মালতীর কাছে সরে এসে?

মালতী এই স্পষ্ট ছলনাকে ভয় পেয়েছে, ও সহানুভূতির জন্য কৃতজ্ঞ, কিন্তু খেলা নয়।

তার নিজের বুকটা দুমড়ে মুচড়ে যেতে যায়, ছোড়দার কাছে সব শুনেছে ও। ছোড়দাকে মালতীর কথা, তাদের দেশ, অতীত কথা সব নাকি জিজ্ঞেস করে সৌমিত্র প্রায়ই, সামনে কোনদিন বলে না কিছু—কিন্তু মালতী জানে সৌমিত্রর চিন্তায় মালতী আছে, সে বাড়ীর একজন নেহাতই অনুগৃহীতা হয়ে সকলের আড়ালে থাকলেও সৌমিত্রর চোখের দৃষ্টিতে সে আছে। তার মনের দর্পণে কোথাও মালতীর ছায়া আছে। ছোড়দার কাছে একথাও শুনেছে। মালতীর এই ভাগ্য বিপর্যয়ে সৌমিত্রর আন্তরিক সহানুভূতি আছে।

কিন্তু সহানুভূতি দয়া? আর কিছু নয়?

বুক ভেঙ্গে গেলেও কোন কথা বলতে পারে নি মালতী।—আবার ভেবেছে নূরপুরের কথা! সেইসব দিনগুলোর কথা......

সৌমিত্রকে নিয়ে যেন কাড়াকাড়ি।

সৌমিত্র যেন সাতরাজার ধন মাণিক।

সৌমিত্র কি নয়।

তাই কাকীমার ভয় মালতীকে, মালতীর রূপকে, পারতপক্ষে তাই তিনি মালতীকে আসতে দিতে চান না সৌমিত্রর সামনে।

সেদিন তো আরও বেশী।

যেদিন সকাল থেকে অঝোর ঝরে বৃষ্টি। কেউ আসবে বলে ভাবাও যায় নি, তবু ফুলদি সেজেছে সকাল থেকেই। অন্তত তোড়জোড় চলেছে সকাল থেকেই। মাথা স্যাম্পু করেছে। নখ পরিষ্কার করে নতুন রং লাগিয়েছে, সব। তারপর বিকেলে নিজের সামনে বসিয়ে ফুলদিয়ে সাজিয়েছে কাকীমা। মালতীকে হঠাৎ সে ঘরে দেখে তো বেশ রেগেই গেছে।

তুই এখানে কি করছিস?

একটা বই খুঁজতে।...

বই খুঁজতে না ছাই, ছুতো করে খালি এ ঘরে আসা।

ছুতো করে? কেন? মালতী বুঝতে পারে নি। কি লাভ ছুতো করে এ ঘরে এসে? কিন্তু কাকীমাই বুঝিয়ে দিয়েছে।

এই লতা শোন, মিতাকে আজ দেখতে আসছে, তুই যেন আর এদিকে আসিস নি।

না...

না-না বলছে বটে কিন্তু ঠিক আসবে ও দেখ। ফুলদি ঠোঁট উলটে বলেছে।

আর ফুলদির নির্লজ্জতায় অবাক হয়ে গেছে মালতী।

ফুলদিকে দেখতে এলে সেখানে মালতীর এসে লাভ কি? বুঝতে পারে না মালতী, চলে যাবার সময় স্পষ্ট শুনতে পেয়েছে ফুলদির গলা।

জান মা, ঐসব ইংরেজী বই পড়ে ও ফ্যাশন দেখায়।

তাছাড়া আর কি?

কাকীমা তৎক্ষণাৎ সায় দিতে দ্বিধা করে নি। আর মালতীর দুচোখ জলে ভরে এসেছে।

বই পড়া আবার ফ্যাশন নাকি? বাবার কাছে থাকতে কোন বই পড়া তার বাকী ছিল—বিশেষ করে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক বলে বাবা তো তাকে ভাল ইংরেজী বই পেলেই পড়াতেন। হঠাৎ বাবা দাঙ্গায় মারা না গেলে, আজ হয়ত ফরাসী সাহিত্যের মূল বইও সে অনেক পড়ে ফেলত। বাবা বলতেন বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে ইংরেজী ও ফরাসী সাহিত্য বিশেষ করে জানা দরকার। অমলদার সঙ্গে তো ফরাসী শিখতে গিয়েই বেশী আলাপ। বই পড়তে পড়তে কত সন্ধ্যাই তো তাদের কেটেছে বাড়ির পশ্চিমের বারান্দায়।

তবে?

ফ্যাশন দেখাবে বই পড়ে?

এতো তার চিন্তারও বাইরে।

শ্যামবাজার থেকে বড়দা এলেন বিকেল হ'তেই। বড়দা আলাদা থাকেন তাঁর বউ নিয়ে। কাকীমার কর্তৃত্ব নাকি বড়বৌদি সহ্য করতে পারে না। বড়দা বড় কাজ করেন, একটা বাড়ীর ভাড়া গুণতে হবে বলে চিরকাল কি শাশুড়ীর মুখ নাড়া সহ্য করবে নাকি বড়বৌদি?

তাই শ্যামবাজারে ফ্ল্যাট ভাড়া করে উঠে গেছে বড়বৌদি মালতী আসার আগেই, বিয়ের দু বছরের মধ্যেই, যখন তাদের প্রথম মেয়ে বাব্লি জন্মেছে।

এরপর থেকে আসা যাওয়া আছে, ঐ পর্যন্ত।

একরাতও এসে থাকে না বড়বৌদি এ বাড়ীতে। শুধু ফুলদিকে দেখতে আসবে বলে আজ বড়দা এসেছে। পাত্রপক্ষর বাড়ী বড়দা নাকি গিয়ে অনুরোধ করে রাজী করিয়েছে, পাত্রর মা দেখতে আসবে।

অফিস থেকে একদম ভিজে ফিরল সোনাবৌদি। ঠাকুর একটু গরম গরম হালুয়া কর তো, চায়ের সঙ্গে খাব।

নিজের ঘর থেকে হেঁকে বলল সোনাবৌদি।

অনেক খাবার করা আছে তো। ঠাকুর একগাল হেসে জবাব দিল।

খাবার করা আছে? কেন?

বাবাঃ কি বলেন, সারাদিন কি বিশ্রাম করেছি একফোঁটা?

কেন? ব্যাপার কি?

বাঃ জানেন না দিদিমণিকে যে আজ দেখতে আসবে।

তাই নাকি?

সোনাবৌদি খুশীই হল খবরটা পেয়ে। কাকীমার ওপর রাগ তার বেড়ে গেল।

আমাকে তো বলাও হয়নি, ঠাকুরের মুখে শুনতে হ'ল।

নিজের মনেই গজগজ করল সোনাবৌদি।

তা হোক ঠাকুর তুমি একটু হালুয়া কর।

তা পারব না বৌদি।

ঠাকুর স্রেফ জবাব দিল।

এত রান্না বাকি ; এই সন্ধ্যেবেলায় কড়াই নামিয়ে হালুয়া করতে গেলে এই বৃষ্টিতে আটকে যাব যে। রাত হয়ে যাবে!

কতক্ষণ আর লাগবে, থাক দরকার নেই।

তবু রাগতে পারল না সোনাবৌদি, ওঁর সব থেকে রাগ মিতা অর্থাৎ ফুলদির ওপর।

একটা তবু সুসংবাদ। দেখতে পারে না মিতাকে। তবু এ খবরটা ভালই বলতে হবে।

গুন গুন করে গান আরম্ভ করল সোনাবৌদি। মিতার অনুপস্থিতির চিন্তা যেন তাকে উৎফুল্ল করে তুলল।

কি মনে করে আলমারি খুলে নিজের ময়ূর লকেট দেওয়া মুক্তোর মালাটা বার করল, তারপর সোজা কাকীমার ঘরে ঢুকে গেল মালাটা হাতে নিয়ে।

বিকেল বেলাই পাত্রের মা উপস্থিত হলেন। তার একটু পরেই সৌমিত্র।

সোনাবৌদির চোখ তো ঠিকরে পড়বার যোগাড়, পাত্রের মা আর সৌমিত্রর মা একই লোক দেখে। সৌমিত্রও কম অবাক নয়।

মা তুমি এখানে?

বারান্দায় ডাকল মাকে সৌমিত্র।

মা।

আমিই তো এখানে থাকব। তুই আজ এসেছিস কেন।

বাঃ আমি তো রোজই আসি এখানে। কিন্তু তুমি কি করে জানলে এদের।

ঐ তো মিতার দাদা এনেছেন আমাকে।

আমাকে বলনি কেন?

তুই তো ট্যুরে গিয়েছিলি। ফেরবার পর আর তোর সঙ্গে দেখা হ'ল কোথায়?

তাও তো বটে। তোমাদের আলাপ অবশ্য হওয়া দরকার। কতদিন ভেবেছি।

আলাপ কি রে পাগল? এবার তো আত্মীয়ই হব।

মানে ঠিক বুঝছি না ব্যাপারটা।

এ বাড়ীতে? কার জন্য?

আমার কটা ছেলে আছে?

আমার জন্য? না অসম্ভব।

অসম্ভব কি সমী? চ, ঘরের ভেতর চ। এতক্ষণ দুজনে কথা বলছি বারান্দায়, ওঁরা কি ভাববেন বলতো?

ভাববে আবার কি? গিন্নীতো মহাখুশী, হাবভাব দেখছ না? মত দিওনা যেন মা।

আচ্ছা সে হবে'খন, আগে মেয়ে দেখি, এক্ষুণি তো তোকে কেউ পিঁড়িতে বসাচ্ছে না।

কাকীমা সত্যিই খুশী।

মেয়ে তো ছেলের পছন্দ করাই, শুধু ছেলের মাকে নিয়মমত দেখিয়ে কথাটা পাকা করে নেওয়া।

সোনাবৌদি শুয়েই ছিল, সৌমিত্রকে দেখে ধড়মড় করে উঠে বসে কাপড়টা বদলে গোলাপী একটা কাপড় পরে দরজায় দাঁড়াল। অর্থহীন তবু সোনাবৌদি এমনিই করবে।

মালতী সামনে যায়নি।

কাকীমা বারণ করেছে বলে নয়, ওর নিজেরই কেমন লজ্জা করছে। অথচ সৌমিত্রর মায়ের স্নিগ্ধ চেহারা ওকে বারবার আকর্ষণ করছে, কি স্নেহময়ী শান্ত চেহারা, চওড়া সিঁদুর জলজল করছে। নিজের শৈশবে হারান, প্রায় ভুলে যাওয়া মাকে মনে পড়ছে, ইচ্ছে হচ্ছে কাছে যায়, প্রণাম করে কিন্তু—কিন্তু পারেনি, তার এমন করা স্বভাব নয় বলে।

রান্নাঘরের পাশের ঝিলিমিলি দেওয়া বারান্দায় দাঁড়িয়ে তারাভরা আকাশের দিকে দৃষ্টি মেলে দিল সে। বৃষ্টি থেমে গেছে, বর্ষণ শেষের আকাশ যেন আবার নতুন করে নিজেকে বিস্তৃত করে দিয়েছে, আর সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কেমন উদাস হয়ে গেল মালতীর মন।

আজ তার কাজের ছুটি।

কাকীমার নির্দেশমত দুপুর থাকতেই ঠাকুরের সাহায্যে খাবার তৈরীর পর্ব চুকিয়ে ফেলেছে। এখন শুধু চপগুলো ঠাকুর গরম ভেজে দেবে। ওরাই সব পরিবেশন করবে, তাই আজ মালতীকে পরিবেশনের সময়ও দরকার নেই। আজ মালতীর ছুটি। পরিপূর্ণ বিশ্রাম।

ছোড়দাও নেই কলকাতায়। অফিসের কাজে কদিনের জন্য বম্বে গেছে, রাঙাদা ফেরেনি, এত তাড়াতাড়ি রাঙাদা ফেরে না। বাড়ী নিস্তব্ধ।

কাকীমার চেঁচামেচি নেই, হাঁকডাক নেই। শুধু কাকীমার শোবার ঘর থেকে হাসির কথা, আর মিঠুর চীৎকার করা কথার টুকরো ভেসে আসছে।

কাকীমা নড়তে পারে না বলে কাকীমার শোবার ঘরে ব্যবস্থা হয়েছে। সব লোক সেখানেই। সব মানে অবশ্য সৌমিত্র আর তার মা, আর শ্যাম-বাজার থেকে আসা বড়দা—বাড়ীর বড় ছেলে, যে নাকি বিয়ে করে বৌ-এর পরামর্শে পর হয়ে গেছে।

সোনাবৌদির সেই অদ্ভুত মাথা ধরাটা বুঝি আবার আরম্ভ হল।

কিছুক্ষণ শুয়েছিল সোনাবৌদি আবার অন্ধকারে নিজের ঘরে, তারপর উঠে এসে কাকীমার ঘরের পাশের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকল। বারান্দাটা একেবারে অন্ধকার। ওখানকার বাল্বটা কেটে যাওয়ার পর কেউ নতুন বাল্ব দেয়নি সেখানে।

মালতী জানে সোনাবৌদি এই অন্ধকার বারান্দাই বেশী পছন্দ করে। ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু সৌমিত্রকেই দেখবে। সোনাবৌদি এমনই করবে। নিরর্থক জেনেও সৌমিত্রকে দেখবে, তাকে কাছে টানতে চেষ্টা করবে আর ফুলদিকে হিংসে করবে। নিরর্থক তো বটেই, সেদিনের সিনেমার টিকিট দুটো ইচ্ছে করেই সোনাবৌদি ব্যাগে রেখে দিয়েছিল যাতে মালতী দেখতে

হঠাৎ পাওয়া গান।

পায়, ছোড়দা পরে বলেছে সোনাবৌদি আর অফিসের মেয়ে গিয়েছিল। পুরুষ বন্ধু জোটে নাকি সোনাবৌদির।

মালতী এ সব নিয়ে কিছু ভাবেনি। ওর কি দরকার? সৌমিত্র গেলেই বা কি করত? ও এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। ও তো ভালভাবেই জানে সোনাবৌদি মালতীকেও হিংসা করে, মালতীর রূপকে।

অনেকবার নিজের দিকে তাকিয়ে দেখছে মালতী, সে যে সুন্দর একথা ঠিক, কিন্তু তাতে কি হোল? মুগ্ধদৃষ্টি কি সে দেখেনি। হোসেন সাহেবের বড়ছেলের চোখে? কিন্তু তাতে ও কুণ্ঠিত হয়নি। সে দৃষ্টিতে শ্রদ্ধা মেশান ছিল। সোনাবৌদি তার দিকে জানি কেমন করে তাকায়। অস্বস্তি বোধ করে ও।

হঠাৎ কাকীমার ঘর থেকে গান ভেসে এল।

ফুলদি গান আরম্ভ করেছে।

সৌমিত্রর মার কাছে সব গুণপনা দেখাতে হবে তো।

পাশে কার নিঃশ্বাস।

সৌমিত্র।

প্রায় চমকে উঠল মালতী। সঙ্গে সঙ্গে ওধার থেকে নিঃশব্দে চলে আসা সোনাবৌদিও?

তুমি যে এখানে?

কেন? তোমরাও তো এখানে।

বাঃ ঘরে অমন গান হচ্ছে, আমাদের জন্য তো নয়।

এখান থেকেও তো গান শোনা যায়।

যায় কিন্তু প্রয়োজন কি?

অনেকক্ষণ স্মোক করিনি।

ও।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সোনাবৌদি। মালতী যে এখানে?

মালতীর কাছে সরে এল সৌমিত্র।

কাজ নেই কোন? তোমাকে তো কাজ ছাড়া বিশেষ দেখি না।

আজ ছুটি।

কিসের ছুটি ?

এমনিই।

সৌমিত্র শোন।

অন্ধকার থেকে আলোর কাছে সরে এল সোনাবৌদি। ঘরের আর সিঁড়ির ঝকমকে আলোর রেখা বারান্দাতেও এসে পড়েছে।

সৌমিত্র সিগারেটটায় একটা জোরে টান দিল তারপর বলল

কি বল না, শুনতে পাচ্ছি।

মালতীর দিকে তাকাল সোনাবৌদি। আর অন্ধকারেও বেশ বুঝতে পারল মালতী সে চোখ দুটো জ্বলছে। ও তাড়াতাড়ি নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াল।

মালতী যেও না।

না যাক না।

সোনাবৌদি সৌমিত্রর হাত ধরে টানল।

শোন একটা কথা।

বল, প্রস্তুত আছি।

তুমি কি মিতাকে বিয়ে করবে নাকি ?

কি মনে হয় তোমার ?

নিশ্চয়ই তাই। তা না হলে ঘটা করে ওকে দেখতে আসো নাকি ?

আমি ঘটা করে দেখতে এসেছি ? কে বলল ?

কে আবার বলবে, এমন ফুলবাবু সেজে মাকে নিয়ে দেখতে আসনি ?

এত যখন লক্ষ্য করেছ, এটুকুও বোধহয় তোমার দৃষ্টি এড়ায়নি যে মাকে এখানে দেখে তোমার মতই আমিও অবাক হয়ে গেছি, বরং বলা যায় তোমার থেকেও বেশী।

তাহলে মাকে ঐখানে বসিয়ে রেখে গান শোনাচ্ছ কেন ? নিয়ে যেতে পার না ? আর মেয়ে নেই ?

সেটা ভদ্রতা হবে না বলে। তাছাড়া আমার উদ্দেশ্য তা নয়।

কিসের উদ্দেশ্য ?

আছে, ক্রমশ প্রকাশ্য।

সৌমিত্র এভাবে তুমি আমাকে যন্ত্রণা দিতে পার না।

কি ভাবে? মিতা মেয়ে তো ভালই।

জালিও না। মিতার মত মেয়েকে তোমার পছন্দ হ'তে পারে না।

তাহলে হয়নি।

ধোঁয়ার রিং ছাড়তে লাগল সৌমিত্র।

সমীদা, মা ডাকছে।

মিঠু এসে না ডাকা পর্যন্ত সৌমিত্রর কাছে দাঁড়িয়ে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলেছে সোনাবৌদি।

ঘরের ভেতর ততক্ষণে আর একটা গান ধরল মিতা। এত রাগের ভেতরও আরাম পেল এই ভেবে যে মিতার গানের মাঝখানে উঠে চলে আসায় সৌমিত্র স্পষ্ট অবজ্ঞা দেখিয়েছে বলে।

সোনাবৌদি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল তারপর কি মনে করে ঘরের ভেতর ঢুকে হঠাৎ দুহাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলল।

এরও অনেকক্ষণ বাদে মালতী আবার এসে দাঁড়াল বারান্দায়।

এ ঘরে গান, ওঘরে কান্না, দুটো শব্দই মালতীর কানে যাচ্ছিল, কিন্তু কিছুই যেন ওকে স্পর্শ করছিল না।

মালতী দেয়ালে মাথাটা হেলিয়ে তারাভরা আকাশের দিকে তাকাল। জগতে আনন্দ দুঃখ সবই আছে। শুধু যেন যার জন্য যেটুকু মাপা, আগে থাকতে ঠিক করা।

তাই কি?

ভাল করে ভাবতে চেষ্টা করল মালতী, তা না হলে তার নদীর মত অমন প্রবহমান জীবনে এমন বিবর্ণতা আসবে কেন? দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল মালতীর। সে ভালবাসা চায়, হৃদয়ের উত্তাপ সান্নিধ্য, ভালবাসা পেয়ে সে পূর্ণ হোতে চায়, ভালবেসেও বটে, কাকে ভালবাসবে সে? হঠাৎ নিজের মনেই চমকে উঠল সে। না এ কথা সে কল্পনাতেও আনবে না। জীবনে আজ তার কিছুই নেই, তবু এ রিক্ততা ভাল। অসম্ভব কখনও সম্ভব হতে পারে না। এ কল্পনা করাও অসম্ভব। দুহাতে মুখ ঢাকল মালতী।

মালতী!

চমকে উঠে মুখ তুলল মালতী। সৌমিত্র।

মালতী! কি হয়েছে?

কিছু না?

ক্লান্ত?

হ্যাঁ।

তাহলে কাঁদছ কেন?

কাঁদছি না তো।

ধরা গলায় মালতী উত্তর দিল।

তোমার ঘরে যাও কথা আছে।

না না, দয়া করুন আমাকে।

মালতী প্রায় ছুটে চলে গেল।

সৌমিত্র কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, তারপর ঘরে ঢুকে এল।

ততক্ষণে বিভাবতীকে বার কয়েক প্রণাম করে মিতা নিজের নম্রতা প্রকাশ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি।

আপনি দিন স্থির করুন।

কাকীমা আবার বললেন।

ছেলের সঙ্গে কথা না বলে?

ছেলের মন কি আমার অজানা?

না তা নয়, তবু আমার ছেলে তো এ সব আগে জানত না।

মা থাকতে ছেলের মতামতের আবার মূল্য আছে নাকি?

না না তাকি হয়, ছেলেরা বড় হয়েছে, তবে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, মিতা তো অপছন্দের মেয়ে নয়, এমনি নম্র মেয়েই আমি পছন্দ করি। সমী কোথায়?

আমি দেখছি।

এক ছুটে বেরিয়ে গেল মিঠু।

কোথায় যাচ্ছিস?

কাকীমা ডাক দিলেন।

লতাদির ঘরে।

সেখানে কেন ?

সমীদা তো সেখানেই গেল।

লতার ঘরে ?

এর থেকে অবাক হবার আর কি আছে ? রীতিমত নাটকের মত লাগছে যেন ফুলদির।

লতা কে ?

সৌমিত্রর মা বিভাবতী অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন।

আমাদের আশ্রিতা একটি মেয়ে।

ফুলদিই আগে বলল।

আমার সম্পর্কে ভাসুরঝি।

তাকে তো দেখলাম না।

তিনি নিজেই দেখা দেবেন। তো সৌমিত্রকে কি ছুতোয় ডেকে নিয়ে গেছে।

ও যা জাঁহাবাজ মেয়ে।

নাক কুঁচকে মিতা বলল। আর বিভাবতী অবাক হয়ে গেলেন, একটু আগের দেখা সেই স্বল্পভাষিণী মিতার সঙ্গে এর পার্থক্য দেখে।

কেন মেয়েটি বুঝি জাঁহাবাজ—

কথা শেষ হলো না, সৌমিত্র ফিরে এল গম্ভীর মুখে।

কোথায় ছিলি ?

কোথায় ছিলে বাবা ?

লতার ঘরে।

সেখানে কি দরকার ?

কাকীমা প্রায় ঝাঁপিয়ে উঠলেন।

দেখেছ মা ?

ফুলদি ঠোঁট ফোলাল।

আমার দরকার ছিল। চল মা। আজ যাই।

বলে যাও কি দরকার।

কাকীমা শক্ত হলেন।

এখন আর সে সবে প্রয়োজন নেই।

তার মানে? লতা আবার কি মন্তর দিল?

ও কি মন্তর দেবার মেয়ে?

কি হোল তাই বলতো।

বিভাবতী আর থাকতে পারলেন না।

তোমায় বলব বৈকি মা। চল।

না আমাদেরও বল।

বেশ, ভেবেছিলাম বলে আপনাদের আঘাত দেব না। আমি লতার কাছে প্রস্তাব করেছিলাম।

কিসের প্রস্তাব?

বিবাহের।

বল কি?

কাকীমা চোখ কপালে তুললেন।

মা!

প্রায় আর্তনাদ করে সোফায় বসে পড়ল মিতা। ততক্ষণে সোনাবৌও এসে দাঁড়িয়েছে।

নিজেকে একটা নাটকের হিরোর মত মনে হচ্ছে। চল মা।

না, নাটক করবে আর সব চাপা দিলে তো চলবে না, এ সবের মানে কি? এ কি বাড়াবাড়ি?

বাড়াবাড়ি আমার?

নিশ্চয়ই। আমার মেয়েকে বিয়ে করবে বলে, লতাকে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার মানে?

আপনার মেয়েকে বিবাহ করব কোনদিন বলিনি আর...।

কথায় বলনি, কাজে তো প্রকাশ করেছ।

না তাও না, তবে শুনে রাখুন, লতা আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন।

আমার মাথা কেমন করছে, বাড়ী চল্ মমী।

চল মা। আমি যাই। মনকে প্রস্তুত করতে পারলে আবার আসব।

তার দরকার নেই, ওসব মনে এক, মুখে এক ছেলের সঙ্গে আমি মেয়ের বিয়ে দিইনা।

ধন্যবাদ।

ওরা বেরিয়ে গিয়ে গাড়ীতে উঠল।

গাড়ী যখন বড রাস্তায় এসে পড়ল বিভাবতী আস্তে আস্তে ছেলের হাত নিজের হাতে নিলেন।

কি ব্যাপার সমী।

কিছু না মা, কিন্তু লতার তুলনা হয় না।

আমাকে দেখালি না কেন ?

দেখাব তো ভেবেছিলাম। কিন্তু লতাই তো সব ভেস্তে দিলে।

এমন ছেলে পাবে কোথায় ?

না মা, ও কারও দয়া চায় না। অন্তত আমার কাছে।

দুহাত দিয়ে মুখ ঢাকল সৌমিত্র।

তা হোক, গাড়ী ফেরা।

ড্রাইভারকে গাড়ী ফেরাবার নির্দেশ দিলেন বিভাবতী।

তখন ঝমঝম করে বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেছে।

মালতী লতা

বাইরে বেরোবার আগে একবার হাত বাড়িয়ে দেখে নিলেন অবিনাশ-বাবু।

—না ছাতাটা নেওয়াই ভাল, বোধহয় বৃষ্টি হবে।

—আমি তো বারবার বললাম ছাতা নাও, তা সে কথা কি মনে ধরে?

দরমা ঘেরা ভেতরের রোয়াকের রান্নাঘর থেকে স্ত্রী কিরণশশী ঝাঁজিয়ে উঠলেন।

—মনে ধরার কি আছে? এই ভিড়ে ট্রামে বাসে ওঠাই যায় না, এর ভেতর আবার ছাতা বাক্স সঙ্গে নিলে উঠতেই দেবে না বাসে।

—না দেবে না, তোমার যত ছুতো। সব কাজেই তো তাই, যেমন ভাল পাত্র পাচ্ছ না, এই ছুতোয় মেয়েটার বিয়ে দিচ্ছ না।

—পাচ্ছি না তো বটেই, না কি মিথ্যে বলছি।

—সত্যি মিথ্যে জানি না। ঘরে চব্বিশ বছরের মেয়ে ধিঙ্গী করে বসিয়ে রাখ, আমার কি? গলা দিয়ে ভাত গলছে কি করে তাই ভাবি।

চুপ করে থাকলেন অবিনাশবাবু।

চুপচাপ থাকাই তাঁর স্বভাব।

বিশেষ করে এসব ক্ষেত্রে স্ত্রী কিরণশশী রঙ্গমঞ্চে থাকলে, বরাবর তিনি বোবার অভিনয় করাই যুক্তিযুক্ত মনে করেন। স্ত্রীর কাছে তাঁর চিরদিনের হার

ইংরেজীতে দুর্ধর্ষ এম-এ হয়েও তাঁর ভাগ্যে 'সনাতন বিদ্যাভবনের' স্কুল টিচারী ছাড়া আর কিছুই জোটে নি। তবুও তো বুড়ো বয়সে এ্যাসিষ্ট্যান্ট হেড মাষ্টারের পদটি পাওয়ায় স্ত্রী ও আত্মীয়দের কাছে কিছুটা সম্মান রাখা গেছে।

চিরজীবন অবিনাশবাবু লোকের কাছে অবজ্ঞা পেয়ে এসেছেন। বিশেষ করে শ্বশুরবাড়ীতে। বিয়ে হবার সময়ই নাকি শাশুড়ীর অমত ছিল, শুধু ভাল ছাত্র বলে শ্বশুর আগ্রহান্বিত ছিলেন। তখন তো তবু ভবিষ্যৎ সামনে বিছান ছিল। এখন তো সবই অতীত। এত বছর ধরে শেষ পর্যন্ত এ্যাসিষ্ট্যান্ট হেড মাষ্টার। শ্বশুরবাড়ীতে এ পদের মাইনের তুচ্ছতাই বড়। মর্যাদার কথা তাঁরা চিন্তাও করেন না।

তাঁর আর দুটি ভায়রাভাই দুজনেই বেশ লব্ধপ্রতিষ্ঠ। একজন উকিল, অন্যজন ব্যবসায়ী। যদিও সোজা আলোয় নয়, তবুও নানাভাবে তাদের মাসিক আয় প্রায়ই দুতিন হাজারের অঙ্ক ছাড়ায়।

তাই কম দামের প্রেজেন্ট দিয়েও তাদের বেশী সম্মান। আর মরে-পিটে বেশি দামের প্রেজেন্টেও তাঁর সম্মান নেই। অন্য দুটি বোনের কাছে স্ত্রী নাকি নীচু হয়ে থাকেন।

হবে না কেন?

হাজার টাকা খরচ করেও তাঁরা তৃপ্ত নন। তাঁদের মত নিত্য নূতন গয়না কাপড় কেনার সখ মেটান তো কল্পনারও বাইরে কিরণশশীর। মেয়েটা বড় হয়েছে, ওর গায়ে দুখানা ভাল কাপড় গয়না দেবার সুযোগ হয় না।

তাঁর মত স্কুল টিচারের গৃহিণী হয়ে মাত্র চারশ টাকার মধ্যে সংসার চালান যে কত কঠিন তা শুধু কিরণশশী জানেন। বাপের বাড়ীতে তাঁর সম্মান নেই, পাড়ায় তিনি মাতব্বরগৃহিণী নন, মেয়ের কোন সাধ মেটে না, ছেলেটা মনমরা হয়ে ঘুরে বেড়ায়, সব রকমের অনুযোগে ঠাসা থাকে প্রতিটি মুহূর্ত। তবু নাকি তাঁর মনের জ্বালার শতাংশের একাংশ তিনি নেভাতে পারেন না।

তার ওপর বুকের ওপর বসে অত বড় ধিঙ্গী কালো মেয়ে প্রতিমা। ছোটবেলায় যাও বা দেখতে ছিল, নামটাকে উপহাস করেই বুঝি সে বড় বড়

হচ্ছে ততই যেন রংএর জৌলুষ বাড়ছে। শ্যামলা নয়, বেশ কালোই বলা চলে প্রতিমা।

অবিনাশবাবুর বুক থেকে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। তাঁর কপালে এই জীবন ছাড়া আর কিছু নেই।

এখন যেতে হবে সেই দারোগার বাড়ী।

যার বি-এ ফেল ছেলের সঙ্গে তাঁর এম-এ পাশ মেয়ের বিয়ে দেবার জন্য আজ একমাস হাঁটাহাঁটি করছেন তিনি। রং ফরসা হলেও না হয় তাঁরা নগদের পরিমাণ কিছু কম করতেন, কিন্তু মেয়ের রং যখন ময়লা, তখন চার হাজারের কম নগদ নেওয়ার কথা উঠতেই পারে না।

অবিনাশবাবু বারবার ভাবেন: সারা জীবন তিনি পড়াশুনা আর শিক্ষকতা করে কি পেলেন? ইউনিভার্সিটির একদা উজ্জ্বল রত্ন, প্রথম জীবনে নিজেকে স্কুল টীচার হিসেবে ভাবতে বেশ গৌরবই বোধ করতেন।

তারপর ধীরে ধীরে কখন নানা আঘাতে নিজের সম্বন্ধে সে মূল্যবোধ আপনা হোতেই কমে গেছে। নিজেকে উপেক্ষা আর অবহেলার পাত্র ভাবাই তাঁর কাছে স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিশেষ করে স্ত্রী কিরণশশী আর শ্বশুরবাড়ীর মতামত শুনলে তো মনে হয় তাঁর মত মূল্যহীন জীবনের কোন সার্থকতাই নেই।

তাঁর একমাত্র গর্ব তাঁর ছাত্ররা। এই তিরিশ বছরে তিনি কম করে পঞ্চাশ জন ছাত্রকেও মানুষ করতে পেরেছেন। যাঁরা তাঁর মুখ উজ্জ্বল করেছে। সেটুকুই তাঁর গর্ব।

স্ত্রীর কাছেও তখন তিনি বড় মুখ করে বলেন, যখনই খবরের কাগজে বা লোক মারফৎ তিনি কোন ছাত্রের কৃতিত্বের কথা জানতে পারেন।

খুব তো গর্ব করছ। জোটাতে পার না এমন একটি ছাত্রকে? ঘরে আইবুড়ো মেয়ে বসানো অথচ পরের ছেলের গর্বে তো বুক ফোলাচ্ছ।

পরের ছেলে বলছ ? ওরাই তো আমার ছেলে।

হ্যাঁ নিজের ছেলে গেল তল। সে বেচারা দিবারাত্রি হা চাকরি, জো চাকরি করে মরছে। বয়স কালে বিয়ে করতে পারছে না. আর তুমি এসেছ ফুটানি করতে।

ফুটানি কিসের, আমার আবার ফুটানি কিসের ? কিন্তু এতে আনন্দ হয় না ?

আনন্দর মাথায় আগুন। পরের ছেলের জন্য আনন্দ। নিজের মেয়ের বর জোটাতে তো হিমসিম খাচ্ছে।

সত্যি এমন একটা ছেলে যদি আমার প্রতিমার জন্য পেতাম।

ঘরে বসে থাকলে সব পাবে কি করে, তারা কি তোমার মেয়ের রূপের সুখ্যাতি শুনে বাড়ী বয়ে আসবে নাকি ?

বারবার ওকথা ব'ল না—প্রতিমা শুনতে পেলে মনে কষ্ট পাবে না ?

ওর আবার কষ্ট কি, ও কি জানেনা বাপ-মার বুকে কত বড় শেল বিঁধছে দিবারাত্র।

তাহোক ওকে কিছু ব'ল না।.........যাই আর দেরী করব না, বৃষ্টি আসবার আগেই রওনা নিই, ছাতাটা এনে দাও।

প্রতিমা তোর বাবাকে ছাতাটা এনে দে।

রান্নাঘরে ঢুকে সজোরে খুন্তি নাড়তে লাগলেন কিরণশশী।

দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যাও। দুগ্‌গা দুগ্‌গা।

অবিনাশবাবু হাঁক দিলেন।

কিরণশশী যেন নিজের মনেই বললেন,

আমারই হয়েছে মরণ।

বাস থেকে ঠেলাঠেলি করে নামামাত্র শুনতে পেলেন তিনি।

স্যার !

লালবাতি দেখে গাড়ী থামান ছিল। ওঁকে দেখে গাড়ীটা ব্যাক্ করে পাশের গলিতে ঢোকাল বরেন, তারপর নেমে এসে অবিনাশবাবুর পায়ের ধূলো নিল।

—ভাল আছেন স্যার ?

—হ্যাঁ বাবা ভালই, কিন্তু তোমাকে তো ঠিক......

—চিনতে পারছেন না স্যার। আমি বরেন।

—বরেন ? কোন বরেন ? কিছু মনে কোর না বাবা, আমি তোমায় ঠিক চিনতে পারছি না। মানে অত ছেলের ভেতর মনে রাখাটা......

—জানি স্যার, মনে করব কেন ? বছর বছর কত ছাত্র বেরিয়ে যাচ্ছে। চিনতে না পারারই কথা।

—না না আমি সত্যিই লজ্জিত, তোমরা ছাত্র, তোমাদের চিনব না এ কেমন কথা।

—আমি বরেন মজুমদার স্যার, উনিশশো তিপান্নতে স্কুল থেকে বেরিয়েছি।

—ও ভাল ভাল। ভাগ্যিস তুমি চিনতে পারলে।

—আপনাকে চিনব না স্যার ? কত বকুনি খেয়েছি আপনার কাছে। আমাকে আপনার মনে পড়বে সেই ঘটনায়।

কিসের ?

—সেই যে দুষ্টুমি করে সংস্কৃত পণ্ডিতের কাছে একটা দেশলাই চেয়েছিলাম ?

—ও ! কাজটা কিন্তু ভাল করনি।

ঘটনাটা মনে পড়তেই খারাপ লাগল অবিনাশবাবুর. বরাবরই দুষ্টুমিতে প্রথম ছিল এই বরেন। কিন্তু সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল যেদিন মজা ক'রে সাহস দেখাতে গিয়ে সে সংস্কৃত পণ্ডিতের কাছে বিড়ি খাবে বলে দেশলাই চেয়েছিল।

দুদিন ঘুমোতে পারেন নি তিনি, ছাত্রদের এমন অধোগতিতে।

গম্ভীর হলেন অবিনাশবাবু।

ভাবান্তর লক্ষ্য করল বরেন। তারপর হাসি মুখে বলল,

—আমি নিজেই লজ্জিত স্যার। এখন ও সব কথা, ঐ সব ছেলেমানুষি ভাবলেও লজ্জা লাগে। ক্লাশের ছেলেদের সামনে বাহাদুরি দেখাতে গিয়ে কত বোকার মত কাজ যে করেছি। এ জন্য ক্ষমা চাই স্যার।

—না না ক্ষমা কিসের ?

—আপনাদের ক্ষমা ছাড়া জীবনে তো চলাই যাবে না স্যার।

আবার পায়ের ধূলো নিল বরেন।

—বেঁচে থাক বাবা। তবু তোমরা আমাদের সম্মান দাও। কত বড় হয়েছ, তবু মনে রাখ, এটুকু স্বীকৃতি যে আছে তাই সম্বল করে বেঁচে থাকা। না হলে আমাদের মত ইস্কুল মাষ্টারের আর কি দাম বল ?

সে কি কথা স্যার, আপনাদের কাছে আমরা চিরদিনই সেই আছি। বাবার পরেই যাদের সম্মান করি, তারা হলেন শিক্ষক।

—শুনেও ভাল লাগে বাবা। এখন তো 'শিক্ষকদের সম্মান' কথাটাই উঠে গেছে। ছাত্ররা সব কাঁধে হাত দিতে চায়। যা দিনকাল পড়েছে।

—সত্যি স্যার দিনকাল যা পড়েছে মানুষকে সব ভুলিয়ে দেয়। পেটে খেতে পাচ্ছে না সব !

—হ্যাঁ বেকার সমস্যা তো দিন দিন বাড়ছে। আমার ছেলেটাই তো বসে আছে।

—কি পাশ স্যার ?

—বি-এ পাশ করেছে গত বছর। আর্টস কিনা, কোন জায়গায় চাকরী পাচ্ছে না। আমি তো টাইপ শিখতে বলেছি। রোজগার তো করতে হবে।

—যে তো ঠিকই স্যার। রোজগার তো করতেই হবে। পড়াশোনা করার সুযোগ তো আসে না সবাইয়ের কাছে।

—সেই তো বলি ছেলেটাকে। কম কষ্ট করে লেখাপড়া শিখিয়েছি তাকে। যাক—তুমি যাও বাবা কোথায় যাচ্ছিলে।

—সে আমি যাচ্ছি। আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন স্যার ? চলুন পৌঁছে দিয়ে আসি।

—না না গাড়ীর দরকার নেই বাবা, এক্ষুনি বাস এসে পড়বে। যাব বেহালায়।

—সে কি হয় ! আপনার সঙ্গে এতদিন বাদে দেখা, চলুন স্যার।

—তুমি যে বললে বাবা এই ঢের, কতটুকুই বা রাস্তা আর। বাসেই যাব।

—আবেগে গলা মোটা হয়ে এল অবিনাশবাবুর।

—তা হোক স্যার, গাড়ী যখন রয়েছে তখন কষ্ট করে বাসে যাবেন কেন? চলুন।

আর কথা না বাড়ানই ভাল বিবেচনা করে গাড়ীতে উঠে বসলেন অবিনাশবাবু।

গাড়ীতে বসে ওর দিকে ভাল করে তাকালেন অবিনাশবাবু।

দামী টেরিলিনের সার্ট আর গাঢ় রংএর প্যান্ট পরে দেখাচ্ছে বেশ বরেনকে। স্কুলে কেমন রোগা পটকা ছিল, এখন বেশ ভরে গেছে মুখটা। রুক্ষ চুল মাঝখানে সিঁথি কেটে দুভাগ করে দিয়েছে। বেশ দেখাচ্ছে।

সর্বাঙ্গে আভিজাত্যের চিহ্ন।

ভাল খেয়ে পরে থাকলে বোধহয় এমনটিই হয়। ওর ত্বক বেশ মসৃণ। ষ্টিয়ারিং'এ রাখা ত্বক মসৃণ কব্জিতে ঘড়ি-বাঁধা ওর হাতটার দিকে তাকালেন অবিনাশবাবু। প্রতিমা মেয়ে হলেও তার মুখের ত্বক ওর থেকে নিশ্চয়ই খসখসে।

এক দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল অবিনাশবাবুর বুক থেকে। এমন একটি ছেলে পাব না প্রতিমার জন্য। কি বিনয়, কি সৌজন্য।

—গাড়ীটা নতুন কিনেছ নাকি?

—না স্যার, আমার নয়। এক বন্ধুর। দরকার পড়লে নিই, ব্যবহার করি।

—বেশ আছ। তোমাদের জগতে আমাদের জগতের মত হিংসে টিংসে নেই। আমাদের চারপাশে যেন সব ছারপোকার দল, কেউ এক-কোঁটা উদারতা দেখানর কথা কল্পনাও করতে পারে না। অথচ তোমাদের দেখ, কত ভাল সব বন্ধু।

—হাঁ্যা ভাল। শা—

বলে একটু থামল বরেন তারপর আবার বলল,—এমনি কি আর দিচ্ছে স্যার? স্বার্থ আছে। বদলা নেবে এর। জোঁকের মত সবাই বুঝলেন। তাছাড়া সকলেরই তো দুঃসময় আছে। পরস্পরের সাহায্য ছাড়া চলবে কি ক'রে?

—সে তো ঠিকই বাবা, তবু আজকালকার দিনে যে যার নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত কিনা।

—বাড়ীটা কোথায়?

—বড় রাস্তার ওপরেই। বেহালা থানায়।

—থানায়? কেন?

—ভদ্রলোকের কোয়ার্টার্স যে ঐ ওখানেই।

...সেখানে কেন?

বরেনের গলাটা হঠাৎ বদলে গেল।

...কেন একথা জিজ্ঞেস করছ?

...এমনি! এখানে কার কাছে যাবেন?

...ঐ দারোগার কাছে।

...দারোগার কাছে যাবে, খোদ দারোগার কাছেই?

...হাঁ্যা ঐ দারোগার কাছেই যে কাজ।

...চুরির কেস নাকি?

...না অন্য কথাবার্তা আছে।

...কথাবার্তা? দারোগা আপনার বন্ধু নাকি?

...না বন্ধু কিসের?

...তাইতো ভাবছি স্যার, আপনার মত লোকের বন্ধু দারোগা হবে কেন?

...না না সব দারোগা তো খারাপ নয়। অবশ্য এঁকে আমি ভাল চিনি না। তবে, সবাই তো আর সত্যিই খারাপ নয়।

...হোতে পারে।

…অন্তত আমি তো সেই আশাই করছি। না হলে মেয়েটা আমার বহু কষ্ট পাবে।

…আপনার মেয়ে কষ্ট পাবে কেন ?

…ঐ দারোগার ছেলের সঙ্গেই যে আমার মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ করেছি। কত যে কষ্ট বাবা মেয়ে থাকার, তা তো কাউকে বোঝাতে পারব না। যার আছে সেই বোঝে।

…বিয়ে না দিলে কি হয় ?

…বল কি ? গিন্নী তো দুবেলা গাল দিচ্ছেন। এখন ভালয় ভালয় মেয়েটা পার হলে হয়।

…কি করে ছেলেটি ?

সেও তো পুলিশেই ঢুকেছে, কয়েক বছর হোল।

আর পাত্র পেলেন না ? পুলিশ ?

জানি বাবা, আমার নিজেরও পুলিশে মেয়ে দিতে ইচ্ছে নেই। কি করব বল, তোমাদের মত পাত্র পেলে তো এত ভাবতাম না। গিন্নী তো রাতদিন………

কথা শেষ না করতেই বাধা পেলেন।

—কি যে বলেন স্যার ! আপনারা ছাত্রদের স্নেহ করেন তাই ভাল বলেন নাহলে…

—না না বাবা তোমরা সত্যিই আমাদের আনন্দ। মাস্টারের জীবনে আর কি আছে ? তোমাদের মত কৃতী ছাত্র দেখাও সৌভাগ্য। তোমার ঠিকানাটা কি ?

পকেট থেকে নোট বই বার করে ঠিকানা লিখতে গেলেন অবিনাশ-বাবু। ওঁর মনিব্যাগটা পড়ে গেল সীটের ওপর। বরেন সেটা দেখতে পেয়ে বাঁ হাতে তুলে নিয়ে ওঁকে দিয়ে বলল,

স্যার আপনি সেরকম ভুলোই আছেন। বাসে ট্রামে যাতায়াত করেন অথচ মনিব্যাগ ঠিক করে রাখেন না। এই নিন, পড়ে গিয়েছিল।

—ওঃ দেখ, কি যে করি, কতবার যে এমনি হারিয়েছে।

সাবধানে রাখবেন স্যার। পকেটমার যেতে পারে।

হঠাৎ গাওয়া গান।

—পকেট মারই হয়েছে। ওদের হাত এত সাফ, জান বুঝতেই পারবে না কখন পকেট তোমার খোয়া গেল।

বরেন কোন কথা না বলে গাড়ী চালাতে লাগল। তারপর কিছুক্ষণ বাদে আস্তে আস্তে বলল।

—আপনার কখনও পকেট মার গেলে বলবেন, আমি মাল ফেরৎ দেবার ব্যবস্থা করব।

কি করে? ওদের আড্ডা জান নাকি?

—খানিকটা। সবই তো জানতে হয় স্যার জীবনে।

—সে তো ঠিক কথাই বাবা। কত হুঁসিয়ার ছেলে তুমি, তবে পকেটমারের আড্ডা জানতো পুলিশে ধরিয়ে দাও না কেন?

—কি হবে বলুন। ওদেরও তো খেয়েপরে বাঁচতে হবে।

—না না তা'বলে পকেট মেরে? ভাবাও যায়না, আর কি জান এইসব পকেটমারেরা দিব্যি ভদ্রলোক সেজে থাকে। চিনতেও পারবে না কে পকেটমার, এমন মজা।

দূর থেকে থানা দেখা গেল। বাঁকটা ফিরলেই থানা। বরেন হঠাৎ গাড়ীর গতি কমিয়ে দিল।

—স্যার; আমি যদি আপনাকে এই মোড়ে নামিয়ে দিই তাহলে চলবে?

—বিলক্ষণ, আহা আমি তো সবটাই নিজে আসতে পারতাম, আমি তো বারণই করেছিলাম।...

অবিনাশবাবু রীতিমত কুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন।

—জানি স্যার আপনি বারণই করেছিলেন, তবে ভাবিনি আপনি এ বাড়িতে আসবেন।

—কেন? চেনো নাকি এঁকে?

—আমি চিনিনা, তবে উনি আমাকে ঠিকই চেনেন।

...সে আবার কি?

...হ্যাঁ স্যার লোকটা জাঁহা ধড়িবাজ। শালা, বলেই জীব কাটল বরেন।

...মাপ করবেন স্যার, লোকটার ওপর ঘেন্না ধরে গেছে।

হ্যাঁ আমিও শুনেছি লোকটা নাকি তেমন সুবিধার নয়। আমাকেই তো প্রায় প্রাণে মারছে। আচ্ছা এখানেই নামি তাহলে! একদিন এসো আমাদের বাড়ী।

...ঠিকানাটা কি স্যার, নিশ্চয়ই যাব।

—তেরোর সি নিতাই বসু লেন। মনে থাকবে তো?

—মনে থাকবে, আমি বাড়ীতে গিয়েই লিখে রাখব।

—এসো ঠিক বুঝলে; তোমাদের মত ছাত্রদের দেখলেও আনন্দ হয়। তোমরা আমার গর্ব। গিন্নীকেও দেখাব।

হঠাৎ নীল হয়ে গেল বরেনের মুখ। ও গাড়ী থেকে নেমে দাঁড়াল অবিনাশবাবুর সঙ্গে। তারপর আস্তে আস্তে বলল,

না স্যার বেশী বলছেন, আমি—

—বিলক্ষণ, একটুও বেশী বলছি না, এসো ঠিক বুঝলে? অফিস ফেরৎ একদিন চলে এসো।

—আমার ঠিক অফিস নয় স্যার।

—তাহলে কি ব্যবসা? তাহলে তো আরও ভাল, তোমার সময়মত তুমি চলে আসবে। এতো আর কাউকে বলে আসতে হবে না। স্বাধীন ব্যবসা।

—ঠিক তা নয় স্যার, আমার কাজ তো সারাক্ষণই। এমন কি রাতেও ছুটি নেই।

—তাই নাকি? তা হলে ভারী খাটুনি।

খাটুনি?

একটু দ্বিধা করল বরেন। তারপর আস্তে আস্তে বলল...

—খাটুনি যত না, রিসক তার থেকে বেশী, তাছাড়া ভারী আন-সারটেন।

—রিসক্ তো জীবনে আছেই, তবে যদি আন্‌সারটেন তাহলে কেন এ ব্যবসা করছ? কিসের ব্যবসা তোমার?

একটু ইতস্তত করল বরেন। ওর মুখের পেশীগুলো কেমন যেন বেঁকা

হয়ে গেল। কণ্ঠে কোন একটা আবেগ দমন করতে চাইল যেন. তারপর হঠাৎ বলে উঠল ,

—স্যার আপনার আশীর্বাদে আয় মন্দ হয় না। তবে···

···তাতে আর কি ? ব্যবসা যখন ভাল আয় দেয়, ভাল ব্যবসাতে আছ, তখন আর চিন্তা কিসের ?

গম্ভীর হয়ে গেল বরেন। তারপর অবিনাশবাবুর পায়ের ধূলো নিতে নিতে যেন মরিয়া হয়েই বলেই ফেলল...

স্যার আমি···আমি স্যার···ওদেরই দলে।

...কাদের ?

ঐ মনি ব্যাগের কথা বলছিলাম না ?

...হ্যাঁ তা কি ?

···আমিও ওদেরই একজন।

···বল কি ?

প্রায় টলে পড়ে যাচ্ছিলেন অবিনাশবাবু।

···আজ্ঞে হাঁ; এ ছাড়া আর কোন পথ পেলাম না...চলি স্যার।

ক্লান্ত পায়ে গাড়ীতে উঠে ষ্টার্ট দিল বরেন মজুমদার; আর ওর অপসৃয়মান গাড়ীর দিকে তাকাতে তাকাতে কেমন একটা আচ্ছন্নতা মধ্যে নিমগ্ন হয়ে গেলেন অবিনাশবাবু।

কখন আস্তে আস্তে তাঁর পাঞ্জাবী ভিজে গেছে খেয়াল নেই।

বৃষ্টি তখন বেশ জোরে নেমেছে।

চোরাবালি

ঘরে ঢুকেই ওকে দেখতে পেল প্রশান্ত।

দু'দিন আগেই রায় বেরিয়ে গেছে। একটা ক্লান্তিকর ব্যাপারের নিশ্চিন্ত নিস্পত্তি ঘটানো হয়েছে। গত তিন-চার দিন ভাল ক'রে খেতেও পারেনি।

যতবার ফোন বেজেছে, সে-ও ভয়েভয়েই থেকেছে। কাজলের গলা সে আর শুনতে চায় না। অথচ প্রতিটি মুহূর্তে সে যেন সমস্ত মন দিয়ে প্রতীক্ষা করেছে ঐ গলা আর একবার শোনবার।

সবে সন্ধ্যে হয়েছে।

এই গলিটায় অন্ধকার যেন আরও জমাট বেঁধে বসে। রাস্তার বাতির ঠিকরে-পড়া আলো এসে পড়েছে প্রশান্তর বসার ঘরেও। সেই প্রায়ান্ধকার ঘরে ঢুকেই কাজলকে সে দেখতে পেল।

...তুমি? কতক্ষণ?

চমকানো ভাব গোপন রেখে সহজ হ'তে চাইলো প্রশান্ত। যেন কিছুই হয়নি। যেন যা হবার তাই হয়েছে।

প্রশান্তর দিকে তাকিয়ে অল্প একটু হাসলো কাজল। কেমন করুণ অথচ নির্মম হাসি। বাঁ গালের ওপর এসে পড়েছে এক টুকরো ফিকে মরা আলো। প্রশান্ত তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো আর ভাবলো। ক্লান্ত অথচ সহজ ভঙ্গীতে প্রশান্ত ঘরের মধ্যে এগিয়ে গেল। হাতের বইগুলো টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে বললো, এখনও কোলকাতায় আছ?

..হ্যাঁ, আজকের দিনটা। কালই যাচ্ছি।

...কাল ?

...হ্যাঁ ভোরের প্লেনেই ।

...ও !

আর কি কথা বলা যায় ? দু'জনেই সেকথা ভাবলো । আর নিতান্ত অপরিচিতের মতো চুপ ক'রে বসে থাকলো । অথচ, নিশ্চয়ই কোনো প্রয়োজনে কাজল এখানে এসেছে ।

এই তীক্ষ্ণ নীরবতা অসহ্য !

ও-পাশের জানলার খড়খড়িটাও অধৈর্য হ'য়ে শব্দ ক'রে নড়ছে । ওটা বরাবরই আল্‌গা । কোথায় যেন একটা বোবা সুর গুমরে-গুমরে উঠছে । পাথরে চাপা পড়েছে ঝর্ণার ক্ষীণ জলের ধারা । অথচ মাথার ওপর পাখাটা তেমনি ঘুরছে । ঘুরছে কি ঘুরছে না, বোঝাই যায় না । যেন নিশি-পাওয়ার মতো একটা ঝিম-ধরা ঘোলাটে অনুভূতিতে ওটা দুলছে, টলছে আর থেকে-থেকে যেন গঙিয়ে উঠছে যন্ত্রণার ছড় টেনে-টেনে ।

নাঃ, এই জমাট স্তব্ধতা ভাঙা দরকার । দু'জনেরই মনে হ'ল কথাটা । অথচ কথা আরম্ভ করাটাই যে একটা সমস্যা ।

···যাক্‌, এতদিনে শেষ হ'ল ।

নিতান্ত বোকার মতো কথাটা ব'লে ফেলে যেন হাঁফ ছাড়লো প্রশান্ত । যদিও এমন একটা প্রসঙ্গে আসতে তার ইচ্ছে ছিল না একেবারেই ।

প্রশান্তর মুখের দিকে একবার আবছা তাকালো কাজল । তারপর নেহাৎ-ই বলার জন্যে যেন বললো,

হ্যাঁ এতদিনে...

কথাটা শেষ না করে নিজের হাতব্যাগটা নাড়াচাড়া করতে লাগলো সে । একটু পরে অপ্রস্তুতের ভাবটা ঝেড়ে ফেললো কাজল । মনের কোণে কোথায় যেন কিসের একটা অদৃশ্য দেয়াল আছে । কত রৌদ্র-বৃষ্টি-ঝড়ে গায়ে তার লোনা ধ'রে গেছে । ঝুরঝুর ক'রে একরাশ বালি ঝ'রে পড়লো ।

পিঠটা টানটান ক'রে বসলো কাজল ।

—মানে, কালই তো যাচ্ছি······

—ও !

আবার যেন কথাটা নতুন ক'রে শুনলো প্রশান্ত। তারপর চেয়ারে সোজা হ'য়ে ব'সে পা নাচাতে লাগলো। হঠাৎ তার মনে হ'ল পা নাচানো কাজল রীতিমতো অপছন্দ করে। এখন অবশ্য ওর পছন্দ অপছন্দয় কিছু আসে যায় না। তবু একটু বাদেই পা নাচানো বন্ধ ক'রে কাজলের দিকে তাকালো প্রশান্ত।

সেই রকম ক'রেই আজও কাজল চুল বেঁধেছে, যেমন বরাবর বাঁধে। সেই যেমন ক'রে সামনের কিছু ছোট চুল কানের 'পরে আলগা ক'রে ঝুলিয়ে দেয়, ঠিক তেমনি। সামনের অল্প দৈর্ঘের সিঁথি মাথার মাঝখানে গিয়ে হারিয়ে গেছে। ওর ধনুকের মতো বাঁকা ভুরু তেমনি টানটান হ'য়ে আছে। ওর কমলালেবুর মতো ঠোঁট, অরেঞ্জ লিপস্টিকে আরও যেন টস্‌টস্ করছে।

ফ্রস্টেড্ অরেঞ্জ লিপস্টিক দারুণ ভালোবাসে কাজল।

ঐ দেহকে প্রাশন্ত চেনে।

ঐ দেহের প্রতিটি লোমকূপ তার চেনা। অনাদিকাল থেকে চেনা। এমন কি, কাজলের অমন উঁচু ক'রে বাঁধা চুলের তলায় ঘাড়ের বাঁ কোণে ছোট্ট কালো তিনটি পর্যন্ত। সেখানে সে কতোবার ডুবে গেছে, আবার ভেসে উঠেছে। তার ঝঞ্ঝা-ক্ষুব্ধ সমুদ্রের শান্ত বাতিঘর।

অথচ ঐ দেহধারিণী আজ যেন নিতান্ত অপরিচিতার মতো দূরে ভদ্র ব্যবধান রেখে ব'সে আছে।

প্রশান্তর একবার মনে হ'ল জিজ্ঞেস করে, কেন এসেছে কাজল। এতদিন পরে, এত লোক থাকতে তার কাছেই বা কেন এসেছে। বিশেষ ক'রে কাল ভোরের প্লেনেই যদি চ'লে যাবে, তাহলে সে তার কাছে এসে কেন ব'সে আছে আজকের এই আগুন-রাঙা চৈত্রের সন্ধ্যায়?

একটু পরে কাজলই নীরবতা ভাঙলো।

—আমি এসেছিলাম, একটা কথা ছিল......।

সব কথা শেষ হবার পরেও কি আবার কথা থাকতে পারে, বিশেষ ক'রে তারই সঙ্গে? প্রশান্ত ভাবলো। ভেবে বিলক্ষণ বিরক্ত হ'ল।

—বলছিলাম কি,......

—হ্যাঁ, বলো।

এতক্ষণ কাজলের কথা ভাবলেও এইবার সে সোজা তার দিকে তাকালো।

ইচ্ছে করলে ঐ পাতলা দেহকে দু'হাতে টেনে নিয়ে নিজের বুকের সঙ্গে পিষে ফেলতে পারতো প্রশান্ত, অজস্র চুম্বনে মুছে দিতে পারতো ঐ টস্‌-টসে ঠোঁট দুটি থেকে সব লিপ্‌ষ্টিক।

কিন্তু আর তা হবার নয়।

ঐ অতিপরিচিত দেহ, ঐ বহু দিনরাত্রির সঙ্গিনী নারী—যার সঙ্গে ওর দশ বছরের সংসার, যে তার দুটি কন্যার জননী—তার সেই ঘরের 'বৌ' কাজলকে ও আর কোনদিনই তেমন ক'রে কাছে টানতে পারবে না।

কেননা আজ দু'দিন হ'ল তাদের ডিভোর্স মামলার রায় বেরিয়েছে।

দু'পক্ষই চেয়েছিলো এটা।

দীর্ঘ দু'বছর জুডিশিয়াল সেপারেশন। তারপর আরও দীর্ঘ দেড় বছর ডিভোর্স মামলা। অবশেষে এই নিস্পত্তি।

যেমন নিস্পত্তি, তেমনি নিষ্কৃতি।

আর এরই জন্যে দু'পক্ষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছে। প্রশান্ত দিন নিচ্ছে ভেবে. কাজল তো রীতিমত অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠেছিলো।

অথচ আস্তে-আস্তে কখন্ যেন তারা আবার অনেকটা সহজও হ'য়ে এসেছে। ফোনে কথা হয়েছে, মামলার ব্যাপারে পরস্পরকে তারা মতামত জানিয়েছে, আলোচনা করেছে মেয়েদের স্বাস্থ্য পড়াশোনা ইত্যাদি নিয়ে। এবং এভাবে কখন দেখতে দেখতে তাদের পারস্পারিক সম্পর্কের ভিতটা আরও সহজ হ'য়ে উঠেছে। যদিও আইনত তারা দু'জনই এখন এক দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধানে স'রে গেছে।

কিন্তু সবই ঠিক তেমনি আছে।

যেন কিছুই হয়নি। তবু যা হবার হ'য়ে গেছে।

দুজনেই সেটা বুঝে নিয়েছে, তাদের মাঝখানে এখন কিসের একটা গোপন দেয়াল। চোখে দেখা যায় না, কিন্তু বোঝা যায়......ঘুণ ধ'রে গেছে, থেকে-থেকে ঝুরঝুর ক'রে বালি ঝ'রে পড়ছে, যেমন ঝ'রে পড়ছে মুহূর্তগুলো।

—কথাটা ব'লে নিই, রাত হ'য়ে যাচ্ছে।

হাত-ঘড়িতে চোখ রাখলো কাজল। ঠিক এমনি ক'রেই ডানহাতে বাঁধা ঘড়ি দেখে ও সংসারের সব কাজ ক'রে যেতো, আর প্রশান্তর ফিরতে রাত হ'লে অনুযোগ করতো।

—হ্যাঁ, বলো।

বলেই অন্যমনস্ক উত্তেজনায় পা নাচাতে শুরু করলো প্রশান্ত। কেমন অস্বস্তি লাগছে। একটু ঝুঁকে টেবিলের ওপর থেকে একটা বই তুলে নিল সে।

—বলছিলাম, রিনি আর কণি তো এখন হস্টেলেই থাকবে, তাই না?

...তাছাড়া আর উপায় কি?

...উপায় ঠিকই ছিলো তবে তোমার তাতে মত নেই।

...থাকা সম্ভব নয়।

...নয়?

বেঁকা ক'রে অল্প একটু হাসলো কাজল। তারপর নড়বড়ে খড়খড়িটার দিকে তাকিয়ে বললো,

যাক, শেষ সিদ্ধান্তটা নিয়েই নিয়েছো। তাহলে কিন্তু গার্জেন হিসেবে আমার নাম দিতে চাই।

—কেন?

—কেন মানে? আমি ওদের আমার ইচ্ছে মতো আমার কাছে আনতে-নিতে পারবো, তাই। ওদের স্কুল বড়ো স্ট্রিক্‌ট্‌ কিনা।

—সেজন্যেই তো ঐ স্কুলে দেওয়া।

—তার মানে? কি জন্যে দিয়েছো, যাতে ওরা রিনিকণিকে আমার কাছে না আসতে দেয়?

কাজল হঠাৎ ঝাঁঝিয়ে উঠলো।

—না, তার জন্যে স্কুলের সাহায্য নেবার দরকার নেই। কোর্ট থেকেই তো সেই মর্মে নির্দেশ পেয়েছো।

—তা পেয়েছি। কিন্তু সে-তো মামুলি ফরম্যালিটিজ্!

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। এই যেমন, তোমাকে আমার মামলার সব খরচ দিতে হবে—এমন কথাও তো বলা আছে। কিন্তু তা কি আর সত্যিই দিতে হবে ?

—দিতে হবে না নাকি ?

প্রশান্তর গলায় পরিহাসের আভাস।

ও, ভুলেই গিয়েছিলাম, ইউ ডোণ্ট নীড্ এনি মানি—গোয়িং টু বি রীচ, ভেরী রীচ্ !

কাজল এবার স্পষ্ট বিরক্ত হ'ল।

প্লিজ, সেজন্যে না, টাকা-পয়সার কথা আর ওঠে না ; সেটা এক্ষেত্রে অবান্তর। কিন্তু জানোই তো, কনাইভেন্স প্রুভ্ড্ হ'লে বিপদে পড়তাম।

—কনাইভেন্সের তো প্রশ্নই ওঠে না।

—তবু জানো না, এসব আইনের ব্যাপার। তুমি কনটেষ্ট্ করলে না, এতে সন্দেহ হ'তে পারতো।

—সন্দেহ ! কার ?

—কার আবার, জজের। শুনেছি জজেরা এতে সন্দেহ করেন। আসলে বিবাহ বিচ্ছেদ আইন পাশ হলেই বা, আমাদের দেশ তো। পুরোন পন্থী অনেক জজ সহজে ডিভোর্স দিতে চাননা।

—এর ভেতরে আইন পরীক্ষা পাশ ক'রে ফেলেছো দেখছি !

—আমি পাশ করবো কেন, উকিলই আমাকে বলেছে।

এত বিরক্তি আর অস্বস্তির মধ্যেও প্রশান্তর হাসি পাচ্ছিলো। বললে,

আহা, এক্ষেত্রে ডিভোর্স না দিয়ে পারতেন নাকি জজসাহেব ? তোমার তো কোনো মুস্কিলই ছিলো না, যা সব চার্জ এনেছিলে আমার বিরুদ্ধে ! ডিভোর্স তো বটেই, আমাকে যে কেন জেলের বাইরে রেখেছে, তাই ভাবি।

—আমি দুঃখিত।

—না, না, দুঃখিত হবার কি আছে ? চার্জগুলো তো সব সত্যিই। শুধু লিখে জানানোতে নিজের কাছেই কেমন যেন সাংঘাতিক লাগে। তা না হ'লে কোনো মিথ্যে চার্জ তো তুমি আনোনি !

তা সত্যি, মিথ্যে কোনো চার্জ আনেনি কাজল। একথা ওর চাইতে ভালো আর কে জানে? তার বিবাহিত দশ দশটা বছরের কথা ভাবতে চায় না কাজল। প্রথম দু'এক বছর ছাড়া কী ছিলো তাদের দাম্পত্য সম্পর্কে? শুধু পরস্পরকে ঘৃণা ক'রে বেঁচে থাকা ছাড়া।

সেসব দৈনন্দিন গ্লানি-ভরা ক্লেদাক্ত দিনগুলোর কথা এখন মনে পড়লেও খারাপ লাগে কাজলের। এর জন্যে কে দায়ী—কেন আর কিভাবে দায়ী, সেই চুল-চেরা বিশ্লেষণেও লাভ নেই। যা হবার হ'য়ে গেছে।

কিন্তু তার চরম দণ্ড তো দু'জনকেই মাথা পেতে নিতে হ'ল, মেয়ে দুটো দোষ না ক'রেও শাস্তি পেলো, এখনও পাচ্ছে। তারা দু'জনে ঐ নিত্য নিত্য অশান্তির অক্টোপাশের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে বাঁচলো বটে, কিন্তু অসহায় মেয়ে দুটোর কথা ভাবলেও কষ্ট হয়।

একটু পরে প্রশান্ত জিজ্ঞেস করলো,

—আচ্ছা, তুমি কি ডায়েরি রাখতে নাকি?

—তার মানে?

কাজল অবাক না হ'য়ে পারলো না।

—নাহ'লে সব ডেট্‌গুলো পর্যন্ত মনে রাখলে কী ক'রে? কবে কী অত্যাচার করেছি, কে-কে আবার সেখানে ছিলো তারা আই-উইট্‌নেস্ করেছে—এই এতসব মনে রাখা কি সোজা কথা?

—আহা, ওসব তো এমনি লিখতে হয় তাই লেখা। নাহলে যে ডেফিনিট্ চার্জ আনার অসুবিধে।

কথাটা ব'লে বোঝাতে গিয়ে একটু লজ্জা পেলো কাজল।

—যাক্, লজ্জা পাবার কথা আমারই, আমি সত্যি দুঃখিত।

—কেন?

—দি ওয়ে আই বিহেভড্ উইথ ইউ, যদিও···যাক্‌গে, সেকথা এখন থাক্।

কাজল চুপ ক'রে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর আস্তে-আস্তে বললো,

হ্যাঁ, যে জন্যে আমি এসেছিলাম······

—তা বলো, বলো—বলেই ফেলো! হিসাব-নিকাস করতে যে আসনি, সে-তো অব্ভিয়াস্।

জোর ক'রে মুখর হবার চেষ্টা করলো প্রশান্ত।

নিজের স্ত্রী পর হ'য়ে যাওয়ার প্রথম সঙ্কোচ কাটাবার জন্যেই নাকি? কেমন যেন বোকা-বোকা মনে হ'ল নিজেকে। তাই প্রয়োজনের বেশি সহজ হবার জন্যে একটু আড়মোড়া ভেঙে চেয়ারে আবার সোজা হ'য়ে বসলো প্রশান্ত।

তার দিকে তাকিয়ে ধীরে শান্ত গলায় কাজল বললো,

আচ্ছা, লেট্ আস্ বি ফ্রেণ্ডস্।

—আমিও ঠিক এই কথাটাই ভাবছিলাম। বেশ, ফ্রেণ্ডস্! তবে তা হ'তে পারাট্টা এত সহজ কিনা, ভাবছি।

—কেন?

—একটু মুস্কিল আছে।

—কিসের মুস্কিল? আমি তো বেশ পেরেছি।

—সন্দেহ আছে।

—বিন্দুমাত্র না! এই তো, দরকার পড়লো, অমনি তোমার কাছে সোজা চ'লে এলাম, কোনো সঙ্কোচ না ক'রেই। তবে?

—হ্যাঁ, তা এসেছো। আর এ আমার সৌভাগ্যও বটে! তবে তোমার এত সহজ হবার একটা বড়ো কারণ আছে।

—না, কোনো কারণই নেই।

—আছে। এক মিনিট, চা খাবে?

—না, থ্যাঙ্কস্। কারণটা কী বলছিলে?

—থ্যাঙ্কস্! মানে, ধন্যবাদ দিলে?

—দিলাম-ই তো। তুমি চা অফার করলে, আর আমি ধন্যবাদ জানাবো না?

—তাই ব'লে আমাকে!

—তোমাকেই বা নয় কেন?

—ও! আমিও তো একজন নিতান্তই......

উত্তেজনায় কথাটা শেষ করতে পারলো না প্রশান্ত। কিন্তু কাজল তার কিছুই গায়ে মাখলো না। সে তবু আগের প্রসঙ্গের জের টানতে থাকে।

—কারণটার কথা কী বলছিলে যেন?

—বলছিলাম, তোমার মনে এখন তো আর আমার সম্বন্ধে কোনো... ...মানে, তুমি তো এখন আরেকজনকে...যাক!

—যাবে কেন? হ্যাঁ, আমি সেনকে ভালোবাসি।

—থাক, থাক......!

বেদনার্ত মুখে প্রশান্ত কোনো রকমে থামাতে চাইলো কাজলকে।

—না, থাকবেই বা কেন? শোনো তুমি। দেখো, এসব বিষয়ে ফাস্ করার কোনো অর্থ হয় না!......কিন্তু শুধু আমাকেই এ-কথা বলছো যে? তুমিও কি একজনকে ভালোবাসো না?

—আমি!···কাকে?

—কেন, পূরবীকে?

নামটা এভাবে মুখে আনতে চায়নি কাজল। আনতে বাধ্য হ'য়ে খুশি হ'ল না।

এতক্ষণ তবু যা-হোক আড়াল-আবডাল ছিলো। এখন একেবারে আকাশ জোড়া ফাঁকা খোলা মাঠে। তারা পরস্পরের মুখোমুখি হ'য়ে দাঁড়ালো। কোথায় আর কেন, কে-কার লক্ষ্য, সে তো তারা আগেই জেনে গেছে যে-যার মতো। এবারে শুধু সরাসরি আক্রমণ শুরু করার অপেক্ষা।

কিন্তু ইতিমধ্যে সময়ও যেন মরিয়া হ'য়ে উঠেছে। প্রশান্তর এই বদ্ধ ঘরের চারপাশে, পাখার হাওয়ার মধ্যে একটা বোবা সুর চাপা প'ড়ে ছটফট করছে।

কাজলের দিকে স্থির দৃষ্টিতে স্পষ্ট তাকালো প্রশান্ত। তারপর বললো, যেন স্বগতোক্তির মতো তার স্বীকারোক্তি:

হ্যাঁ পূরবী দেবীকে ভালোবাসি বটে, কিন্তু সেটাই সব নয়।

—সব নয়?

কাজল বিদ্রূপে তীক্ষ্ণ হ'ল।

—না!

—তার মানে? তুমি কি বলতে চাও, তোমার ঘনিষ্ঠ নও? সবাই তো জানে……

—জানে ঠিকই, কিন্তু সেটাই সব নয়।

—নাও, হেঁয়ালি রাখো!

—হেঁয়ালি নয়, সত্যি কথা। ওকে ভালোবাসি বটে…বাট্, ছাট্ ডাসন্ট্ ম্যাটার এট্ এল!

—বাঃ

—সত্যি কথাটা এই যে, এসব অধ্যায় আমার জীবনে শুধু একটা অ্যাফেয়ারই বলতে পারো, আর-কিছু নয়।

—অ্যাফেয়ার? এত ঘনিষ্ঠতার পরেও এটা তবে সামান্য একটা অ্যাফেয়ার?

ব্যাঙের হাসি হাসলো কাজল। ভুলে গেল সে কিজন্যে এসেছে। তবু উত্তেজনায় ঝলসে উঠলো,

—আমি তো এটা ভাবতেও পারি না।

—কেন, এ আর এমন কি অসম্ভব?

—কী বলছো তুমি! এত ভালোবাসা, এত কাণ্ড, রাজ্য শুদ্ধ লোক জানে। আর শেষকালে এটা কিনা শুধু মাত্র অ্যাফেয়ার?

—রাজ্য শুদ্ধ লোক জানলেই যে একটা অ্যাফেয়ার রাতারাতি জীবনের চরম সত্য হ'য়ে দাঁড়াবে, তার কোন অর্থ নেই।

—না, নেই!

কাজলের বুকটা জ্বালা করে উঠলো। প্রশান্ত তবু নিজের কথার জের টানে। তারও মুখ চোখ থম্‌থমে কঠিন হ'ল।

—ঠিক তাই। তুমি জানো না, একটা ভালোবাসা আমার কতো প্রয়োজন ছিলো।

—প্রয়োজন ছিলো বলেই কেউ ভালোবাসে নাকি? কি জানি, আমার তো মনে হয়, ছাট্ ইজ ট্রুথ্ ইন্ ওয়ান্‌স্ লাইফ!

—হতে পারে, কিন্তু সব ক্ষেত্রে নয়।

—অন্তত: এ ক্ষেত্রে তোমার হওয়াই উচিত। উঃ, আমি তো ভাবতেই পারছি না। এত ঘনিষ্ঠ হবার পরেও কী ক'রে, আই মীন্, ইউ স্পেন্ট নাইটস্ টুগ্যাদার?

...ইয়েস্, আই অ্যাডমিট্। কিন্তু সেটাও প্রয়োজন।

...ছি, আমার শুনতেও ঘেন্না হয়!

...উচিত নয়। তুমি তো পুরুষ নও, কী ক'রেই বা বুঝবে? মাঝে-মাঝে অবস্থার চাপে আমাদের এমন প্রয়োজন হয়।

...কী যা-তা বলছো?

...সত্যি, পুরুষের জীবনে এমন প্রয়োজনীয় ভালোবাসা থাকে যে তাকে আমরা এড়াতে পারি না সব সময়। আর এই ভালোবাসার প্রয়োজনও আসে লজ্জা থেকে।

...লজ্জা। হাসালে তুমি। লজ্জা আবার কিসের?

...নিজের কাছে নিজের লজ্জা। তুমি জানো না, তুমি আমার ছেড়ে যাওয়ার পর আমার যে কী অপমান আর কী লজ্জা, সীমা নেই। যে কোনো নীচ কাজ করেও বোধ হয় এত লজ্জা পেতাম না।

...কি জানি!

...কি জানি মানে? সত্যি, চরম সত্যি। তোমার কাছে পরিত্যক্ত হ'য়ে আমি লোক-সমাজে মুখ দেখাতে সঙ্কোচবোধ করেছি কিছুদিন। তখন কেবলই মনে হয়েছে, আমার কোনো মূল্য নেই। কে আমায় কাছে টেনে নেবে, আশ্রয় দেবে? সেদিক থেকে পূরবী দেবীর কাছে আমি ঋণী, আমি কৃতজ্ঞ।

কাজল চোখ নত ক'রেই থাকলো। তারপর অনেকক্ষণ বাদে আলগা স্বরে বললো,

কিন্তু পরিত্যক্ত ব'লে অপমানিত বোধ করার আগে একবারও কি তোমার মনে হয়নি যে. সবকিছু তোমারই সৃষ্টি? তোমার দোষেই এমনটা হল।

—মানি, আমার দোষেই হয়েছে। তবে তোমারও তো একটু হাত ছিলো।

—না, এক্ষেত্রে আমি শুধু সহ্যের সীমাকেই বিস্তৃত করে গেছি। তাই দশ বছর ঐ অসম্ভব অত্যাচারে কাটিয়েও...যাক, ওসব কথা এখন আর তুলেও বা কী হবে? যে কাজে এসেছিলাম, সেটাই বলি।

—বলো।

জানলা ছাড়িয়ে দূরে দৃষ্টি মেলে দিলো প্রশান্ত। বাইরে রাত আরও ঘন হ'য়ে উঠেছে। আবছা আঁধারে ভালো করে কিছু ঠাহর হয় না, কিন্তু বোঝা যায়। সবই ঠিক তেমনি আছে।

কাজল অসহিষ্ণু ছিলো আগেই, এবার অস্থির হয়ে উঠলো:

রিণি-কণিকে তাহলে দেবে না?

—দেবো না তো বলিনি!

—আবার কী করে বলবে? কিন্তু মেয়েদের জোর করে হস্টেলে পুরে রেখে আমাকে এভাবে শাস্তি দেওয়ার মানে?

...শাস্তি!

...হ্যাঁ, তাই-ই। এ যে কতো বড়ো শাস্তি, মা হলে বুঝতে।

...কিন্তু নিজেই তো লিখে দিয়েছো যে মেয়েদের তুমি চাও না... লেখোনি?

...লিখেছি সেও তোমার চাপে পড়ে। নইলে তুমি কন্‌টেস্ট্‌ করার ভয় দেখিয়েছিলে।

...ভয় দেখাইনি, সত্যিই কন্‌টেস্ট্‌ করতাম।

...কেন?

...ওদের ছেড়ে আমি থাকতে পারবো না, স্পষ্ট জেনে রাখো। সংসার তো গেল, ভেঙেই গেল; মেয়েদুটো না থাকলে আমি বাঁচবো কেমন করে?

...তাহলে আমিও বা কি করে বাঁচবো ওদের ছেড়ে?

...কেন ছেড়েই তো গ্যাছো, আর দিব্যিই তো বেঁচে আছো।

...উঃ, কি নিষ্ঠুর। তুমি এখনও ঠিক তেমনি আছো।

রাগে-কান্নায় গলা ভেঙে এলো কাজলের। নিজেকে ভারী অসহায় আর অপমানিত বোধ হ'ল।

...বা, এতে নিষ্ঠুরতার কী দেখলে ?

...আমি না ওদের মা। মায়ের কাছ থেকে সন্তানদের কেড়ে নিয়ে, সম্পত্তি হিসাবে নিজের কাছে রাখতে লজ্জা হ'ল না তোমার ?

...লজ্জা ? তা লজ্জা আবার কি। নেহাৎ দায়ে না পড়লে রাখতাম নাকি ? কত খরচ আর দায়-দায়িত্ব ওদের জন্যে, তা জানো ?

...বেশ, কতো টাকা চাও তুমি ? দেবো, সব দেবো। ওদের জন্যে তোমায় কিছু খরচ করতে হবে না, সবই আমি দেবো।

...তা তুমি তো ধনীর গৃহিনী হ'তে চলেছো, দিতে পারো বৈ কি।

...সে জন্যে না, আমি নিজে চাকরি করি না ?

...তা জানি। তবে এখন থেকে তো আর করবে না। তুমি দিল্লীতে, আর উনি কোলকাতায়...

...থাক, ও নিয়ে আর পরিহাস করতে হবে না। এখন স্পষ্ট বলো, মেয়েদের আমায় দেবে কিনা ?

...বলছি তো, না।

...এত সহজেই কথাটা বলতে পারলে ?

...না পারার কি আছে ?

...তোমার একবারও মনে হ'ল না, রিনি-কণিকে কত কষ্ট ক'রে মানুষ করেছি আমি ? কত রাত ওদের বুকে নিয়ে জেগে কাটিয়েছি। কোথায় ছিলে তুমি তখন ?

কাজল এবার কেঁদে ফেললো। চোখ ছাপিয়ে দরদর্ ক'রে জল নামলো তার। প্রশান্ত তাকিয়ে-তাকিয়ে শুধু দেখলো।

...সেন্টিমেন্টাল হ'য়ো না, কোনো লাভ নেই ওতে।

...লাভ নেই জানি। তোমার কাছে যে এসবের কোনো দাম নেই, তাও জানি।

চোখ মুছলো কাজল।

আবেগের ঢেউ তখনও তার বুকে। একটা ছোট্ট অথচ দারুণ আশা সমুদ্রতীরে যেন কানামাছি খেলছে...কিছুতেই বুড়ি ছুঁতে পারছে না.

ঘুরে-ঘুরে মরছে। তবু একটু সামলে নিয়ে কাজল আবার শেষ চেষ্টা করলো।

...কিন্তু আমি যে আর পারি না, রিনি-কণির জন্যে সমস্ত সংসার আমার ফাঁকা লাগে। তুমি বুঝবে না, এ তুমি বুঝবে না।

প্রশান্ত তেমনি চুপ ক'রেই রইলো। আর দেখতে থাকলো কাজলকে, যেন কাজলের দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব। অবিকল সেই রকম। তবু কতো তফাৎ।

...কি, বলো না, দেবে না ওদের?

...সম্ভব নয়।

...সম্ভব নয়? কি নিষ্ঠুর। চিরকালই তুমি এমনি ক'রে জ্বালিয়েছো আমায়। কোনোদিন কিছু দাওনি; কোন শান্তি, কোন ভালোবাসা।

আবার কান্না পেতে লাগলো কাজলের। দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে সামলে রাখলো সে। প্রশান্ত এবার মুখ খোলে অনেকক্ষণ বাদে:

কেন, খুব তো সাহস ক'রে বীরাঙ্গনার মতো এক কাণ্ড করলে? আবার কান্না হচ্ছে। এত কান্নাও জমা ছিলো নাকি? আমার তো ভাগ্য তবে।

তোমার জন্যে না, মনে মনে ভাবলো কাজল। কিন্তু কোনো কথা না ব'লে উঠে দাঁড়ালো সে। ব্যাগ থেকে রুমাল বার ক'রে ভাল ক'রে মুখ-চোখ মুছে নিলো। তারপর আবার বললো,

...বলো, দেবে কিনা?

...বলেছি তো সম্ভব নয়।

...উঃ, খালি ঐ এক কথা, সম্ভব নয়...সম্ভব নয়।

...জানোই তো, আমি দু' কথার মানুষ নই।

...জানি, সবই জানি। আর এও জানি যে, তোমার মতো নির্মম কটুভাষী লোক আর দুটি নেই।

...জানো নাকি? তাহলে তো ভালোই।

বিদ্রূপে শাণিত হ'ল প্রশান্ত। বললো,

তবে তোমার সার্টিফিকেটে কিছু এসে যায় না। তোমার স্বরূপ তো ধরা পড়ে গেছে।

...আমার স্বরূপ?

—হঁ্যা, প্রেম পাগলিনী, দ্বিচারিণী—

—লজ্জা করে না এসব কথা বলতে?

—বা, কাজ করবে তুমি, আর লজ্জা করবে আমার?

প্রশান্তর মুখটা বেঁকে গিয়ে কঠিন হ'ল; সে আর কথা বাড়াতে চায় না।

—কি বলতে চাও তুমি? কি কাজ, কিসের জন্যে লজ্জা করবো?

—কিসের জন্যে? স্বামী থাকতে পর-পুরুষের সঙ্গে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে, আবার কি জন্যে।

—ছিঃ।

—ছি, কিসের? কাজটা করতে পারো, আর অপরের মুখে শুনতেই লজ্জা ঘৃণা, না?

—মানুষকে ভালোবাসা অপরাধ নয়। প্রত্যেকেরই জীবনে সুখী হবার অধিকার আছে। তাছাড়া এসব কথা বলার কোনো অধিকারও নেই তোমার!

কথাগুলো উচ্চারণ করেই কাজল ভেবে অবাক হল যে, প্রথম সঙ্কোচের মুখোস খুলে পড়তেই আবার তারা পরস্পরকে ছুরি শানিয়ে আক্রমণ করতে শুরু করেছে।

এমনি চলছিল তাদের দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনেও। মুহূর্তে সামান্য একটা স্ফুলিঙ্গ থেকে প্রচণ্ড দাবানল জলে উঠেছে। পরস্পরকে দোষারোপ করা চলেছে সোচ্চারে। তারপর শেষে প্রশান্তর নগ্ন ভাষার বর্বর আঘাতে কাজলের নিরুপায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়া।

কিন্তু না আজ আর সে চোখের জল ফেলবে না। অনেক ফেলেছি, আর নয়।—

কাজল ভাবলো, ভেবে একটু যেন জোর পেল নিজের মধ্যে। তাছাড়া তার সামনে আজ তো নিতান্ত একজন তৃতীয় পক্ষ; তার কাছে দুর্বলতা প্রকাশ করবে কেন?

আস্তে আস্তে আঁচলটা টেনে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো কাজল।

...ক্ষমা কর, আমার ব্যবহারের জন্য আমি দুঃখিত।

হঠাৎ প্রশান্ত বলে উঠলো,

...কিছু এসে যায় না। তোমার কাছ থেকে এর চেয়ে ভদ্র ব্যবহার পেতে অভ্যস্ত নই।

কাজল বলল খুব ধীরে ধীরে।

...তা হোতে পারে, কিন্তু আজ অন্ততঃ তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে চাইনি।

কোন উত্তর না দিয়ে কাজল চুপ করেই থাকলো কিছুক্ষণ, তার পর আস্তে আস্তে বললো,

তোমার মুখে লজ্জা স্বীকার শুনে আশ্চর্য লাগে।

...জানি, তবু এখন তো অন্য কথা। আমার কি যে হয় মাঝে মাঝে। এক এক সন্ধ্যায় কি নিঃসঙ্গ লাগে যে কি বলবো।

কোন সন্ধ্যায়ই তো একা থাক না, যে ফাঁকা নিঃসঙ্গ লাগবে। কাজল যেন স্বগতোক্তির মতোই একেবারে নিজের মনে উচ্চারণ করল কথাটা।

কিন্তু কিছু না বলে চুপ করেই থাকল।

...আসলে কি জান একটা লোক পাই না যে মনের সব কথা খুলে বলি। জীবনের সব সুখ দুঃখ পেরিয়ে······

কথাটা শেষ না করে থামলো প্রশান্ত, আর ধীরে পায়ে দরজার দিকে গেল কাজল। তারপর নিতান্তই অপরিচিতের মতই প্রশান্তর কাছ থেকে যথেষ্ট ব্যবধানে দাঁড়ালো।

···চলি।

...আচ্ছা।

দরজা খুলে দিলো প্রশান্ত।

ক্লান্ত দেহ টেনে খোলা দরজা দিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল কাজল। তখন রাতের অন্ধকার গাঢ় আচ্ছাদনে সমস্ত পৃথিবীর ওপরই যেন বিস্মৃতির মতো নেমে এসেছে।

পুরোন বেহালা

বিছানা ছেড়ে বারান্দায় বেরিয়ে এল সুব্রত। কিছুতেই ঘুম আসছে না।

সেই সন্ধ্যার পর থেকে তার অস্থিরতা ক্রমশঃ বাড়ছে। ভেবেছিল একটা ট্র্যাংকুলাইজার খেয়ে বিছানায় পড়তে পারলেই এর থেকে অব্যাহতি পাবে, কিন্তু ঘন্টা দুয়েক পরই খালি ঘুম ভেঙ্গে যেতে লাগল।

অতএব বিছানায় পড়ে এপাশ ওপাশ করার থেকে উঠে পড়াই ভাল মনে হল তার কাছে।

রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাল সুব্রত। কদিন থেকে ওর গলা ব্যথা, জ্বর-জ্বর ভাব। ডাক্তার ওকে সিগারেট বেশী খেতে বারণ করেছে। কিন্তু এ ছাড়া কি করতে পারে ও?

একটা লম্বা টান দিয়ে বেশ বড় করে ধোঁয়া ছাড়ল সুব্রত। বাইরে আকাশ কালো করে বৃষ্টি আসছে। তারাগুলো প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। শুধু সপ্তমীর নিঃসঙ্গ চাঁদ আকাশে জ্বল-জ্বল করছে। সেদিকে তাকিয়ে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল সে।

প্রায় বছরখানেক বাদে দেখল সে সুচেতাকে।

পুরোন বইয়ের দোকানটার সামনে। হাতে বড় একটা বাণ্ডিল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে তার চিরকালের অভ্যাসমত পুরোন বইগুলো। অনেক রোগা হয়ে গিয়েছে ও। অনেক কালোও। কিন্তু তেমনি সুন্দর আছে সুচেতার দীর্ঘ চেহারা যার জন্য সুব্রত একদিন পাগল ছিল।

পাগল বটে।

নাহলে অতবড় শিল্পপতি বীরেন মিত্রের ছেলে সুব্রত মিত্র, পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসা নেহাতই মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে সুচেতাকে হঠাৎ বিয়ে করে বসবে কেন ?

সুব্রতকে দেখতে পায় নি সুচেতা। ক্লান্তদেহে ঝুঁকে পড়ে বইগুলো বাছছিল। সুব্রত গাড়ী থামিয়ে ওকে লক্ষ্য করছিল। খানকতক বই বেছে নিয়ে যখন দাম চুকিয়ে সুচেতা আস্তে আস্তে বাস ধরবার জন্যে মোড়ের দিকে এগোচ্ছিল, তখন সুব্রতও ওকে অনুসরণ করল। কিন্তু ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সামনে গিয়ে ওকে লিফট্ দেবার কথা ভাবতে পারে নি সে। ততক্ষণে সুচেতা বহু চেষ্টা আর ঠেলাঠেলি করে একটা বাসে উঠে পড়ে, প্রায় ঝুলতে ঝুলতে চলে গেছে।

সুব্রত বাড়ি ফিরেছে অনেক পথ ঘুরে ঘুরে। মধ্যে গঙ্গার ধারে গিয়ে কিছুক্ষণ বসে থেকেছে, কিন্তু মনের অস্থিরতা ক্রমশ: বেড়েছে। একটা অদ্ভুত বিষণ্ণতায় তার সমস্ত বুকটা ভরে গেছে। কিছুই নয়। সে তো নিজেই ইচ্ছে করে এসবের শেষ করেছে। সুব্রত মিত্রের পক্ষে সুচেতাকে বিয়ে করাটাই আশ্চর্য, তাকে ছেড়ে দেওয়াটা বোধহয় নয়। অন্তত: লোকেরা তাতে অবাক হয়নি।

কিন্তু আজ তার ভীষণ খারাপ লেগেছে।

সন্ধ্যাবেলার সব প্রোগ্রাম বাতিল করে, অনেক পথ ঘুরে বাড়ি এসেও শান্তি পায় নি। বিছানায় শুয়ে শুয়ে রেডিওগ্রামে একটানা রেকর্ড শুনে গেছে, ঠিক গল্পের বিরহী নায়কদের মত। অথচ বিরহ বোধ করবার কথা তো তার নয়। সুচেতাকে যে সে আর ভালবাসে না, সেটা সকলকে জানানোর আগে সে নিজেই তো নিঃসংশয় হয়েছিল, তবু কিসের একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় তার বুকটা টনটন করতে লাগল।

রাত এখনও বেশ গভীর। হাত-ঘড়িতে সময় দেখল সুব্রত। মাত্র দুটো কুড়ি। কতদিন এমন সময় ও পার্টি থেকে ফেরে। কিন্তু আজ যেন আর সময় কাটে না। অন্য রাত তার কাছে ছোট মনে হয়, আজ যেন রাত কাটতে চায় না।

আকাশের দিকে আবার তাকাল সুব্রত। বোধহয় বৃষ্টি হবে। তারাগুলো বিশেষ দেখা যাচ্ছে না। শুধু সেই চাঁদটা আর বৃষ্টির সম্ভাবনা নিয়ে একরাশ কালোমেঘ।

ভোরবেলা কখন যে গাড়ী চালিয়ে একেবারে ভৈরব বিশ্বাস লেনের সেই পুরোন একতলা বাড়ীটার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সে নিজেই জানে না।

বাড়ির সামনেই দেখা টুব্‌লুর সঙ্গে। টুব্‌লু বোধহয় কাছের দুধের বুথ থেকে দুধ আনতে যাচ্ছে। হাতে দুটো দুধের বোতল আর কার্ড। ওকে দেখেই হঠাৎ আবার বাড়ীর ভেতর ঢুকে গেল।

সুব্রত একটু ভাবল।

তারপর গাড়ী থেকে নেমে সোজা এসে কড়া নাড়ল।

ও বেশ বুঝতে পারছে সেই রোজকার মত বাইরের তক্তাপোষে পাতা বিছানাগুলো তোলা হচ্ছে, বাইরের লোকের কাছে ঘরখানাকে বসবার ঘরের মত দেখাবার জন্যে।

দরজা খোলাই ছিল।

টুব্‌লুই মুখ বাড়াল একটা পাল্লা খুলে।

কি ব্যাপার? আপনি?

হ্যাঁ—

সুব্রত হঠাৎ যেন ঘামতে শুরু করল।

কিছু দরকার আছে?

আছে। চল, ভেতরে গিয়ে বলছি।

টুব্‌লু তবু দরজা ছাড়ল না, চরম অভদ্রতা হচ্ছে জেনেও।

কার সঙ্গে দরকার?

তোমার দিদির সঙ্গে।

কিন্তু দিদি তো নেই।

কোথায় গেছে?

শ্রীরামপুর।

শ্রীরামপুর?

হ্যাঁ।

কিন্তু কাল সন্ধ্যায়ই তো দেখলাম ওকে।

হ্যাঁ, আজ ভোরেই গেছে।

তাহলে তোমার মা আছেন তো। তাঁকে হলেও হবে।

কিন্তু মাও তো নেই, দিদির সঙ্গে গেছেন।

ও:—আচ্ছা তুমি কি বেরোচ্ছ?

হ্যাঁ, দুধ আনতে যাচ্ছি।

আমি একটু বসছি, তুমি ফিরে এস।

প্রায় ওকে ঠেলে সুব্রত ঘরে ঢুকল।

বসুন তাহলে।

নেহাত নিরুপায় হয়ে বোতল দুটো হাতে নিয়েই বেরিয়ে গেল টুব্‌লু।

সুব্রত এসে একটা চেয়ারে বসল। বিছানাটা এখনও পুরো তোলা হয় নি। ওকে অভ্যর্থনা জানাবার কোন ব্যবস্থাই করতে চায় নি টুবলু। স্পষ্টই তো উপেক্ষা দেখাল। যেচে এ অপমানটুকু তো সুব্রতই নিয়েছে। এ রকম ব্যবহার তো সে প্রত্যাশাই করেছে। কিন্তু উপায় কি? সুব্রতকে আসতেই হয়েছে।

ও টুব্‌লুর জন্যেও অপেক্ষা করব।

যদিও বক্তব্য সম্বন্ধে সে নিজেই সচেতন নয়, তবু শুধু যে বর্তমান পরিস্থিতি জানতে হবে তাই নয়, এভাবে এসে কিছু না বলে চলে যাওয়ার কথাও সে ভাবতে পারছে না।

টেবিল থেকে একটা বই টেনে নিল সুব্রত, টুব্‌লুরই এ্যালজেব্রা বই। সেই ছোট্ট টুব্‌লু কেমন আপনাআপনি সুচেতার অভিভাবকত্ব নিজের হাতে নিয়েছে, অথচ কত চিন্তা ছিল সুচেতার পিতৃহীন এই ছোট ভাইটার জন্যে। আজ টুব্‌লুই চিন্তা করছে এ সংসার সম্বন্ধে। ও যেন বেশ বুঝে নিয়েছে, সুব্রত আর ওদের শুভাকাঙ্ক্ষী নয়। হঠাৎ মনে হল এই কথাটাই ও টুব্‌লুকে বুঝিয়ে দেবে ভাল করে যে—যা কিছু ঘটুক না কেন সুব্রত ওদের তেমনই শুভাকাঙ্ক্ষীই আছে। এমনকি দরকার হলে—

বাড়ীর ভেতর থেকে বেরিয়ে এল সুচেতা নিজে। ময়লা ছেঁড়া শাড়ীই শুধু নয়, হাতভর্তি কয়লার দাগ, বোধহয় উনুন ধরাচ্ছিল।

প্রথমে লক্ষ্য করে নি সুব্রতকে। ওর দিকে নজর পড়তেই যেন ভূত দেখার মত চমকে গেল।

তুমি?

খুব অবাক হয়েছ—না?

অবাক?

হ্যাঁ আমাকে ঠিক এভাবে বোধহয়—

হঠাৎ বাড়ীর ভেতর ঢুকে গেল সুচেতা।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল সুব্রত। তারপর ভেতরের দরজার দিকে আস্তে আস্তে ডাকল—

এই যে টুব্‌লু।

কোন সাড়াশব্দ নেই, আবার ডাকল…

টুব্‌লু!

ও-পাশের ঘর থেকে সুচেতা বেরিয়ে এল। হাত ধুয়ে ময়লা কাপড়টা বদলে ফেলেছে এর মধ্যে।

টুব্‌লু নেই। বাইরে সে।

টুবলু নেই দেখেছি। তোমার সঙ্গেই দরকার।

আমার সঙ্গে? আচ্ছা চল। এখানে কথা নয়। মা, ঘুমুচ্ছেন, শরীর ভাল নয় মার।

কি হয়েছে মার? তোমরা শ্রীরামপুর যাও নি?

শ্রীরামপুর—কেন?

টুব্‌লু বলল যে,

ওঃ—

শোন রাণু!

আমার একটা নিজস্ব নাম আছে।

আমার কাছে একটাই নাম তোমার।

সুব্রতর নির্লজ্জতায় অবাক হয়ে গেল সুচেতা।

আমাকে দেখে খুব আশ্চার্য হবারই কথা। কিন্তু কাল তোমায় ও-পাড়ায়, মানে বইয়ের দোকানে দেখলাম।

সুচেতা চুপ করে রইলো।

কতদিন বাদে দেখা।

হঠাৎ এইসব কথা বলবার জন্য এই ভোরে এলে ?

না হঠাৎ নয়, জান রাণু! বহুদিন থেকেই ভাবছি।

কেন ? এ ব্যাপারে ভাবছ মানে ?

না ভাবছি, কি যে সব হয়ে গেল।

কিছু খারাপ তো হয় নি।

তোমার কি তাই মনে হয় ? তোমার কাছে কিছু খারাপ লাগে নি ?

এসব প্রশ্ন এখন অনর্থক।

জানি, তবু আমার জানতে ইচ্ছে করে। তোমার প্রতি আমি তো সুবিচার করি নি। মামলা-টামলা ওসব ছেড়ে দাও। ওসব বলতে হয় অভিযোগে। কিন্তু তুমি তো ভরণপোষণও কিছু নিলে না, মানে আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, সেটা কেন রিফিউজ করলে, আমি তো তার থেকেও বেশী দিতে রাজী ছিলাম, মানে আমার দেওয়া উচিত। তাহলে এভাবে তোমাকে কষ্ট করে—

বাড়ি বয়ে সকালবেলা আমাকে অপমান করতে এসেছ নাকি ?

অপমান ?

তা নয় তো কি ? আমার নামে অপবাদ তো অনেক দিলে। এখন এই টাকার কথাটা না জুড়ে বুঝি শান্তি পাচ্ছ না।

ওটা তো উকিলের পরমর্শে দিতে হয়। তা না হলে এ সব কেস দাঁড়াবে কিসে ?

ঠিক আছে, ওজন্য তো কোন কিছু অভিযোগ আমি করিনি তোমার কাছে।

তুমি করনি, কিন্তু আমার তো একটা বিবেক আছে।

বিবেক ? তোমার ?

একেবারে পাষণ্ড বলেই ধরে নিয়েছ না ?

কোন উত্তর দিল না সুচেতা।

একটা কথা! বিশ্বাস করবে না হয়তো. কিন্তু আমি বড় নিঃসঙ্গ, বড় একা।

সোজা ওর চোখের দিকে তাকাল সুচেতা, তারপর আস্তে বেশ আস্তে বলল,

হঠাৎ জোরে হেসে উঠতে ইচ্ছে করছে।

কেন?

বুঝতে পারছ না?

না।

তোমার কথা শুনে।

কেন? সত্যিই বড একা আমি। বড় নিঃসঙ্গ।

বারবার একটা কথা বলে গেলেই তো সত্যি হয়ে যায় না। তুমি নিঃসঙ্গ? তোমার সঙ্গীর অভাব? স্ট্রেঞ্জ!

স্ট্রেঞ্জ নয়। এ নিঃসঙ্গতা যে কতটা তা তোমায় বোঝাতে পারব না। নিজেও আগে কল্পনা করতে পারি নি।

আমায় বোঝাবার দরকার নেই।

তোমার নিশ্চয়ই কিছুই এসে যায় না।

যদি বলি, না।

তাহলে অবাক হব না, তবে একেবারেই কিছু এসে যায় না বিশ্বাস করতে ইচ্ছে যায় না।

তোমার ইচ্ছা পূরণ করতে পারলাম না বলে দুঃখিত। কিন্তু ক্রমশঃ শরৎচন্দ্রের নায়কের মত কথা বলছ যে।

তুমি অনেক বদলে গেছ।

স্বাভাবিক।

স্বাভাবিক জানি। তোমার ওপর অনেক অন্যায়ও হয়েছে। কিন্তু আজ তার জন্য আমি অনুতপ্ত।

কি দরকার?

আমিও ভেবেছিলাম কোন দরকার নেই। কিন্তু কাল তোমাকে ওভাবে দেখা পর্যন্ত মনটা বড় খারাপ হয়ে গেছে। আচ্ছা, একদিন তোমার ওপর আমার কোন অধিকার ছিল মনে করেও কি আজকে আমাকে কিছু করতে দেবে না ?

আমি তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।

কেন, ভাষাটা কি খুব কঠিন ?

ভাষা সহজ, কিন্তু বক্তব্য—

বক্তব্য আর কিছুই নয়, তোমার যে বেশ কষ্ট, বেশ অভাব যাচ্ছে তা বেশ বুঝতে পারছি।

চিরদিনই ছিল।

মধ্যে ছিল না।

সে কথা ভাবতে আমি লজ্জা পাই।

কেন অভাব থাকা কি গৌরবের ?

ওর দিকে সোজা তাকাল সুচেতা, তারপর যেন কেটে কেটে বলল,

না, কিন্তু কারও দয়ার দানে সে অভাব মেটানোর চেষ্টা অগৌরবের।

রাণু, তুমি খুব কড়া কথা বলছ।

এর থেকেও বেশী কড়া কথা বোধহয় তোমার প্রাপ্য।

জানি সেকথা, কিন্তু আমি তোমাকে কোনদিন দয়া দেখাই নি। আজও দেখাতে আসি নি। স্পর্ধা আমার নেই।

অন্তত: আমি তাই মনে করেছিলাম সে স্পর্ধা তোমার কোনদিন হবে না।

রাণু।

প্রায় আর্তনাদ করে উঠল সুব্রত।

ওর প্রায় নীল হয়ে যাওয়া মুখের দিকে একবার তাকিয়ে বিছানাটা তুলতে আরম্ভ করল সুচেতা।

সুব্রত লক্ষ্য করল কাল যা ভেবেছিল তার থেকেও বেশী রোগা হয়ে গেছে সুচেতা! ভারী একটা মমতা হোল ওর।

হঠাৎ মনে হল সেই আগেকার মত কাছে গিয়ে সুচেতার রোগা সাদা হাতটা নিজের হাতে টেনে নেয়, কয়লার দাগগুলো মুছে দিয়ে বলে—

সুচেতা, খুব অন্যায় করেছি, তুমি চলে আসার পর সব ফাঁকা। ভারী একা আমি, সত্যিই ভারী একা।

ঠিক সেই সময় টুবালু ঘরে ঢুকল। ওদের দেখে কোন কথা না বলে বোতল দুটো নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

সুচেতাও ওর দিকে ফিরে দাঁড়াল।

আমার কাজ আছে এখন, বোধহয় উনুন ধরে গেল।

ভেতরে যাবার জন্য পা বাড়াল সুচেতা।

সুব্রত বাইরে বেরিয়ে এসে একবার আকাশের দিকে তাকাল। মেঘ-ভাঙা চড়া রোদ উঠেছে। বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।

বৃষ্টি—হবেনা

অন্যের কথা কি বলব? নিজের মনের খবরই কি সবাই জানে? আমার তো তা মনে হয় না।

কত মানুষ তো দেখলাম, কত বিচিত্র মন তাদের, বাইরে তারা এক, আবার ভেতরে আর এক রকম। কি জানি মনের ডাক্তার হয়ত বা এর তল খুঁজে পেয়েছেন, কিন্তু আমার নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি নিজের মনই নিজে বোঝা যায় না। এ অসম্ভব।

আমি জীবনে যা করতে চেয়েছি হয়তো তার উল্টোটি করে বসেছি। যা চাইনি তাই ঘটে গেছে। যেটা না হলে আমার চলবে না মনে করে খেদ করেছি, পরক্ষণেই সেটির প্রতি নিদারুণ এক নিস্পৃহতা অনুভব করেছি। বিশেষ করে প্রেমের ক্ষেত্রে। যাকে ছাড়া বাঁচব না মনে হয়েছে তাকে নিঃশেষে ভুলেছি, আর যার অস্তিত্বকেই স্বীকৃতি দিইনি তার কাছে...

পনের বছর বয়সে যে মেয়েটিকে আমি ভালবেসেছিলাম, সে আমার থেকে চার বছরের বড়।

আমি তখন সবেমাত্র বঙ্কিম আর শরৎ শেষ করেছি, রবীন্দ্রনাথ তখন আমার মানস গুরু, আর সেই সময়ই অচলাকে দেখলাম এক চায়ের নিমন্ত্রণে, আর সঙ্গে সঙ্গে ভালবেসে ফেললাম। তার বয়স তখন উনিশ। উনিশের যে কি মাধুর্য তা আমার থেকে আর ভাল করে কে বুঝবে? কবিরা পঞ্চদশী, অষ্টাদশীর বর্ণনায় মুখর, কিন্তু তারা কি কখনও উনিশ বছরের ফোটা ফুল দেখেনি? তারা বোধ হয় দেখেনি, কিন্তু আমি দেখেছিলাম, আর দেখামাত্র প্রেমে পড়তে দ্বিধা করিনি।

অচলাকে যখন কথাটা জানালাম, অন্ধকারে সাপের গায়ে পা দেওয়ার মত অচলা যেন চমকে উঠল।

পাকামো ক'র না।

রাগে লাল হয়ে গেল অচলার মুখ।

পাকামো কিসের? তোমাকে ভালবাসা কি অপরাধ?

জোরে হেসে উঠল অচলা।

"অপরাধ?"

আবার একবার জোরে জোরে হাসল, আর আমি ক্ষুব্ধ অপমানে জ্বলতে লাগলাম।

আচ্ছা শোন।

এককোণে ডেকে নিয়ে গেল অচলা।

তোমার বয়স কত বল ত? প্রেমের বোঝ কি?

দেহের বয়স আর মনের তো সকলের সমান নয়। আমি যদি প্রেমের কিচ্ছু নাই বুঝি, তো প্রেমের গল্প লিখি কি করে?

ওসব তো তোমার উদ্ভট কল্পনা। গল্পের প্রেম আর জীবনের বাস্তব প্রেম এক হয় না।

কিন্তু বাস্তব প্রেমকে ভিত্তি করেই তো সাহিত্য...

আমার কথা থামিয়ে দিল অচলা।

ব্যস—ব্যস, আর নয়। তোমার কাছে সাহিত্যের প্রেম সম্বন্ধে আর একদিন শুনব। আজ সুপ্রতিম আসবে এখনি। আমার এখনও কিছু হয়নি।

মোটা একটা চিরুনি দিয়ে তার চুলের জট ছাড়াতে লাগল অচলা। আর চুলের মধ্যে তার সুন্দর ফর্সা আঙুলের চলাফেরা দেখে আমি তাকে আরও গভীর ভাবে ভালবাসতে লাগলাম।

সুপ্রতিম! রাগ করে বললাম,

জানো ঐ নামটা পর্যন্ত আমি সহ্য করতে পারি না।

তুমি না পারাতে কিছু এসে যায় না।

আবার হাসল অচলা,

আমি যে খুব বেশী রকমের পারি!

তুমি কি নিষ্ঠুর।

প্রায় আর্তনাদ করে উঠলাম আমি।

তাই নাকি?

আমার মাথায় একটা নাড়া দিয়ে জোরে হেসে উঠল অচলা, তারপর বাড়ীর ভেতর চলে গেল। আর আমি পাথরের মতো বসে রইলাম, প্রত্যাখ্যাত প্রেমের অপমানের জ্বালা সহ্য করে।

আধ ঘন্টা পরে সুপ্রতিম যখন এসে পৌঁছাল, অচলা তখনই বেরিয়ে এল। সাজসজ্জা শেষ করেও সে সুপ্রতিমের আসার অপেক্ষাতেই দরজার আড়ালে দাঁড়িয়েছিল নাকি? না হলে এক মুহূর্তও সুপ্রতিমকে অপেক্ষা করতে হ'ল না কেন?

এতক্ষণ ভাবছিলাম অচলার কথা।

কি কঠিন মেয়ে। আমার এতখানি ভালবাসা ওকে বিন্দুমাত্র টলাতে পারল না। রীতিমত আহত হলাম, আর ঈর্ষায় মরে গিয়ে দেখতে লাগলাম এই কঠিন মেয়েই কি কোমল হয়ে গেল সুপ্রতিমকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে!

তুমি তাহলে এখন কি করবে? আমরা তো বেরোচ্ছি। সোজা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে অচলা জিজ্ঞেস করল।

আমিও যাব,

তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম চেয়ার থেকে।

তোমাদের কথাবার্তায় বাধা দিলাম নাকি?

যেতে যেতে সুপ্রতিম জিজ্ঞেস করল অল্প হেসে।

ওর হাসি যেন ছুরির মত আমাকে কেটে কেটে যেতে লাগল। এই প্রথম কোন লোকের প্রতি আমি বিজাতীয় ক্রোধ অনুভব করলাম।

এতক্ষণে লক্ষ্য করলাম অচলাকে আজ অপূর্ব দেখাচ্ছে। অন্যদিন বা সময় হলে নিশ্চয়ই কিছু বলে উঠতাম। যে রং-এর শাড়ীতে ওকে প্রথম

দেখে আমি ভাল বেসেছিলাম, আজ যেন বেছে বেছে ঐ শাড়ীটাই পরেছে অচলা। আমি মনে মনে আবার অচলার সৌন্দর্যের প্রশংসা না করে পারলাম না। অচলার রূপ দেখে আমার বরাবরই মনে হ'ত এ সৌন্দর্য কেবল দূর থেকে তারিফ করার, একে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না। আমার মনে হ'ত একে ছুঁলেই এর পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যাবে। আজ সে মত সম্বন্ধে আরও নিশ্চিন্ত হলাম।

অচলার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হয়েছে ভেবে মনকে স্থির করতে চাইলাম, কিন্তু তার সেই স্বর্গীয় সৌন্দর্য আমার মনকে তারই দিকে টেনে রাখত। অচলা আমার প্রেমের সম্মান দেয়নি বলে ওর বাড়ীতে যাওয়া ছাড়লাম। কিন্তু ওর ওপর রাগ হ'ল না। মনে হ'ল ও ঠিকই করেছে, ও তো কারও পার্থিব প্রেমের প্রতিদান দিতে পারে না। ও যে স্বর্গীয়।

কিন্তু এর ঠিক এক বছরের মধ্যেই যে আমার মনের ভাব এমন হবে কে জানত?

সেদিন অচলার বাড়ীতে গিয়ে যখন পৌঁছুলাম তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে।

আমার কাছে ওর কতকগুলো বই ছিল। ফেরৎ দেবার জন্য নিজেই গিয়েছিলাম ওদের বাড়ীতে। বাড়ী অন্ধকার। বোধ হয় কেউ নেই। দরজায় আস্তে আস্তে কড়া নাড়লাম। হিন্দুস্থানী একটা চাকর এসে দরজা খুলে দিল। বোধহয় নতুন এসেছে এ বাড়ীতে, আগে তাকে দেখিনি। জিজ্ঞেস করলাম—বাড়ীতে কেউ নেই?

জী।

দিদিমণি আছেন?

জী।

বুঝলাম এর সঙ্গে সময় নষ্ট করা বৃথা। অতএব আমার অতি পরিচিত অচলার শোবার ঘরের দিকে পা বাড়ালাম।

অচলা ! —বলে ডেকেই পর্দা সরিয়ে ঢুকলাম আমি।

পরক্ষণেই বেরিয়ে এলাম। আমার তখন জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে। থাকব কি চলে যাব ভেবে পেলাম না।

অচলা ঘুমোচ্ছে।

তার অসংবৃত জামা-কাপড়ে, তার হাঁ করা মুখে, আর ঘুমানোর ভঙ্গিতে সব মিলিয়ে এমন একটা দৃশ্যের সৃষ্টি হয়েছে, যা দেখে আমার মনে প্রচণ্ড ধাক্কা লাগল। ভাল-লাগা মন্দ-লাগার ক্ষমতা আমার ভেতর যে একই সঙ্গে এভাবে কাজ করছে তা কে জানত ? এই নারী দেহ ? এই দেহকেই আমি এতদিন আমার হৃদয়ের সবটুকু পূজা নিঃশেষে ঢেলে দিয়েছি ?

আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলাম বাড়ী থেকে। মনে হ'ল অচলাকে বোধ হয় আমি কোনদিনই ভালবাসিনি। তা না হ'লে ইতিমধ্যেই ওর প্রতি আমি এত তীব্র বিতৃষ্ণা অনুভব করতে আরম্ভ করেছি কেন ?

সত্যি, এরপর থেকে অচলার স্মৃতিমাত্র আমার কাছে খারাপ লাগতে লাগল। তাকে যে কোনদিনই ভালবেসেছিলাম, সে কথা নিঃশেষে ভুলে যেতে চাইলাম।

অচলার কাছে আমার মন যে আঘাত পেল জীবনে তার পুনরাবৃত্তি ঘটবার সম্ভবনা রদ করবার যথোপযুক্ত আয়োজন আমার নিজের ভেতর আপনা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে বলে বিশ্বাস করলাম। আর আমার এই আভ্যন্তরিক প্রতিবাদ এত জোরাল হ'ল, যে বহুদিন, প্রায় দশ বছর ধরে, কোন মেয়ের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা ঘটতে পারল না।

কত মেয়ের সঙ্গেই তো পরিচয় হ'ল। কত মেয়েকেই তো দেখলাম। কিন্তু কাউকেই ভালবাসার কথা ভাবতে পারলাম না। সত্যি বলতে কি দেহের ব্যাপারে আমার কেমন একটা আপত্তি জন্মে গিয়েছিল। তাই যে মেয়েটিকে ভাল লাগবার পরই মনে হ'তে মেয়েটি সুন্দর, তার দেহ তাকিয়ে দেখবার মত, তখনই আমার মনে হ'ত, যে এর ভেতরও হয়ত কিছু স্থূলতা আছে, যা আমার মনকে আবার পীড়িত করে তুলবে।

ইতিমধ্যে সাহিত্য-প্রীতিবশত আধুনিক কবিতার রসে আমার মনকে ভরিয়ে তুলেছি। রবীন্দ্রনাথের কবিতা তো আমার শেষ হয়েছে অনেক আগেই। এখন আধুনিক কবিদের কবিতার বহু ভাল ভাল লাইন আমার সর্বদাই মনে ঘোরে। এমন কি তাঁদের সমধর্মী ইংরেজ ও ফরাসী কবিদের সঙ্গে তাঁদের কতটুকুই বা পার্থক্য আর কোথায়ই বা সাদৃশ্য তাও আজকাল বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারি। বন্ধু-সমাজে কবি ও বিদগ্ধ ব্যক্তি বলে কিছু খ্যাতিলাভও করেছি।

আমার ছোট বোন মঞ্জুর বন্ধু রুণুকে আমার ভাল লাগল তার লেখা "আধুনিক সাহিত্যে নিসর্গের স্থান" প্রবন্ধটি পড়ে। প্রকৃতির কবি বলে পরিচিত এক আধুনিক কবির বহু উদ্ধৃতি সে বেশ লাগসই ভাবে ব্যবহার করেছে। মাঝে মাঝে তার বিস্ময়কর মন্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, যে আধুনিক কবিদের অনেক কবিতাই তার বেশ জানা আছে।

তার সঙ্গে অনেক বিষয়ে দ্বিমত হওয়া সত্ত্বেও বুঝতে পারলাম রুণু প্রবন্ধটি অসম্ভব ভাল লিখেছে। সাহিত্য জগতে আমার যেটুকু পরিচয় ছিল, তারই ফলে মঞ্জুর অনুরোধে আমি ওর প্রবন্ধটা পত্রিকায় বার করতে সাহায্য করলাম।

সেদিন ধন্যবাদ জানাতে এসে রুণুর সঙ্গে আমার দু-তিন ঘণ্টা এ বিষয়ে আলাপ আলোচনা হ'ল। সাহিত্যের কোন দিকই বোধ হয় বাদ রাখলাম না। বার বার ওর সঙ্গে আমার মতের অমিল হওয়ায় আমি বেশ অধৈর্য হয়ে উঠতে লাগলাম, অথচ রুণু বেশ ধীরভাবে যুক্তি দিয়ে তার নিজের মত প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করতে লাগল।

এ রকম সাহিত্য সভা প্রায়ই হ'ত। একজন নীরব শ্রোতা, আমরা দুজন তার্কিক। ক্রমশঃ এই আলোচনা সভা একটা নেশায় দাঁড়িয়ে গেল। নানা বই পড়ে নিজেকে শাণিয়ে রাখতাম, জোরাল যুক্তি দিয়ে রুণুর মতামতকে নস্যাৎ করবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখতাম।

বন্ধুবান্ধবরা টিটকারি করত, আমি প্রেমে পড়েছি ভেবে। আর আমার হাসি পেত রুণুর প্রেমে পড়া যায় এই কল্পনামাত্রে।

সেদিন রবিবারের সকালেই আমাদের আলোচনা সভা জমে উঠল।

ইদানীং আমাদের সভার শ্রোতাটি প্রায়ই অনুপস্থিত থাকত। তাতে আমাদের কিছু অসুবিধা হ'ত না। আমি আর রুণু ই ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করে যেতাম।

যে জানালা দিয়ে রোদ আসছিল, তার ঠিক উল্টো দিকেই রুণু বসেছিল। মুখে রোদ লাগার দরুণ হাত দিয়ে বারবার সে চোখ আড়াল করছিল। বুঝলাম রুণুর অসুবিধা হচ্ছে। উঠে গিয়ে জানলাটা বন্ধ করে দিলাম। ফিরে আসবার সময় একটা টেবিলে ধাক্কা লেগে পায়ে ব্যথা পেলাম।

উঃ!

বলে পা-টা ধরে খাটের এককোণে বসে পড়লাম।

দেখি দেখি কোথায় লাগল?

রুণু চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে এল।

পায়ে! হাত দিও না।

নিজের পায়ের আঙুল চেপে ধরে বল্লাম।

'তাতে কি হল। দেখি না কি হয়েছে!' জোর করে কোথায় লেগেছে দেখতে গেল।

'ছাড়ো।' হাতটা সরাতে গেলাম, আর এই প্রথম যেন অনুভব করলাম, রুণু একটি মেয়ে। ওর হাত আমার হাতের মধ্যেই ধরা রইল, আস্তে আস্তে ওর হাতটা আমার দু হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে ওর দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম।

রুণু বোধ হয় অস্বস্তি বোধ করছিল। হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে সরে গিয়ে ওর নিজের চেয়ারে বসল।

আমি ধীরে ধীরে গভীর গলায় ডাকলাম—

'রুণু!'

'কি হল আবার?'

ওর মুখটা লাল হয়ে গেছে, কিন্তু ভাব গোপন রাখার চেষ্টা করতে ও দ্বিধা করল না।

'বড্ড ব্যথা লাগছে।'

'তবে ?'

ও এবার যেন সত্যিই খুশী হল, অন্য কিছু বললাম না বলে। একেবারে কাছে চলে এল তারপর ঝুঁকে পড়ে বলল—

'দেখি ! ইস্ রক্ত পড়ছে, দাঁড়ান জল নিয়ে আসি।'

ওকে আঁচল ধরে টেনে আনলাম নিজের কাছে, তারপর প্রায় ফিসফিস করে বললাম ওর চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে—

'ব্যথাটা পায়ে নয়, এখানে। ওর হাতটা টেনে নিয়ে আমার বুকের বাঁ দিকে চেপে ধরলাম।

'ছাড়ুন।' গম্ভীর হয়ে ধীরে ধীরে ওর হাতটা ছাড়িয়ে নিল রুণু। তারপর ফেলে রাখা ওর বইগুলো গুছিয়ে নিল। পেনটা তুলে নিয়ে ব্লাউজে গুঁজে বলল—

'আজ যাই।'

আমি এতক্ষণ চুপ করে দেখছিলাম। ও আমার দিকে চোখ তুলে তাকানো মাত্র কি যেন অনুভব করলাম। সব কিছু ভুলে ওকে কাছে টেনে আনলাম। ওর হাত থেকে সব বই পড়ে গেল সশব্দে। আরও কিছু বলবার আগেই চুম্বনে চুম্বনে ওকে ভরিয়ে দিলাম। ওর পাতলা দেহ থরথর করে কাঁপতে লাগল।

ঠিক সেই সময়েই মঞ্জু ঘরে ঢুকল—

'দাদা !'—

প্রায় আর্তনাদ করে উঠল সে।

সম্বিত ফিরে পেলাম।

যে পশুটা মাতাল হয়ে এই কাণ্ড করল তার হাত থেকে ছাড়া পেয়ে রুণু দু-হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলল। তার কান্না যেন ধীরে ধীরে সমস্ত জায়গায় ছড়িয়ে গেল। আমি ভয় পেলাম।

মঞ্জু আমার দিকে ঘৃণা আর বিস্ময় ভরা চোখে তাকিয়ে রইল। সে অবাক হয়েছে।

কিন্তু সব থেকে বেশী অবাক হয়েছি আমি নিজে।

যে-আমি দেহ সম্বন্ধে একটি চীনের পাঁচিল তুলেছি বলে জানতাম; তার পক্ষে কোন মেয়ের সঙ্গেই যে রক্তমাংসের সম্বন্ধ ঘটতে পারে না—এ বিষয়ে স্থির নিশ্চিত ছিলাম। এমনকি কোন মেয়ের সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠতা হতে পারে, এ বিষয়ে কল্পনা করাও অসম্ভব ছিল।

কিন্তু আজ এ কি হল? রুণু, যাকে প্রতিনিয়ত দেখছি, ছোট বেলা থেকে যে আমাদের বাড়ী এসে প্রায় মঞ্জুর সমানই হয়ে গেছে এ বাড়ীতে, দেহের সৌন্দর্য যার বিশেষ প্রায় কিছুই নেই, তাকে আমার আকর্ষণীয় লাগবার কোন কারণ তো ঘটে নি।

সত্যি সত্যিই নিছক সাহিত্য আলোচনার জন্যই যে আমরা রোজ গল্প করতাম, আমাদের রোজকার আলোচনা সভায় যে এক মুহূর্তের জন্য সাহিত্য ছাড়া অন্য কিছুর আলোচনার সম্ভাবনা পর্যন্ত ছিল না, এখন কি করে তা বোঝাব?

মঞ্জুর সরল চাহনি যেন আমাকে নীরব তিরস্কার করতে লাগল। আর হতভম্বের মত বসে রইলাম আমি।

বিচিত্র মন

অনেকক্ষণ থেকে ট্রামগুলো আটকে আছে।

মিছিল বেরিয়েছে কর্মচারীদের, শহীদ মিনারের তলায় ওদের মিটিং। রাশীকৃত দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে ওদের নানা বক্তব্য ওরা পেশ করবে। ইউনিয়নের নির্দেশ মত ওরা সকলে বেরিয়ে এসেছে। বিনতাও এসেছিল।

না এসে উপায় ছিল না।

অফিসের গেটে কমিটির নেতারা অনেকে দাঁড়িয়েছিলেন। গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কাউকে বেরিয়ে যেতে দেবে না তারা। সবাইকে মিছিলে যোগ দিতে হবে। বিনতাও বেরোতে পারেনি।

বাড়িতে তার খুব দরকার থাকা সত্ত্বেও তাকে ছাড়েনি ওরা। বিনতা যে একটু আধটু চেষ্টা করেনি তা নয়। কিন্তু ওদের যুক্তির কাছে লজ্জা পেয়েছে।

আমরা কি আপনাদের জন্যও সংগ্রাম করছি না? ওদের সবিস্ময় প্রশ্ন ছিল।

তা করেছেন—কিন্তু,—বিনতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল।

কোন কিন্তু নয়, আপনারা সকলে, বিশেষ করে মেয়েরা যোগ না দিলে আন্দোলনটা কি অর্থেক হবে না? তবে?

তা জানি। কিন্তু আমাদের ঘর বাড়িও তো আছে। সে সব দেখবে কে?

আপনারাই দেখবেন। কিন্তু যাতে সেই ঘর বাড়ি আরও ভালভাবে চালাতে পারেন তার জন্য কি চেষ্টা করবেন না?

আপনারা গ্যারান্টি দিতে পারেন যে এতেই সব ভাল হবে ?

গ্যারান্টি আমরা দেব কেন ? আপনিই আপনাকে দেবেন। নিজের মনের থেকে প্রত্যেকের বিশ্বাস না এলে ঘাড়ে চাপান আন্দোলন কি সফল হয় ?

ঘাড়েই তো চাপাচ্ছেন আপনারা ?

তাহলে আমরা দুঃখিত।

এই বিনতা কি যা তা বলছিস ?

বিনতা শেষ পর্যন্ত অনিচ্ছা জানিয়েছে। ওকে ডেকে নিল মানসী।

নারে সত্যি আমার ইচ্ছা করে না, কিন্তু উপায় নেই। তাহলে কাল অফিসে ঢুকতে হবে না।

অগত্যা খানিকটা বিক্ষোভ করার পর মিছিল বার হল। সেও যোগ দিয়েছে। শুধু ব্যাপারটারই সে গুরুত্ব দেয় না বলে নয়, বাড়িতে তার ছোট ভাই বাচ্চুর জ্বর। তাছাড়া রোজকার রান্নাবান্না তো আছেই।

আজই এটা নতুন নয়। নিজের মনের থেকে কোন তাগিদ অনুভব করে না বলেই, ওর অসুবিধাগুলো বেশ বড় আকারে ওর সামনে দেখা দেয়। প্রায় দিনই নানা অছিলায় আগেই চলে যায় সে।

অবশ্য সেজন্যই আজ আর বলতে পারে নি। রোজ রোজ বলাটা খারাপ দেখায় বটে।

মিছিল চলেছে।

নানারকম শ্লোগান। চিরাচরিত 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' তো আছেই তাছাড়া, 'সংগ্রাম চলছে চলবে,'—কর্মচারী ঐক্য জিন্দাবাদ, সংগ্রামে যোগ দিন।'

বহু যোগ দিয়েছি, এবার আমাদের বিয়োগ দিন।

বিনতা চলতে চলতে ফিস ফিস করে বলল মানসীকে।

• জিনিসটা নিয়ে ফাজলাম করিস না বিনতা।

না ফাজলাম করছি না, কিন্তু রোজ রোজ আর কত যোগ দিই বল?

উপায় কি? দাবী না মেটা পর্যন্ত।

কবে মিটবে? আর কোনদিন কি সত্যিই মিটবে?

চেষ্টা তো করতে হবে!

মানসী ওকে বোঝাবার চেষ্টা করে।

তোদের সব বড্ড গাছাড়া দেওয়া ভাব। সকলেই ওপর ওপর থাকবি, অথচ ফল পাবার আশা ছাড়বি না? এটা ঠিক নয় বিনতা।

ওপর ওপর নয়, বাড়ীতে বড় দরকার।

সকলেরই বাড়ীতে দরকার। আমাদের সব মেয়েদেরই তো বাড়ীতে গিয়েই রান্নাঘরে ঢোকা। কার নয় বল?

জানি, কিন্তু বাচ্চাটার জ্বর।

কবে থেকে?

পরশু।

মাসীমা তো আছেন।

মা আছে, তবে মায়েরও শরীর ভাল না।

আচ্ছা কিছুক্ষণ তো চল। তারপর না হয় চলে যাবি। একটা মর‍্যাল সাপোর্ট বলেও তো কথা আছে। তোর সমর্থন তুই জানাবি কি করে?

সমর্থন যে খুব একটা আছে তাও বলতে পারি না।

বলিস নি বিনতা একথা—বাঁচবি কি করে তাহলে?

কেন? ওদের দলে না গেলে চলবে না?

কোন দলে?

এই মিছিলকারী। ওরা কি আমায় বাঁচাবে নাকি?

বাঁচাবে না। বাঁচাচ্ছে এখনই।

বিশ্বাস করি না, অন্তত তোর মত এত জোর দিয়ে তো নয়ই।

একদিন করবি।

দেখা যাক।

ওরা এগিয়ে চলল

মিছিল যখন রাজভবনের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে তখন বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল।

অনেকেই চেঁচিয়ে শ্লোগান দিচ্ছে, তবু দীর্ঘ লাইনের কিছুটা বিপর্যস্ত ভাব দেখা গেল। বিনতাও অন্য মেয়েদের মতো ব্যাগ দিয়ে মাথা ঢাকবার চেষ্টা করল।

কিন্তু বৃষ্টি ক্রমশঃ বেশ জোরে পড়তে লাগল। আর ক্রমশঃই পাতলা হোতে লাগল মিছিলের ভীড়। বারণ করা সত্ত্বেও কেউ কেউ লাইন থেকে সরে এসে আশেপাশের বারান্দাগুলোর তলায় আশ্রয় নিতে চেষ্টা করল।

বিনতাও দৌড়ে গিয়ে গ্রেট ইষ্টার্ণের তলায় চলে এল।

এই বিনতা কি হচ্ছে ?

মানসী চেঁচিয়ে উঠল।

না ভাই, ভিজতে পারব না। সদ্য জ্বর থেকে উঠেছি। আবার হবে।

তা হোক. সবাই তো আছি আমরা। জ্বর হবে তো কি ? ছুটি নিবি।

না না ক্যাজুয়াল লিভ আর পাওনা নেই. আমি পারব না।

আশ্চর্য।

বেশ রাগ করে মানসী এগিয়ে গেল।

বিনতা গায়ের জল ঝাড়তে ঝাড়তে এদিক ওদিক তাকিয়ে পথ পাবার চেষ্টা করতে লাগল।

ট্রামগুলো অনেকক্ষণ থেকে আটকে আছে।

বিনতা দেখতে চেষ্টা করল তার ভেতর লেডিস ট্রামটাও আছে কিনা।

সেই সময়েই চোখে পড়ল সেই বিরাট কাল রং-ডজ।

ভুল নেই, সেই নম্বরই। ও গাড়ী ওর বহুদিনের চেনা। বহু ঘুরে বেড়িয়েছে ও ঐ গাড়ীতে দিনের পর দিন। গত বছরও। শুধু আজ চালক বদল। ড্রাইভারের বদলে কল্যাণ নিজেই চালাচ্ছে।

কল্যাণও বোধ হয় ওকে দেখতে পেয়েছে। তা না হলে হঠাৎ পাশ কাটিয়ে এদিকে এগিয়ে আসবার চেষ্টা করবে কেন?

বিনতা কাঠের মত আড়ষ্ট হয়ে গেল ওকে দেখে। বৃষ্টি বেশ ঝমঝম করে জোরে পড়ছে, তার ফলে একটা স্বাভাবিক সাদা ধোঁয়ার পর্দা ওদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে। যার জন্য একেবারে মুখোমুখি আর তাকাতে ইচ্ছা হচ্ছে না। কিন্তু কল্যাণ যে স্পষ্টই ওকে লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে ও বেশ বুঝতে পারছে।

খানিকটা ওদিকে এগিয়ে গেল বিনতা। কিন্তু বৃষ্টি বেড়ে যাওয়ায় এই আশ্রয়টুকুতে লোকজনের ঠেসাঠেসি হয়ে গেছে। তবু তার ভেতর লোকজনের জলঝরা ভিজে ছাতা, আর জামাকাপড় থেকে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করে খানিকটা এগিয়ে গেল বিনতা, তারপর বাঁদিকের রাস্তাটায় ঢুকে যাবার চেষ্টা করল। হঠাৎ দেখল বাঁক ঘুরে গাড়ীটা পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

কাঁচ নামিয়ে কল্যাণ ঝুঁকে পড়ে ওকে ডাকল।

বিনি!

ওর দিকে একবার তাকিয়ে মুখ ফেরাল বিনতা।

উঠে এস গাড়ীতে।

কেন?

যেন এই আমন্ত্রণে অবাক হয়ে এ প্রশ্ন করা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

কেন আবার কি? ভিজছ যে।

কল্যাণ গাড়ী থেকে ভিজতে ভিজতে নিজেও নেমে এল। একেবারে পাশে এসে দাঁড়াল।

বিনতা সরে যাওয়ার চেষ্টা করল।

বিনি, চল গাড়িতে।

না।

ভিজে যাচ্ছ।

বৃষ্টি হলে তো ভিজতে হবেই।

সকলকে নয়।

সকলের সঙ্গে আমার তফাৎ কি।

তফাৎ আছে, ভালই জান।

জানি না।

চল তোমায় পৌঁছে দিই।

না, বৃষ্টি থামলে ট্রাম পাব।

ও, ট্রাম আজ পাবে ভেবেছ? একে তো জল জমেছে, তার ওপর যা মিছিল বেরিয়েছে।

কোন উত্তর দেওয়ার দরকার মনে করল না বিনতা। দু-একজন ওদের লক্ষ্য করছে দেখে কল্যাণ ওর কাছে সরে এসে আস্তে আস্তে বলল—

মিছিল আছে তাই রক্ষা। সবই আটকে আছে, আমরাও। অবশ্য এজন্য ধন্যবাদ মিছিলকে।

ওর পরিহাসের নির্লজ্জতায় বিনতা একেবারে সোজা চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আবার অন্যদিকে মুখ ফেরালো।

আমার কারখানাতেও তো এইসব হচ্ছে। চলবে না, চলবে না, আজ তিনদিন তো এইসব হট্টগোল চলেছে। তোমার মনে আছে বিনয়কে? সেই যে ছেলেটিকে তুমি ওবিডিয়েন্ট বলে রেকমেণ্ড করেছিলে? সেই তো দলের পাণ্ডা। মা তো তোমার ওপরই খাপ্পা।

সে কি আজ নতুন? তোমার মা তো বরাবরই আমার ওপর খাপ্পা।

না তা নয়, প্রথম প্রথম তো তোমায় বেশ ভালই বাসতেন।

হ্যাঁ যতদিন না বুঝতে পেরেছিলেন, যে তার ধনী আদুরে ছেলেটির প্রতি আমার লোভ আছে, বা তার টাকার জন্য আমি তাকে গাঁথতে চাইছি।

ও রকম করে ব'ল না বিনি।

কিন্তু তোমার মা তো ও রকম করেই বলেছিলেন, আর এর থেকেও বেশী অপমানকর ভাষায়!

আমি দুঃখিত।

দুঃখিত হওয়ার প্রমাণ তো দিলে মাসখানেকের মধ্যেই তোমাদের থেকেও বহু ধনীর মেয়েকে বিয়ে করে।

আমার এতে কোন হাত ছিল না।

বড়লোকের ছেলেদের এ রকম হাত থাকে না শুনেছি।

বিনি খুব রেগে আছ।

খুব স্বাভাবিক নয় কি?

হঠাৎ আবেগে গলা আটকে এল বিনতার।

স্বাভাবিক জানি! কিন্তু জান বিনি. এ বিয়েতে আমি কতটা অসুখী?

বিনতা কোন উত্তর দিল না।

ওর আরও কাছে সরে এল কল্যাণ।

বিনি! আমার স্ত্রী ঠিক নর্ম্যাল নয়।

শুনেছি।

কি শুনেছ?

বিনতা চুপ করে রইল।

কি শুনেছ জানিনা. কিন্তু আমার সঙ্গ দেবার কোন সাধ্যই ওর নেই। একেবারে জড়বুদ্ধি।

হঠাৎ কেমন মনে হল. বিনতার। একবার তাকাল কল্যাণের রুক্ষ চুলের দিকে। কেমন একটা মায়া হল। পুরোন দিনের মত।

আগে বুঝতে পার নি?

না! কিছু বুঝতে পারি নি। মা একেবারে সব ঠিক করে ফেলে আমাকে বাধ্য করলেন। যাক চলে এস, মিছিলও ভেঙে যাবে দেখবে।

মিছিল ক্রমশঃ দূরে চলে যাচ্ছে। অনেকে ছোটাছুটি করে ক্রমশঃ পাতলা হয়ে যাওয়া মিছিলকে সামলাচ্ছে, অবশ্যই চলে যাওয়া লোকের সংখ্যা বেশী নয়। কিন্তু তবু সেদিকে তাকিয়ে কল্যাণ বলল,

আরও লোক চলে যাবে দেখ।

কিন্তু বৃষ্টির ভেতরও মিছিল এগিয়ে চলেছে রাজভবন ছাড়িয়ে শহীদ মিনারের দিকে।

আবার সব গাড়ী বাস-ট্রাম চলতে সুরু করেছে, যদিও খুব আস্তে আস্তে।

বিনতা এগিয়ে এল তারই একটা ধরবে বলে। সব লোক ঝুলছে, ভীষণ ভীড়। তা ছাড়া বৃষ্টির দরুণ, ষ্টপেজে দাঁড়িয়ে থাকাও যায় না। বিনতা চেষ্টা করতে গিয়ে বেশ ভিজে গেল। আবারও পিছিয়ে এল।

কি মুশকিলে যে পড়া গেল।

কি পাগলামো করছ? চলে এস বিনি, কথা আছে। তাছাড়া তোমাকে আমার দরকার।

দরকার!

যেন চাবুক পড়ল বিনতার পিঠের ওপর। তাই বটে, আজ দরকার। ওরা এমনই হয়। দরকার ছিল তাই বিনতার সঙ্গে বেড়িয়েছে, প্রেম করেছে, দরকার ছিল তাই ওকে অপমান করেছে, আজ আবার বিয়ের জুয়োখেলায় হেরে গিয়ে দরকার পড়েছে তাকে। হয়ত নিঃসঙ্গ জীবনে আবার তার সাহচর্যের দরকার। শুধু দরকারই।

কিন্তু বিনতা আর সাড়া দেবে না।

কৈশোরের তাজা মন নিয়ে যে পৃথিবীকে সে চিনেছিল, দরকার মত সে পৃথিবী বদলে গেছে, তার আসল বিবর্ণ স্বার্থপর রূপটা আজ জীবনের সঙ্গে যুদ্ধ করে সে চিনতে পেরেছে, তাই আর তার ভুল হবে না। তার দল সে চিনে নিয়েছে।

হঠাৎ প্রায় ছুটতে আরম্ভ করল ঐ বৃষ্টির মধ্যেই কল্যাণকে রীতিমত অবাক করে দিয়ে।

মিছিলের শেষ লোকটির পিছনে এসে দাঁড়িয়ে, হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে সেও শ্লোগান দিল।

দলছুট